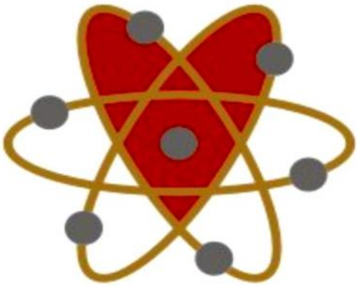
ইস্টিশন
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

ভালোবাসা কারে কয়

অভিজিৎ রায়





ভালোবাসা কারে কয়

মানব মনের জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা

অভিজিৎ রায়

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

ভালোবাসা কারে কয়

অভিজিৎ রায়

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

তৃতীয় ইবুক প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক
ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

ISBN: 978-984-8972-03-8

Bhalobasa kare koy by **Avijit roy**
Published by: Istishon eBook
First published in February 2012
Second published in February 2016
Third eBook published in November 2016

এই বইটি *অভ্রতে* কম্পোজকৃত

আমার বাবা, *অধ্যাপক অজয় রায়*

যিনি বনস্পতির ছায়া দিলেন সারা জীবন

আমার মা, *শেফালী রায়*

যিনি সারা জীবন আমাদের অগোছালো সংসার আর
বাউণ্ডুলে জীবন সামলালেন তাঁর নিপুণ হাতে

আমার জীবনসঙ্গিনী, *বন্যা আহমেদ*

যে না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না,
আর ভালবাসার জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে যেত অধরাই।

এবং আমাদের একমাত্র মেয়ে, *তৃষা*

স্কুলের নানা প্রজেক্ট করতে গিয়ে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান
এখনই হয়ে উঠেছে তার বেশ বড় রকমের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

ভূ মি কা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন তার গানে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সখি, ভালবাসা কারে কয়?' তখন কি তিনি একটি বারের জন্যও ভাবতে পেরেছিলেন, এর উত্তর লুকিয়ে আছে তার সমসাময়িক একজন শখের প্রকৃতিবিদের গবেষণার ভিতর?[1] হ্যা, প্রেম ভালবাসা, রাগ, অভিমান, ঈর্ষা কিংবা সৌন্দর্যের অস্তিত্বের সবচেয়ে আধুনিক তত্ত্বগুলোর জন্য আমরা যার কাছে ঋণী, তিনি প্রেম-পিরীতি বা মান অভিমান নিয়ে গবেষণা করা কোন কেউকেটা দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী বা আর্ট কালচারের বিশাল বোদ্ধা বা পোস্টমডার্নিস্ট সমালোচক নন, তিনি ছিলেন এক নিবিড় প্রকৃতিপ্রেমিক, যিনি বিশাল আকারের পারিবারিক বাগানে ঘন্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন- চরম আগ্রহ আর পরম বিস্ময় নিয়ে অবলোকন করতেন যত রাজ্যের ফুল,পাখি, ছোট বড় উদ্ভিদ আর পোকামাকড়, যত্ন করে পালতেন গুবরে পোকা, কেঁচো আর কবুতর। তিনি চার্লস ডারউইন।

বলতে দ্বিধা নেই, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আর দর্শনের টুকিটাকি বিষয় আমার আগ্রহের এবং লেখালিখির কেন্দ্রবিন্দু হলেও আমি বহুদিন ধরেই চার্লস ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের বিশেষ করে যৌনতার নির্বাচনের এক বিশাল অনুরাগী। এ অনুরাগ

[1] ১৮৮২ সালে চার্লস ডারউইন যখন মারা যান, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র একুশ বছর।

এক দিনে জন্মেনি, গড়ে উঠেছে পলে পলে একটু একটু করে। আর এ অনুরাগ কেবল আমার একার নয়, আমার মত এই জামানার বিজ্ঞান লেখকদের অনেকরই। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার মনে পড়ছে। আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা আহমেদ তার বহুল প্রচারিত 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইটি লেখার সময় বইয়ের একদম প্রথমেই একটি উক্তি ব্যবহার করেছিল[2]। উক্তিটি প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বংশগতিবিদ থিওডসিয়াস ডবঝানস্কির—

'বিবর্তনের আলোকে না দেখলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুরই আর অর্থ থাকে না'।

ডবঝানস্কির এ উক্তিটি মূলতঃ জীবজগতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহ—বিবর্তনের আলোকে না দেখতে পারলে সত্যই জীবজগতকে বোঝা আর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ডবঝানস্কি এই মহামূল্যবান কথাটা বলেছিলেন তার ১৯৭৩ সালে লেখা একটি গবেষণাপত্রের শিরোনামে। ডবঝানস্কি যে কথাটা আমাদের চারপাশের জীবজগতের জন্য সঠিক বলে মনে করেছিলেন, আমি তার প্রায় চল্লিশ বছর পরে আমার এ বইটি লিখতে গিয়ে দেখছি সেটা মানব সমাজকে ব্যাখ্যা করার জন্যও সমানভাবে কার্যকর। সত্যি কথা বলতে কী—মানব সমাজের বিভিন্ন প্যাটার্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বিবর্তনতত্ত্বকে আর বাইরে রেখে আমাদের পক্ষে এগুনো সম্ভব নয়। এতোদিন ধরে সমাজবিজ্ঞানী আর মনোবিজ্ঞানীরা বিবর্তনতত্ত্বকে বাইরে রেখে মানব সমাজের নানা সামাজিক ব্যাখ্যা প্রতিব্যাখ্যা জাহির করে চলেছিলেন। তাদের ব্যাখ্যায় ডারউইনীয় বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থাকায় সেগুলো থেকে গেছে অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ নয়তো হয়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে একেবারেই অপাংক্তেয়। সেই সমস্যাগুলোর অসম্পূর্ণ সমাধানের পূর্ণতা দিতে বিবর্তন তত্ত্ব কীভাবে অগ্রসর বিশ্লেষণ হাজির করতে পারে তার বেশ কিছু নমুনা হাজির করেছি আমার এ বইয়ে।

ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে সমাজ ব্যাখ্যার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের

---

[2] বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনী, ২০০৭, পুনর্মূদ্রণ ২০০৮।

ব্যাপারটা সহজে হয়তো অনেকেই মেনে নেবেন না। যদিও অন্য সকল প্রাণীকে জীবজগতের অংশ হিসেবে মানতে তাদের আপত্তি নেই, এমনকি ডারউইনীয় বিবর্তনের প্রয়োগ ছাড়া যে পিঁপড়েদের সমাজ থেকে শুরু করে শিম্পাঞ্জিদের সমাজ পর্যন্ত কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়—সেটিও অনেকেই মানেন, কিন্তু মানুষকে ডারউইনীয় বিশ্লেষণের বাইরে রাখতেই অনেকে পছন্দ করেন। হয়তো তারা ভাবেন, হাতি, গণ্ডার, শিম্পাঞ্জি কিংবা গরিলা—এ সকল প্রাণীরা যতই উন্নত হোক না কেন, তারা তো আর মানুষের মতো কবিতা লিখতে পারে না, পারেনা গলা ছেড়ে গান গেতে, কিংবা পারেনা স্থাপত্যকর্ম বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করতে, তাই মানুষ বোধ হয় অন্য প্রাণীদের থেকে একেবারে আলাদা, অনন্য। এ থেকে তারা সিদ্ধান্ত টানেন যে, ডারউইনীয় বিশ্লেষণ মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমি আমার এ বইয়ে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেছি। আমি দেখিয়েছি, অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকাটা ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে বাতিল করে না। আসলে খেয়াল করলে দেখা যাবে, সব প্রাণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার নিরিখে মনে হতে পারে যে তারা হয়তো অনন্য। যেমন, বাদুড়ের আল্ট্রাসনিক বা অতিশব্দ তৈরি করে শিকার ধরার এবং পথ চলার ক্ষমতা আছে, যা অনেক প্রাণীরই নেই। মৌমাছির আবার পোলারাইজড বা সমবর্তিত আলোতে দেখার বিরল ক্ষমতা আছে, যা আমাদের নেই। এধরনের অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকার পরেও কেউ কিন্তু বলছে না যে বাদুড় বা মৌমাছিকে জীববিজ্ঞানের বাইরে রাখতে হবে। তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেই বা অযাচিত ব্যতিক্রম হবে কেন? আসলে আমরা অনেকে নিজেদের ‘আশরাফুল মাখলুকাৎ’ ভেবে নিয়ে অন্য প্রাণীদের থেকে একেবারেই আলাদা ভেবে প্রবল আত্মতৃপ্তি অনুভব করি। এই অযাচিত আত্মতৃপ্তিই অনেক সময় যৌক্তিক চিন্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হয়ে উঠে অচলায়তন বৈজ্ঞানিক ভাবনার বিকাশে। আমি এ বইয়ে জোরালো দাবি উত্থাপন করে বলেছি—মানব সমাজের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য কিংবা জটিলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা মানুষেরা শেষ পর্যন্ত জীবজগতেরই অংশ। মানব সমাজে প্রেম, ভালবাসা, আত্মত্যাগ, ঘৃণা,সজ্ঘাত, পরার্থপরায়ণতা, সৃজনশীলতা এমনকি নৈতিকতা এবং

মূল্যবোধের মত উপাদানগুলোও বিবর্তনের পথ ধরেই সৃষ্ট হয়েছে, কখনো প্রাকৃতিক নির্বাচনকে পুঁজি করে, কখনোবা যৌনতার নির্বাচনের কাঁধে ভর করে।

যৌনতা শুনলেই আমাদের অনেকের মাথায় ফ্রয়েড চলে আসে। আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও সব সময় সঠিক নয়। যৌনতার মাধ্যমে ফ্রয়েড একসময় আমাদের মানসজগতের কিছু ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রয়েডের যৌনতার ব্যাখ্যা আর ডারউইনের যৌনতার নির্বাচন কিন্তু একই ইমারতে দাঁড়িয়ে নেই। বরং, ফ্রয়েডের সাথে ডারউইনের ধারণা এবং তত্ত্বের পার্থক্য বিস্তর। ফ্রয়েড তার ব্যাখ্যায় প্রাণিজগতের বিবর্তন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া গোনায় ধরেননি, অনেক ক্ষেত্রেই নিজের মনোমত ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন লিবিডো, অহম, শিশ্নাসূয়া খোজাগূঢ়েষা, ইদিপাস-ইলেক্ট্রা গূঢ়েষার নানা রসালো তত্ত্ব আর ধারণার মাধ্যমে—যার অনেকগুলোই আবার পরবর্তীতে অবৈজ্ঞানিক এবং বাতিল হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিছু কিছু আবার পরিগণিত হয়েছিল চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা হিসেবেও। ডারউইন বর্ণিত যৌনতার নির্বাচন কিন্তু ফ্রয়েডীয় এ সমস্ত কুসংস্কার থেকে একদমই আলাদা। ডারউইনের এ তত্ত্বের একটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আছে, আছে তত্ত্বের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ। ডারউইন প্রকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন নিয়ে নিশ্চিত হলেও প্রকৃতি জগত পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, প্রাণিজগতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে যা কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে টিকে থাকার কথা নয়। এগুলো টিকে আছে, কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিপরীত লিঙ্গের যৌনসঙ্গীর দ্বারা বংশপরম্পরায় দিনের পর দিন আদৃত হয়েছে বলেই। একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে পুরুষ ময়ূরের দীর্ঘ পেখম। এমন নয় যে দীর্ঘ পেখম পুরুষ ময়ূরকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে কোন বাড়তি উপযোগিতা দিয়েছিল। বরং দীর্ঘ পেখম স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহতই করেছে পদে পদে। দীর্ঘ পেখম থাকলে দৌঁড়াতে অসুবিধা হয়, শিকারীদের হাতে মারা পড়ার সম্ভাবনাও থাকে বেশিমাত্রায়। কাজেই টিকে থাকার

কথা বিবেচনা করলে দীর্ঘ পেখম ময়ূরের জন্য কোন বাড়তি উপযোগিতা দেয়নি বিবর্তনের পথ পরিক্রমায়। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে ময়ূরের দীর্ঘ পেখমকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভবই বলা যায়। তাহলে ময়ূরের দীর্ঘ পেখম তৈরি হবার পেছনে রহস্যটা কি? এখানেই চলে আসে যৌনতার নির্বাচনের ব্যাপারটি। দীর্ঘ পেখম টিকে গেছে মূলতঃ নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্য স্রেফ অলংকারিক। আসলে পুরুষ ময়ূরের লম্বা পেখমকে ভাল বংশাণুর নির্দেশক হিসেবে দেখত ময়ূরীরা। কাজেই দীর্ঘ পেখমের ঢেউ তোলা সুশ্রী ময়ূরেরা যৌনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত হতে পেরেছিল। এভাবেই দীর্ঘ পেখমের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থেকেছে। ঠিক একইভাবে কোকিলের সুরেলা গলা, বাবুই পাখির বাসা বানানোর ক্ষমতা, ফ্রুট ফ্লাইয়ের নাচ, উইডোবার্ডের দীর্ঘ লেজ কিংবা হরিণের শিং -এগুলোও উদ্ভূত হয়েছে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নয়, বরং বিপরীতলিঙ্গের বিভিন্ন পছন্দ অপছন্দ তথা যৌনতার নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে। আমি আমার এ বইয়ে দেখিয়েছি, ময়ূরের পেখমের মতই মানবসমাজেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো অর্নামেন্টাল বা অলংকারিক। কবিতা লেখা, গান করা থেকে শুরু করে গল্প বলা, আড্ডা মারা, কৌতুক করা, ভাস্কর্য বানানো—প্রভৃতি হাজারো বৈশিষ্ট্য মানব সমাজে দেখা যায় যেগুলো স্রেফ অলংকারিক—এগুলো বেঁচে থাকায় কোন বাড়তি উপাদান যোগ করেনি, কিন্তু এগুলো টিকে গেছে যৌন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে। ময়ূর দীর্ঘ পেখমের যাদুতে বিমোহিত করে সঙ্গীদের প্রলুব্ধ করে, হরিণ যেটা আবার করে থাকে তার বর্ণাঢ্য শিং এর যাদুতে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, শুধু ময়ূর বা হরিণ নয়, মানব সমাজেও অলংকারিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু একেবারে কম নেই। বড় চুল রাখা, দামি সানগ্লাস পরা, কেতাদুরস্ত কাপড়ের ফ্যাশন করা থেকে শুরু করে দামি গাড়ি, বাড়ি, শিক্ষা, বাকচাতুর্য, প্রতিভা, নাচ, গান, বুদ্ধিমত্তা সবকিছুই মানুষ কাজে লাগায় বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণের কাজে। আসলে মানব সমাজের নারীপুরুষের বহু বৈশিষ্ট্য এবং অভিব্যক্তিই মোটাদাগে সম্ভবত যৌনতার নির্বাচনের ফলাফল হিসেবেই উদ্ভূত—আশা করছি পাঠকেরা বহুভাবে এই সত্যের

উন্মোচন অবোলকন করবেন এই বইয়ে।

যৌনতার নির্বাচন এই বইটির বড় অংশ অধিকার করে থাকলেও সেটাই বইয়ের একমাত্র উপজীব্য নয়। বইটির মূল লক্ষ্য ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন, জগৎ এবং সমাজকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা; আর সেই সাথে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আধুনিক গবেষণার সাথে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। সাড়া বিশ্ব জুড়ে জন টুবি, লিডা কসমাইডস, স্টিভেন পিঙ্কার, রিচার্ড ডকিন্স, ডেভিড বাস, ম্যাট রিডলী, জিওফ্রি মিলার, র‍্যান্ডি থর্ন হিল, রবার্ট টিভার্স, মার্গো উইলসন, সারাহ ব্ল্যাফার হার্ডি, হেলেন ফিশার, রবিন বেকার সহ বহু গবেষকদের বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা আজ বিজ্ঞানের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং গবেষণার সজীব ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তাদের সেই কষ্টার্জিত আধুনিক গবেষণাগুলোকেই সহজ ভাষায় বাঙালি পাঠাকদের কাছে তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছি আমি আমার এই বইয়ের মাধ্যমে। এই বইয়ের বেশ কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা ব্লগে এবং কিছু কিছু মুক্তান্বেষা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পাঠকদের গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রাঞ্জল তর্ক বিতর্ক নতুন জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচন করেছিল। আমি এক্ষেত্রে মুক্তমনায় সংশপ্তক, আল্লাচালাইনা, বিপ্লব পাল, ফরিদ আহমেদ, জওশন আরা, গীতা দাস, ইরতিশাদ আহমদ, অপার্থিব সহ বহু ব্লগারদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। ফেসবুকেও পেয়েছি অসংখ্য মন্তব্য। আমার লেখাকে কেন্দ্র করে তাদের গঠমূলক আলোচনা আমার বইটিকে নতুনভাবে সাজাতে বাধ্য করেছে বহু ক্ষেত্রেই। পাশাপাশি আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা আহমেদের তীক্ষ্ম সমালোচনাগুলোও আমার পাণ্ডুলিপির পরিবর্তন পরিবর্ধনে অবদান রেখেছে অনেক। বন্যা নিজে বিবর্তনের অনুরাগী পাঠক এবং লেখক হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বহু ধারণার ব্যাপারে নিরন্তর সংশয়ী শুধু নয়, তীব্র সমালোচকও। তবে, এ ব্যাপারটা আমার জন্য যেন ‘শাপে বর’ হিসেবেই দেখা দিয়েছে। আমার মনে আছে, যখন আমি বইটির বিভিন্ন অংশ লিখছিলাম, বহু ক্ষেত্রেই আমার লেখালেখি এমনকি নাওয়া খাওয়া সরিয়ে রেখে আর

সাথে তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছে। আমার চৌদ্দ বছর বয়সী কন্যা তৃষা আমাদের এই তর্ক বিতর্ক দেখতে দেখতে হতাশ হয়ে বলেছে— ‘তোমরা এত অর্থহীন বিষয় নিয়ে এভাবে দিনের পর দিন ঝগড়া কর, যে অবাক লাগে’! বন্যা আর আমি দু’জনই তখন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি— ‘আরে আমরা তো ঝগড়া করছি না, এটা এক ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিস্কাশন’। তাতে অবশ্য আমার কন্যার অবাক হবার মাত্রা কমে না, আমরাই বরং শেষ পর্যন্ত তর্কে ক্ষান্ত দেই। যা হোক, লেখাগুলো শেষ পর্যন্ত বন্যার সংশয়ী দৃষ্টি পার হয়েই যেতে হয়েছে বলে এর মান নিয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। তারপরেও একটা বিষয় আমিও মাথায় রেখেছি। একেবারে প্রান্তিক গবেষণালব্ধ জিনিস গ্রন্থাকারে হাজির করলে একটা ভয় সবসময়ই থাকে যে, পরবর্তীতে অনেক কিছুই মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। তারপরও এই প্রান্তিক জ্ঞানগুলো আমাদের জন্য,এবং আমার বইয়ের পাঠকদের জন্য জরুরী বলে আমি মনে করেছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘মন কিভাবে কাজ করে?’ বইয়ের ভুমিকায় বলেছিলেন[3] –

> ‘এই বইয়ের প্রতিটি ধারণা সময়ের সাথে সাথে ভুল প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটাই হবে আমাদের জন্য অগ্রগতি। কারণ পুরোন ধ্যান ধারণা গুলো এতোই নিরস যে ভুল হবারও যোগ্য নয়।’

আমিও সেকথাই বলার চেষ্টা করব। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন শাখা। নতুন জিনিস নিয়ে গবেষনার ক্ষেত্রে - এর কিছু প্রান্তিক অনুমান যদি ভুলও হয়, সেটাই হবে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য প্রগতির সূচক। সে কথা মাথায় রেখেই আমার এ বইটি লেখা।

আমার শেষ কটি বইয়ের প্রকাশক ছিলেন শুদ্ধস্বরের আহমেদুর রশীদ টুটুল। তার হাতে বই তুলে দেওয়ার আলাদা আনন্দ আছে। ‘বিজয় অধ্যুষিত’ ছাপার বাজারে

---

[3] Steven Pinker, How the Mind Works, W. W. Norton & Company; Reissue edition, 2009

আহমেদুর রশীদ টুটুলই একমাত্র প্রকাশক যিনি অভ্রতে কম্পোজকৃত (ইউনিকোডে লেখা) পাণ্ডুলিপি অবলীলায় প্রকাশ করে চলেছেন। ইমেইল, ফেসবুক এবং যোগাযোগের আধুনিক কারিগরী উপকরণগুলো তার নখদর্পণে থাকায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় অর্ধগোলার্ধ দূরত্বে অবস্থান করেও তার সাথে যোগাযোগে কখনোই খুব একটা বেগ পেতে হয় না। তার চেয়েও বড় কথা, আমি আমার বইয়ে ছাইপাশ যাই লিখি না কেন, টুটুলের মনোরম প্রচ্ছদ, বাঁধাই, ভাল কাগজ এবং যত্ন নিয়ে ছাপানোর গুণে তার প্রকাশিত বইগুলো হাতে নিলেই একধরনের আলাদা আনন্দ হয়, তৈরি করে অনাবিল মুগ্ধতা। সেই মুগ্ধতাটুকুর রেশ এখনো না কাটায় এই বইটিও তার বিশ্বস্ত হাতেই তুলে দেয়া হল। বইটি পাঠকদের ভাল লাগলে এর সামগ্রিক কৃতিত্বটুকু কার—লেখকের নাকি এই তরুণ প্রকাশকের এ ব্যাপারে আমি মোটেই নিশ্চিত নই।

অভিজিৎ রায়
ইমেইল: charbak_bd@yahoo.com
ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

প্রথম অধ্যায়

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান–মনের নতুন বিজ্ঞান

মুক্তমনায় (www.mukto-mona.com) এক বছর আগে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে একটা সিরিজ শুরু করেছিলাম; শুরু করেছিলাম একটা 'বড়দের জোক' মানে প্রাপ্তবয়স্ক কৌতুক দিয়ে। কৌতুকটা এইরকম।

এক আধ-পাগলা ব্যাটা (ধরা যাক তার নাম মন্টু মিয়া) সারাদিন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গুলতি দিয়ে জানালার কাচ ভাঙত। এটাই তার নেশা। কিন্তু বাপ, তুই নেশা করবি কর—তোর নেশার চোটে তো পাড়া-পড়শির ঘুম হারাম। আর তা হবে নাই বা কেন! কাশেম সাহেব হয়তো ভরপেট খেয়েদেয়ে টিভির সামনে বসেছেন, কিংবা হয়তো বিছানায় যাওয়ার পাঁয়তারা করছেন, অমনি দেখা গেল দড়াম করে বেডরুমের কাচ ভেঙে পড়লো। শান্ত কখনো বা সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সারার নাম করে বাবা-মার কাছ থেকে লুকিয়ে চাপিয়ে বাথরুমে গিয়ে কমোডে উপবেশনপূর্বক একটা বিড়ি ধরিয়ে একখান সুখটান দেবার উপক্রম করেছে—অমনি গুলতির চোটে বাথরুমের কাচ ছত্রখান। নরেন্দ্রবাবু সকালে উঠে এক রৌদ্রস্নাত দিন দেখে 'আজি এ প্রভাতে রবির কর...' কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে জানালা দিয়ে চাঁদমুখখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, অমনি এক ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড 'আসিয়া জানালা তো ভাঙিলোই, তদুপরি কপালখানিও বেঢপ আকৃতিতে ফুলিয়া উঠিলো'।

কাহাতক আর পারা যায়। পাড়া পড়শিরা একদিন জোট বেঁধে শলাপরামর্শ করে মন্টু মিয়াকে বগলদাবা করে শহরের পাশের পাগলা গারদে দিয়ে আসলো।

সে এক হিসেবে ভালোই হলো। এখন আর বলা নেই কওয়া নেই—হঠাৎ করে কারো জানালার কাচ ভেঙে পড়ে না। কাশেম সাহেব ভরপেট খেয়ে টিভির সামনে বসতে পারেন, শান্ত বাবাজি হাগনকুঠিতে গিয়ে নিবিষ্ট মনে গিয়ে বিড়ি টানতে পারে, আর নরেন্দ্রবাবুও রবিঠাকুরের কবিতা শেষ করে জীবনানন্দ দাশেও সেঁধিয়ে যেতে পারেন, কোনো রকমের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই। জীবন জীবনের মতো চলতে থাকে নিরুপদ্রপে।

আর অন্য দিকে মন্টু মিয়ার চিকিৎসাও ভালোই চলছে। প্রতিদিন নিয়ম করে তাকে ঔষধ পথ্য খাওয়ানো হচ্ছে, রেগুলার সাইকোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে, সমাজ জীবন নিয়ে এন্তার জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। মানুষ সম্পর্কে আর সমাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা হচ্ছে। আর মন্টু মিয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন দেশের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ড. আজিম। তো এই উন্নত চিকিৎসা আর পরিবেশ পেয়ে মন্টু মিয়ার মনও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে উঠলো। এখন আর জানালার কাচ দেখলেই মন্টু মিয়ার হাত আগের মতো নিশপিশ করে না। জব্দ করা গুলতির জন্য মন কেমন কেমন করে উঠে না। নিয়ম করে খায় দায়, বই পড়ে, ব্যায়াম করে আর সমাজ আর জীবন নিয়ে উচ্চমার্গীয় চিন্তা করে। অসুস্থতার কোনো লক্ষণই আর মন্টু মিয়ার মধ্যে নেই! দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়...

বহুদিন ধরে চিকিৎসার পর একদিন সুবে সাদিকে ডাক্তার সাহেব মন্টু মিয়ার কেবিনে এসে বললেন,

- 'মন্টু মিয়া, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

-'তাই? এইটা তো খুবই ভালো সংবাদ দিলেন স্যার। আমি তো ভাবতেছিলাম এই পাগলা গারদ থেকে কোনোদিন ছাড়াই পামু না আর।' মন্টু মিয়ার চোখে বিস্ময়।

- 'কী যে বলো! আমাদের চিকিৎসার একটা ফল থাকবে না!' - ডাক্তার সাহেবের ভরাট গলায় একধরনের আত্মপ্রসাদের ছাপ।

- 'তা তো বটেই। আপনাগো অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আপনারা সবাই মিল্লা আমার জন্য যা করলেন...'

- 'না না কী যে বলেন। আপনার নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া কী আর এ অসাধ্য সম্ভব হতো নাকি!' বিনয়ের অবতার সেজে গেলেন ডাক্তার সাহেব। তারপর হাতের স্টেটসকোপ দিয়ে নাড়ি দেখলেন, রক্তের চাপ পেলেন স্বাভাবিক মাত্রায়। জিব বের করিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরে নীচ-উপর করলেন—কোনো অস্বাভাবিকতাই পেলেন না। আরও কিছু ছোটখাটো পরীক্ষা সেরে নিলেন। একজন স্বাভাবিক মানুষের যা যা লক্ষণ পাওয়া উচিত তাই পেলেন ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার আজিম বুঝলেন তার চিকিৎসায় মন্টু এখন পুরোপুরি সুস্থ। অযথা আর হাসপাতালে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। তাকে রিলিজ করে দেওয়ার যাবতীয় কাগজপত্র হাতে নিলেন সই করবেন বলে। এই কাজটা একদমই ভালো লাগে না ড. আজিমের। সামান্য একটা রিলিজ, অথচ হাজারটা কগজপত্র, হাজার জায়গায় সই। কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে একটা একটা করে সই-এর দায়িত্ব সেরে নিচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। ফাঁকে ফাঁকে মন্টু মিয়ার সাথে কথোপকথন চালাচ্ছেন, যাতে যতদূর সম্ভব বিরক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

- 'তা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কী করবে মন্টু মিয়া? সোজা বাসায় চলে যাবে?'

- 'না ডাক্তার সাব। ভাবতেছি সামনের ওই নিষাদ হোটেলটায় আগে যামু।'

- 'হোটেলে? কেন? ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবে বুঝি? তা করতেই পার। হাসপাতালের ঘাস পাতা খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে নিশ্চয়।'

- হোটেলটায় নাকি মদ-টদ আর সাথে আরও কিছু জিনিস পাওয়া যায় সস্তায়। ভাবতেছি অনেকদিন...

- হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই। আরে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন। ফুর্তি করার এটাই তো

বয়স। হ্যাঁ, ওখানে শুধু মদই পাওয়া যায় না, সাথে নাকি সুন্দর সুন্দর মেয়েও পাওয়া যায়... মানে এই আমি শুনেছি আর কী...

(ড. আজিম যে সেসব উদ্ভিন্নযৌবনা মধুমক্ষিকার লোভে প্রায়শই বাসার নাম করে নিষাদে সেঁধিয়ে যান, আর দীর্ঘ সময় পরে মাঝরাতে বাসায় গিয়ে বউকে আলিঙ্গন করে বলেন...আজকেও ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, বুঝলে এত কাজ থাকে... এই ব্যাপারটা এক্ষণে মন্টু মিয়ার কাছ হইতে চাপিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন ড. আজিম)।

- 'হ স্যার ওগো জিনিস ভালা। আমি জানি'।

- 'তো এতদিন পর এরকম একটা চান্স...নিশ্চয় অনেক আমোদ ফুর্তি করবে'।

- 'হ স্যার। লটের সব থেইক্যা সুন্দর মাইয়াডারে ভাড়া করুম। লগে এক বোতল কেরু'।

- 'বাহ তারপর?' ডাক্তার সই করার কথা ভুলে মন্টু মিয়ার দিকে চাইলেন। কেরুর প্রতি ড. আজিমের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ না থাকলেও (তিনি আবার বিদেশি মদ ছাড়া কিছু মুখে দেন না), নারীদেহের প্রতি তার অন্তহীন আকর্ষণ। মন্টু মিয়া হোটেলে গিয়ে কী করবেন, তা ভেবেই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

- 'তারপর আর কী! একটা রুম বুক দিমু। টেকা পয়সা যা আছে তাতে চইলা যাইব'।

- 'টাকা পয়সা যে তোমার আছে তা ত জানি। কিন্তু তুমি রুমে গিয়ে কী করবে?' ডাক্তার সাহেবের আর তর সয় না।

- 'রুমে গিয়া দরজাটা ভালো মতো লক করমু আগে। তারপর মাইয়াডারে বিছানায় বহাইয়া কেরুর বোতল খুইলা দিমু চুমুক। তারপর আস্তে ধীরে মাইয়াডার দিকে আগামু...

- 'তারপর, তারপর?' ডাক্তার সাহেবের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠছে।

- 'তারপর স্যার...মাইয়াডার কাপড় আস্তেধীরে খুলতে শুরু করমু। তারপর...'

- 'তারপর?' ডাক্তার সাহেব উত্তেজনায় পারলে একেবারে দাঁড়িয়ে যান।

- তারপর ব্রাটা খুইলা লমু...

- 'হ্যাঁ, তারপর? তারপর কী করবে?' ড. আজিম এবারে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছেন একেবারে।

- 'তারপর স্যার, ওই ব্রাটার ইলস্টিকটারে গুলতি বানায়া হোটেলের জানালার সমস্ত কাচ ভাঙ্গুম!'

- 'কী!!!!' ড. আজিম মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

ছোটবেলায় শোনা এই 'বড়দের' জোকটা 'ফালতু' মনে হলেও এর মর্মার্থ কিন্তু ব্যাপক। এতে আমাদের মানব মনের এক অন্তহীন প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বড়দের 'ঈশপের গল্পে'র মর্মার্থ হলো—কারো কারো মাথার ক্যারা এমনই যে, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন সেই ক্যারা কোনো রকমেই বের করে ফেলা যায় না। যত সাইকোথেরাপিই দেয়া হোক না কেন, দেখা যায় আবার সুযোগ পেলেই এবাউট টার্ন করে রোগী। আমি 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ'[4] নামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম (পরে এটি শুদ্ধস্বর থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়[5]), সেখানে বহু দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছিলাম যে, সমকামিতার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ পরিবেশনির্ভর নয়, বরং 'বায়োলজিকালি হার্ডওয়্যার্ড'। একটা সময় ছিল যখন, সমকামিতাকে ঢালাওভাবে মনোরোগ বা বিকৃতি বলে ভাবা হতো। ভাবা হতো সমকামিতা বোধ হয় কিছু বখে যাওয়া মানুষের বেলাল্লাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের দিনে সেই ধারণা (অন্তত পশ্চিমে) অনেকটাই পাল্টেছে। এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, **১৯৭৩** সালের **১৫**ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। **১৯৭৫** সালে American Psychological Association

[4] সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?, মুক্তমনা ওয়েব সাইইট, লিঙ্ক : http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm

[5] অভিজিৎ রায়, সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর, ২০১০

একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান কী?

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মূলত বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভূত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের মানসপট নির্মাণে দীর্ঘদিনের এক জটিল পরিকল্পনার ছাপ আছে। আবার বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বলে যে, জীবদেহের এই 'জটিল পরিকল্পনা' বলে যেটাকে মনে হয় সেটা আসলে ডারউইন বর্ণিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এবং কিছু ক্ষেত্রে যৌনতার নির্বাচনের ফলাফল। কাজেই, এই দুই শাখার মিশ্রণে গড়ে উঠা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপসংহার হচ্ছে—আমাদের জটিল মানসপটও উদ্ভূত হয়েছে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথ-পরিক্রমায়—প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করেই।

মন্টু মিয়ার পাগলামো কিংবা সমকামিতাই কি 'ক্যারা মাথার' কেবল একমাত্র উদাহরণ? না তা মনে করা ভুল হবে। আমাদের চারপাশে চোখ মেললেই আমরা মানবপ্রকৃতির এ ধরনের আরও মজার মজার উদাহরণ দেখতে পাব। একই রকম কিংবা প্রায় একই রকম পরিবেশ দেয়ার পরও অভিভাবকেরা লক্ষ করেন—তাদের কোনো বাচ্চা হয় মেধাবী, অন্যটা একটু শ্লথ, কেউ বা আবার অস্থির, কেউ বা চাপা স্বভাবের, কেউ বা কোমল কেউ বা হয় খুব ডানপিটে। কেউ বা স্কুলের লেকচার থেকে চটপট অঙ্কের সমস্যাগুলো বুঝে ফেলে, কেউ বা এ ধরনের সমস্যা দেখলেই পালিয়ে বাঁচে, কিংবা মাস্টারের বেতের বাড়ি খেয়ে বাসায় ফেরে। ছোটবেলা থেকেই কেউ পিয়ানোতে খুব দক্ষ হয়ে উঠে, কেউ বা রয়ে যায় তাল কানা। কেউ বা খেলাধুলায় হয় মহা চৌকস, কারো বা ব্যাটে বল লাগতেই চায় না। কেউ ছোটবেলা থেকেই গল্প-কবিতা লেখায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠে, তার কেউ সাহিত্য শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেই দাঁত খুলে আসে কিংবা একটা চার লাইনের কবিতা লিখতে গেলেই

কলম ভেঙে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপারস্যাপারের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।

কাজেই, আমরা কিছু উদাহরণ পেলাম যেগুলো হয়তো অনেকাংশেই পরিবেশনির্ভর নয়। অন্তত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সেগুলোর প্রকৃতি রাতারাতি বদলে দিতে পারি না। আইনস্টাইনকে শিশু বয়সে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলে বড় করলেই কি তিনি ম্যারাডোনা বা পেলে হয়ে উঠতে পারতেন? তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। তার মানে ভালো বা 'উপযুক্ত' পরিবেশ দেয়ার পরও বাঞ্ছিত ফলাফল আমরা পাই না বহু ক্ষেত্রেই। তখন কপাল চাপড়ানোই সার হয়। কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, জীবন গঠনে পরিবেশের কোনো প্রভাব নেই। অবশ্যই আছে। জীবন গঠনে পরিবেশের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, সেটা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। সে জন্যই প্রত্যেক পিতামাতা তার সন্তানকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে বড় করতে চান। শিশুর মানসপটে পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই ভালো একটা পরিবেশ প্রদানের জন্য কিংবা ভালো একটা স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকেরা অহর্নিশি চিন্তিত থাকেন। তারপরও কি তারা সবসময় প্রত্যাশিত ফল পান? মুনির ঘরে কি শনি জন্মায় না? কিংবা আলিমের ঘরে জালিম? জন্মায় জন্মায়। এই আমার উদাহরণটাই ধরুন। আমার মা ছোটবেলা থেকে কত করে চাইলো তার ছেলেটার যেন ধর্মকর্মে মতি থাকে, সবার সাথে যেন ভালো ব্যবহার করি, কারো সাথে যেন ঝগড়া ফ্যাসাদে না জড়াই। তা আর হলো কই! ধর্মকর্ম আর আমার ধাতে সইলো না। মুনাফেকের খাতায় অচিরেই নাম উঠে গেল আমার। সাত বছর বয়সে আমি ঘোষণা দিয়ে বললাম—'মন্দিরের প্রসাদ যেন আমাকে না খাওয়ানো হয় কক্ষনো'। আমাদের পাড়ার (মা-বাবার দৃষ্টিতে) সবচেয়ে অপছন্দের আর 'বখে যাওয়া' ছেলেটার সাথে মিশতে শুরু করে দিলাম। আমার মা নীরবে চোখের জল ফেলেন- "কী কুক্ষণে যে এইটারে পেটে ধরেছিলাম!" অথচ এমন কি হবার কথা ছিল? ভালো পরিবেশের কোনো অভাব ছিল না আমার...

পাঠকদের মাথায় নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করেছে—পরিবেশই যদি মানবপ্রকৃতি গঠনের একমাত্র নিয়ামক না হয়ে থাকে, তাহলে আর বাকি থাকে কী? বাকি থাকে একটা খুব বড় জিনিস। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, মানবপ্রকৃতি গঠনে পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে আরেকটা জিনিসের প্রভাব। সেটা হচ্ছে বংশাণু বা 'জিন'। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে 'জিন'কে নিয়ে আসায় অনেকের চোখই হয়তো কপালে উঠে যাবে। ভুরুও কুঁচকে যেতে পারে কারো কারো। তবে আমি এ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব যে, 'পরিবেশ' এবং 'জিন'—মানবপ্রকৃতি গঠনে কোনোটার প্রভাবই কোনোটার চেয়ে কম নয়। আমরা প্রায়শই সন্তানদের দেখিয়ে বলি—'ছেলেটা বাপের মতোই বদরাগী হয়েছে', কিংবা বলি 'মেয়ে হয়েছে মার মতোই সুন্দরী। চোখগুলো দেখেছ—কী রকম টানা টানা?' এগুলো কিন্তু আমরা এমনি এমনি বলি না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলি, আর সেজন্যই এই উপমাগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এমনিভাবে মিশে গেছে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, আবেগ, অনুরাগ, হিংসাত্মক কিংবা বদরাগী মনোভাব এমনকি ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি 'জেনেটিক তথ্য' হিসেবে আমাদের অজান্তেই। বাবার হৃদরোগের উপসর্গ থাকলে ছেলেকেও একটু বাড়তি সচেতন হতে পরামর্শ দেন আজকের ডাক্তারেরা। কার্ব আর রেড মিট ছেড়ে দিতে বলেন। পরিবারে কারো ডায়াবেটিস থাকলে কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়ের দেহে এ রোগ বাসা বেঁধে থাকলে অন্যান্যরাও নিয়মিত 'সুগার চেক' করা শুরু করে দেন। এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। শারীরিক গঠন কিংবা রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে তাও না হয় মানা যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠনে 'জিন'-এর প্রভাব থাকতে পারে, এ ব্যাপারটা মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল, এখনও আছে বহুজনেরই। আর আপত্তি আছে বলেই আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি—জীববিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান নামের অভিধায়। প্রাণিদেহের এবং সর্বোপরি মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মিউটেশন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা, আর সমাজসংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা কিংবা

মনোবিজ্ঞানীরা। এ যেন দুই স্বতন্ত্র বলয়। জীববিজ্ঞানের আহৃত গবেষণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নীরব থাকবেন। আবার সমাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা উদাসীন থাকবেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম হয়ে গিয়েছে যেন। কিন্তু এই বিভেদ কি যৌক্তিক? এই দুই বলয়ের মধ্যে কী কোনোই সম্পর্ক নেই? আধুনিক চিন্তাবিদরা কিন্তু বলেন, আছে। খুব ভালোভাবেই সম্পর্ক আছে। আসলে সংস্কৃতি বলি, কৃষ্টি বলি, দর্শন বলি, কিংবা সাহিত্য—এগুলো কিন্তু মানব মনের সম্মিলিত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার মানব মন কিন্তু মানব মস্তিষ্কেরই (Human brain) অভিব্যক্তি, যেটাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘হাউ মাইন্ড ওয়ার্কস’ বইয়ে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে— ‘Mind is what the brain does’। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশাণু যা আবার মস্তিষ্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক। কাজেই একধরনের সম্পর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাইলেও আর সামাজিক আচার-ব্যবহার কিংবা মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞান থেকে আজকে আলাদা করে রাখতে পারি না। এ ব্যাপারটাই স্পষ্ট করেছেন জন ব্রকম্যান তার সাম্প্রতিক ‘সায়েন্স এট এজ’ (২০০৮) বইয়ের ভূমিকায় –

> Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the product of human minds interacting with one another, and the human mind is a product of human brain, which is organized in part by the human genome and has evolved by the physical process of evolution.

মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে জিন বা বংশাণুকে গোনায় ধরা উচিত—এ ব্যাপারটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এডওয়ার্ড ও উইলসন তার বিখ্যাত ‘সামাজিক জীববিজ্ঞান’ (Sociobiology) নামক পুস্তকে[6]। সে সময় উইলসনের গবেষণার বিষয় ছিল পিঁপড়ে

[6] Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Twenty-Fifth Anniversary Edition, Belknap Press of Harvard University Press, 2000 (The book was first published in 1975, then reprinted in 1976. A twenty-fifth anniversary edition was published in 2000 by the Belknap Press of Harvard University Press).

এবং পিঁপড়েদের সমাজ। পিঁপড়েদের চালচলন গতিবিধি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক রিসার্চ করছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ নিয়ে একটি সুন্দর একাডেমিক বইও লিখেছিলেন ‘দ্য ইনসেক্ট সোসাইটি’ নামে। ১৯৭৫ সালের ‘সোশিওবায়োলজি’ বইটিতেও তিনি পিঁপড়েদের আকর্ষণীয় জীবনযাপন আর সমাজের নানা রকমের গতিবিধিই মূলত ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে যেতেন, তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি সেখানে থেমে না গিয়ে শেষ অধ্যায়ে তার ধ্যানধারণা একেবারে মানবসমাজ পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে সেই ধারণাকে উইলসন আরও বিস্তৃত করেন তার পরবর্তী ‘মানবপ্রকৃতি নিয়ে’ (১৯৭৮) নামের বইয়ে[7]। তিনি বলেন আজকে আমরা যাদের আধুনিক মানুষ নামে অভিহিত করি, সেই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির মূল মানসপটের বির্নিমাণ আসলে ঘটেছিল অনেক আগে—যখন তারা বনে-জঙ্গলে শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে জীবনযাপন করত। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সেই আদি স্বভাবের অনেক কিছুই এখনও আমরা আমাদের স্বভাবচরিত্রে বহন করি—যেমন বিপদে পড়লে ভয় পাওয়া, দল বেঁধে বিপদ মোকাবেলা করা, অন্য জাতি-গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সবার আগে নিজের পরিবারের বা গোত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার জটিল সাংস্কৃতিক উপাদান। এই জিন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রণেই গড়ে উঠে মানবপ্রকৃতি, যাকে উইলসন তার বইয়ে চিহ্নিত করেন 'জিন-কালচার সহবিবর্তন' (Gene-culture coevolution) নামে।

যখন অধ্যাপক উইলসনের বইটি প্রকাশিত হয়, তা একাডেমিয়ায় তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক উইলসনের কাজকে দেখেছিলেন তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে ‘অযাচিত’ হস্তক্ষেপ হিসেবে। আর তাছাড়া সামাজিক ডারউইনিজম আর ইউজিনিক্সের দগদগে ঘা তখনো মানুষের মন থেকে শুকোয়নি। মানবপ্রকৃতি

[7] Edward O. Wilson, On Human Nature: Revised Edition, Harvard University Press; Revised Edition, 2004

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'জিন' বা বংশাণুকে নিয়ে আসায় উইলসনকে অভিযুক্ত হতে হয় নিও-সোশাল ডারউইনিস্ট অভিধায়। অভিযোগ করা হয়—উইলসন নিজের জাতিবিদ্বেষী মনোভাবকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন। উইলসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন সে সময়কার 'আদর্শবাদী' চিন্তাবিদেরা। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণ দিয়ে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে মেনে নিতে বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। Science for the People নামের বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিত একটি সংগঠন উইলসনের বিরুদ্ধে সে সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিন—এই তিন মাস্কেটিয়ার্স ১৯৮৪ সালে 'নট ইন আওয়ার জিনস' বইয়ে উইলসন এবং অন্যান্য সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের আক্ষরিক অর্থেই তুলোধুনো করেন। তারা তাদের বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান এখন জাত্যাভিমানী পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছে, আর উইলসন সেই বৈষম্যমূলক 'পুঁজিবাদী বিজ্ঞান'কে প্রমোট করছেন। তারা উইলসনের জমজ নিয়ে পরীক্ষা, পরিগ্রহণ পরীক্ষা প্রভৃতির উপর পদ্ধতিগত আক্রমণ পরিচালনা করেন, শুধু তাই নয় তাদের মার্কসবাদী দার্শনিক বিশ্বাস থেকে প্রস্তাব করেন জীববিজ্ঞানেও মার্ক্সবাদের মতো 'দ্বান্দ্বিক' বা ডায়লেক্টিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ নিয়ে অধ্যাপক রিচার্ড লেওনটিন একটি বইও লেখেন সে সময়—*ডায়লেক্টিকাল বায়োলজিস্ট* নামে।

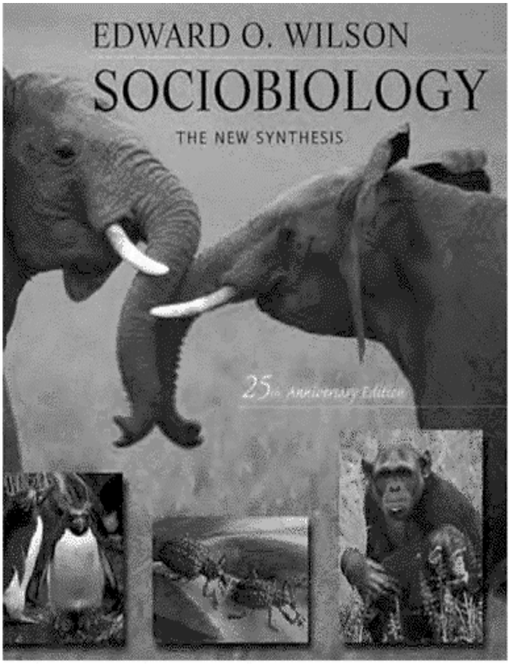
এর প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৫ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বইকে 'স্থূল, আত্মাভিমানী, পশ্চাৎমুখী এবং ক্ষতিকর' হিসেবে আখ্যায়িত করে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ[8] লেখেন। অধ্যাপক ডকিন্স অভিযোগ করেন

---

[8] Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard Dawkins in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985, On line link: http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/ Dawkins/ Work/ Reviews/1985-01-24notinourgenes.shtml

যে, লেওনটিনরা নিজস্ব দার্শনিকভিত্তি থেকে মদদপুষ্ট হয়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের উপর যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন এবং যেভাবে ভিত্তিহীন আক্রমণ পরিচালনা করেছেন তা স্ট্রম্যান হেত্বাভাস[9] দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা, কোনো 'বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদ'কে প্রমোট করা নয়।

সোশিওবায়োলজি বইটি প্রকাশের তিন দশক পরে আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উইলসন সামাজিক বিবর্তনবাদ নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা মৌলিক ছিল নিঃসন্দেহে। উইলসন সেই কাজটিই করেছিলেন যেটি ডারউইন পরবর্তী যে কোনো জীববিজ্ঞানীর জন্য হতে পারে মাইলফলক। তখন তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও পরে অনেকেই তার কাজের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। উইলসন মানবপ্রকৃতি নিয়ে তার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের কারণে দু-দুবার পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় উইলসন যে কাজটি সামাজিক জীববিজ্ঞানকে এখন দেখা হয় বিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি শাখা হিসেবে, যা পরবর্তীতে আরও পূর্ণতা পেয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (Evolutionary Psychology) নামের ভিন্ন একটি নামে। উইলসনের সোশিওবায়োলজি বইটির পর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জগতে



চিত্র : অধ্যাপক উইলসনের সোশিওবায়োলজি বইটির ২৫ বছর পুর্তি এডিশন (২০০৪)

9 A straw man argument is an informal fallacy based on misrepresentation of an opponent's position.

অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো রিচার্ড ডকিন্সের ‘স্বার্থপর জিন’ (১৯৭৬) নামের অনন্যসাধারণ একটি বই[10]। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন জেনেটিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তার বইয়ে দেখালেন যে, আমরা আমাদের এই দেহের পরিচর্যা নিয়ে যতই চিন্তিত থাকি না কেন—দেহ কিন্তু কোনো প্রতিলিপি তৈরি করে না; প্রতিলিপি তৈরি করে বংশাণু বা জিন। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহ কেবল আমাদের জিনের বাহক (vehicle) হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের খাওয়া-দাওয়া, হাসিকান্না, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, সিনেমা দেখা, খেলাধুলা বা গল্প করা—আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত ‘অত্যন্ত স্বার্থপর’ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো ‘উদ্দেশ্য’ যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। মা বাবারা যে সন্তানদের সুখী দেখতে পাওয়ার জন্য পারলে জানটুকু দিয়ে দেয়—এটা কিন্তু জৈবিক তাড়না, আরও পরিষ্কার করে বললে জিনগত তাড়না থেকেই ঘটে। শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোনো প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। ‘পরবর্তী জিন’ রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুসনুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। এক ধরনের ইঁদুর আছে যারা শুধু সঠিক সঙ্গী খুঁজে জিন সঞ্চালন করার জন্য বেঁচে থাকে। যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ ইঁদুরটি মৃত্যুবরণ করে। অথচ এই মৃত্যুকূপের কথা জেনেও পুরুষ ইঁদুরটি সকল নিয়ে বসে থাকে ‘সর্বনাশের আশায়’। এক প্রজাতির ‘ক্যানিবাল’ মাকড়শা আছে যেখানে স্ত্রী মাকড়শাটি যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে ফেলে। সাক্ষাৎ এই মৃত্যুর কথা জেনেও দেখা গেছে পুরুষ মাকড়শাগুলো জিন সঞ্চালনের তাড়নায় ঠিকই তাড়িত হয়। অর্থাৎ, দেহ এবং জিনের সংঘাত যদি উপস্থিত হয় কখনো—সে সমস্ত বিরল

10 Richard Dawkins, The Selfish Gene. New York City: Oxford University Press, 1976.

ক্ষেত্রগুলোতে দেখা গেছে জিনই জয়ী হয় শেষপর্যন্ত। আমাদের দেহে 'জাংক ডিএনএ' কিংবা 'সেগ্রেগেশন ডিস্টরশন জিন'-এর উপস্থিতি সেই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে—শরীরের ক্ষতি করে হলেও জিন অনেক সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখে—অত্যন্ত 'স্বার্থপরভাবে'ই। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থিতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরও বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন তারা। তবে তার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি ঘটল, সেটা হলো মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে গেল জীববিজ্ঞানীদের জন্য। সেজন্যই 'রিচার্ড ডকিন্স: কীভাবে একজন বিজ্ঞানী আমাদের চিন্তাভাবনার গতিপথকে সমূলে বদলে দিল' নামের একটি বইয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা বলেছেন [11], ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিশিজ*—এরপর কোনো জীববিজ্ঞানীর লেখা বই যদি মানসপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তো সেটি ডকিন্সের *সেলফিশ জিন*। এ ব্যাপারে ২০০১ সালে প্রকাশিত 'সামাজিক জীববিজ্ঞানের সাফল্য' নামের গ্রন্থে জন অ্যালকের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক [12]—

> 'প্রাণিজগতের আচরণ নিয়ে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ 'সোশিওবায়োলজি' কিংবা *সেলফিশ জিন* শব্দগুলো নিয়ে বেশি কথা বলার কিংবা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেন না—কারণ এগুলো এখন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে'।

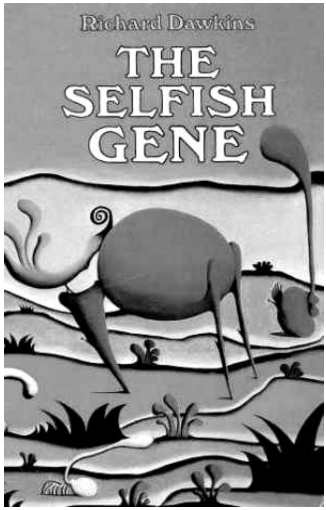
ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ *অরিজিন অব স্পিশিজ* লিখেছিলেন, তখন তিনি পুরো বইটিতে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক এড়াতে গিয়েই এই কৌশল নিয়েছিলেন ডারউইন, যদিও বইয়ে মানবসমাজ এবং বিবর্তন নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

[11] Alan Grafen, Mark Ridley, Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers, Oxford University Press, 2006

[12] John Alcock, The Triumph of Sociobiology, Oxford University Press, USA, 2001

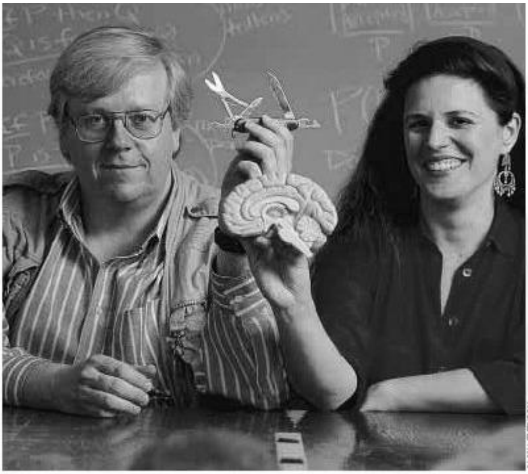
দিয়েছিলেন এই বলে‘Light will be thrown on the origin of man and history’।

এবং একই প্যারাগ্রাফে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—‘In the distant future... Psychology will be based on a new foundation.’



চিত্র : ডকিন্সের সেলফিশ জিন যখন প্রথম ১৯৭৬ সালে বের হয় - তখন তার কভার ছিল এরকম বিদঘুটে!

মজার ব্যাপার হলো—ডারউইন যেমন তার *অরিজিন অব স্পিশিজ* বইয়ে মানববিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে ‘বিতর্কিত’ হতে চাননি, ঠিক তেমনি তার একশ বছরেরও পরে বই লিখতে বসে ডকিন্স এবং উইলসনরাও তাদের হাটু কাঁপুনি থামাতে পারেননি। তারাও তাদের বইয়ে মানবসমাজ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে ‘বিতর্ক’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হয়তো চাননি। ডকিন্সের ‘সেলফিশ জিন’ সুস্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং আলোচনায় ভরপুর, কিন্তু প্রায় পুরোটাই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিম্নস্তরের প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে। উইলসন তার ৫২৬ পৃষ্ঠার ঢাউস আকারের বইটির পুরোটুকুতেই পিঁপড়া আর পোকামাকড় নিয়েই পড়ে ছিলেন, মানুষ নিয়ে কথা বলেছিলেন শেষ ২৮ পৃষ্ঠায় এসে। তারপরও ডারউইন যেমন বিতর্ক এড়াতে পারেননি, আধা মানুষ আর আধা বানরের কার্টুনের কেরিক্যাচার হজম করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি ডারউইনের উত্তরসূরীদের নানা ধরনের কটূক্তি হজম করতে হচ্ছে ডারউইনেরই ভবিষ্যদ্বাণী – ‘সাইকোলজি উইল বি বেসড অন এ নিউ ফাউন্ডেশন’-কে পূর্ণতা দিতে গিয়ে।



চিত্র : জন টুবি এবং লিডা কসমাইডস - বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা দম্পতি একটি কনফারেন্সে আমাদের মানসপটকে সুইস আর্মি ছুরির সাথে তুলনা করে দেখাচ্ছেন। তারা বলেন, বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত মানব মনের মডিউলগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই শিকারি-সংগ্রাহকদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিল বলেই তার ছাপ আমরা এখনও বিভিন্ন কিছুতে খুঁজে পাই (ছবি – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)।

তবে আধুনিক ‘বিবর্তন মনোবিদ্যা’র জন্ম এদের কারো হাতে হয়নি, এর জন্ম হয়েছে মূলত এক সেলিব্রিটি দম্পতি জন টুবি (নৃতত্ত্ববিদ) এবং লিডা কসমাইডস (মনোবিজ্ঞানী) –এর হাত দিয়ে। তারা **১৯৯২** সালে ‘অভিযোজিত মনন’ নামে যে বইটি লেখেন সেটিকে আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়[13]। তারা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সমাজবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলকে (standard social science model, সংক্ষেপে SSSM) প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং সামাজিক বিবর্তন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখা জৈববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোণটিকে আজ অনেকেই অভিহিত করছেন ‘মনের নতুন

[13] Jerome H. Barkow, Leda Cosmides and John Tooby, The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, Oxford University Press, USA, 1995

বিজ্ঞান' ('the new science of the mind') নামে। যারা জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের এই 'নতুন বিজ্ঞানের' সাথে পরিচিত হতে চান, তারা অন লাইনে 'Evolutionary Psychology: A Primer' [14] প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন (আমাদের মুক্তমনা সদস্য শিক্ষানবিস জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের প্রবন্ধটি নিজস্ব বিশ্লেষণ সহযোগে অনুবাদ করেছেন। তার অনুবাদটি রাখা আছে মুক্তমনায়[15])। জন টুবি আর লিডা কসমাইডস লেখাটিতে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি হিসেবে কতগুলো সূত্রেরও প্রস্তাব করেন। সেগুলো হলো —

প্রথম সূত্র:

মস্তিষ্ক একটি ভৌত যন্ত্র যা অনেকটা কম্পিউটারের মতো কাজ করে। এর বর্তনীগুলো পরিবেশ উপযোগী স্বভাব তৈরি করে।

দ্বিতীয় সূত্র:

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের স্নায়বিক বর্তনীগুলো গড়ে উঠেছে। বিবর্তনের ইতিহাসে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো সমাধান করার জন্যই প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করেছে।

তৃতীয় সূত্র:

আমাদের মনন বা চেতনাকে হিমশৈলের চূড়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হিমশৈলের বেশিরভাগ অংশই থাকে পানির নীচে লুকানো, ঠিক তেমনি আমাদের মনের মধ্যে যা কিছু ঘটে তার অধিকাংশই গোপন থাকে। সুতরাং চেতনা আমাদের এই বলে বিভ্রান্ত করতে পারে যে, মস্তিষ্কের বর্তনী বোধ হয় খুব সরল। আমরা প্রত্যহ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই সেগুলো সমাধান করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার জন্য অনেক

---

14 Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for Evolutionary Psychology. Online link: http://www.psych.ucsb.edu/ research/cep/primer.html

15 শিক্ষানবিস, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান: একটি ভূমিকা – ১, http://mukto-mona.com/ banga_blog/?p=5036

জটিল স্নায়বিক বর্তনীর জটিল যোগসাজোশের প্রয়োজন পড়ে।

চতুর্থ সূত্র:

প্রতিটি অভিযোজনগত সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক পৃথক স্নায়বিক বর্তনী আছে। প্রতিটি বর্তনী কেবল নিজ কাজ করার জন্যই বিশেষায়িত।

পঞ্চম সূত্র:

আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে বাস করে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক[16]।

শিকারি-সংগ্রাহক পরিস্থিতি এবং সাভানা অনুকল্প

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মনে করে প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর আগে শিম্পাঞ্জি থেকে আলাদা হওয়ার পর সেখান থেকে শুরু করে আজ থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত আমরা—মানুষেরা মূলত বনে জঙ্গলেই কাটিয়েছি। সেই সময় থেকে শুরু করে আধুনিক সময়কাল বিবর্তনের পঞ্জিকায় হিসেব করলে খুবই ক্ষুদ্র একটা সময়। আর কৃষি কাজের উদ্ভব কিংবা তারো পরে শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি তো আরও তুচ্ছ। সঠিকভাবে বলতে গেলে, মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক ছিল প্লাইস্টোসিন যুগের পুরো সময়টাতে: ২৫ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ১২,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত। 'হোমো' গণ এর উদ্ভবের সময়কালটাও ২৫ লক্ষ বছর পূর্বের দিকে। তার মানে মানুষের ২৫ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে ৯৯% সময়ই তারা ছিল শিকারি-সংগ্রাহক। অর্থাৎ, ইভল্যুশনারি স্কেলে মানুষেরা 'মানব সভ্যতার' শতকরা নিরানব্বই ভাগ সময়টাই বনে জঙ্গলে আর ফলমূল শিকার করে কাটিয়েছে। কাজেই আমাদের মস্তিষ্কের মূল নিয়ামকগুলো হয়তো তৈরি হয়ে গিয়েছিল তখনই, সে সময়কার বিশেষ কিছু সমস্যা মোকাবেলার জন্য—আজকের দিনের অত্যাধুনিক সমস্যাগুলোর জন্য নয়। এখনও অনেকেই মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠে, কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পায় না। এটা বিবর্তনের কারণেই ঘটে বলে মনে করা হয়। বনে-জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতঙ্গকে ভয় পাওয়ার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই বহন করি। সেজন্যই লিডা কসমাইডস

16 এই সূত্রটিকে 'সাভানা অনুকল্প' হিসেবেও বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে চিহ্নিত করা হয়, ' শিকারী-সংগ্রাহক পরিস্থিতি এবং সাভানা অনুকল্প' বাক্স দ্রষ্টব্য।

এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন—আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে বাস করে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক।

এই আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক বাস করার ব্যাপারটাকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে 'সাভানা অনুকল্প' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রিন্সিপলটির মূল কথা হলো[17]—
মানব মস্তিষ্কের মডিউলগুলো যখন তৈরি হয়েছিল, তখন আধুনিক সমাজের বিদ্যমান উপকরণগুলোর অনেকগুলোই ছিল না। ফলে আধুনিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়, বরং মস্তিষ্কে অনেকাংশেই রাজত্ব করে আদিম পরিবশের উপজাতসমূহ।

১৯৯৪ সালে রবার্ট রাইট নামে একজন গবেষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখলেন ‘মরাল এনিমেল’ নামে[18]। বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই। এই বইয়ের লেখক প্রথমবারের মতো ‘সাহস করে’ ডারউইনের বিবর্তনের আলোকে মনোবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন। শুধু তাই নয়, ডারউইনের জীবন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখালেন, ভদ্র, সৌম্য, লাজুক স্বভাবের ডারউইনও শেষ পর্যন্ত আমাদের মতোই জৈব তাড়নায় তাড়িত একধরনের ‘এনিমেল’ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। রবার্ট রাইটের বইটির পর এই বিষয়ে গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। গবেষকেরা এই ‘মনের নতুন বিজ্ঞান’ নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। গবেষকদের মধ্যে স্টিভেন পিঙ্কার, ডেভিড বাস, হেলেন ফিশার, জিওফ্রি মিলার, রবিন বেকার, ম্যাট রিড্লী, ভিক্টর জন্সটন, সাতোসি কানাজাওয়া, ডনাল্ড সায়মন্স সহ অনেকেই আছেন। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় উপজীব্য করে বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞানী এবং গবেষকেরা লিখেছেন ‘হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স’[19], ‘এন্ট এন্ড দ্য পিকক’[20], ‘দ্য রেড কুইন’[21], ‘এনাটমি অব লাভ’[22] ‘মেটিং

[17] Alan S Miller, Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade, 2008

[18] Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995.

[19] How the Mind Works, Steven Pinker, W.W. Norton & Co., 1999

মাইন্ড'[23], স্পার্ম ওয়ার্স[24] সহ অসংখ্য জনপ্রিয় ধারার বই। এছাড়া সফল টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে আছে ' দ্য সায়েন্স অব সেক্স', 'জেন্ডার ওয়ার্স' ইত্যাদি। ইংরেজিতে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর কাজ হলেও বাংলাভাষায় এ নিয়ে লেখা একদমই চোখে পড়ে না। মুক্তমনায় আমার সিরিজটির আগে এ নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণও চোখে পড়েনি আমার। আমার এ সিরিজটি প্রকাশিত হবার পর অপার্থিব, বন্যা, স্বাধীন, পৃথিবী, বিপ্লব পাল, সংসপ্তক, মুহম্মদ (শিক্ষানবিস) সহ অনেকেই এনিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রবন্ধও লিখেছেন অনেকেই[25]।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের সাম্প্রতিক এই শাখাটি তাহলে আমাদের কী বলতে চাচ্ছে? সাদামাটাভাবে বলতে চাচ্ছে এই যে, আমাদের মানসপটের বিনির্মাণে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার একটি ছাপ থাকবে, তা আমরা যে দেশের, যে সমাজের বা যে সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত হই না কেন। ছাপ যে থাকে, তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুতেই কিন্তু পাই। মিষ্টিযুক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের জন্য খারাপ, কিন্তু এটা জানার পরও আমরা এ ধরনের খাবারের প্রতি লালায়িত হই। সমাজ-সংস্কৃতি নির্বিশেষেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কেন? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একটা সময় মানুষ জঙ্গলে থাকত, খুব কষ্ট করে খাবারদাবার সংগ্রহ করতে হতো। শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাবার এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার প্রয়োজনেই এ ধরনের খাবারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন তো আর কারো জানার উপায় ছিল না যে,

---

20 Helena Cronin and John Maynard Smith, The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today, Cambridge University Press, 1993.

21 The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Matt Ridley, Penguin, 1995.

22 Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray, Ballantine Books 1994

23 Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature, Anchor, 2001.

24 Robin Baker, Sperm Wars: Infidelity, Sexual Conflict, and Other Bedroom Battles

25 এ প্রসঙ্গে মুক্তমনায় আর্কাইভ থেকে পড়ুন বিবর্তন, বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে রাখা ক্যাটাগরিতে রাখা বিভিন্ন প্রবন্ধগুলো।

হাজার খানেক বছর পর মানুষ নামের অদ্ভুত এই 'আইলস্যা' প্রজাতিটি ম্যাকডোনাল্ডসের বিগ-ম্যাক আর হার্শিজ হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ব্লগ আর চ্যাট করে অফুরন্ত অলস সময় পার করবে আর গায়ে গতরে হোঁদল কুতকুতে হয়ে উঠবে। কাজেই খাবারের যে উপাদানগুলো একসময় ছিল আদিম মানুষের জন্য শক্তি আহরণের নিয়ামক কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সেগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে উঠেছে তাদের জন্য মরণ-বিষ। কিন্তু এগুলো জেনেও আমরা আমাদের লোভকে সংবরণ করতে প্রায়শই পারি না; পোলাও বিরিয়ানি কিংবা চকলেট বা আইসক্রিম দেখলেই হামলে পড়ি। আমাদের শরীরে আর মনে বিবর্তনের ছাপ থেকে যাওয়ার কারণেই এটি ঘটে।



চিত্র: চর্বিজাতীয় খাবার আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ জেনেও আমরা সেগুলোর প্রতি অহরহ লালায়িত হই; আমাদের মানসপটে স্নেহজাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তিসূচক বিবর্তনের ছাপ রয়ে যাওয়ার কারণেই এটি ঘটে।

এ ধরনের আরও উদাহরণ হাজির করা যায়। আমরা (কিংবা আমাদের পরিচিত অনেকেই) মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠি। কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পাই না (উপরে শিকারি-সংগ্রাহক পরিস্থিতি ব্লক দ্রষ্টব্য)।

অথচ কে না জানে, প্রতি বছর তেলাপোকার আক্রমণে যত মানুষ না মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরে ট্রাকের তলায় পড়ে। অথচ ট্রাককে ভয় না পেয়ে আমরা ভয় পাই নিরীহ তেলাপোকাকে। এটাও কিন্তু বিবর্তনের কারণেই ঘটে। বনে –জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতঙ্গকে ভয় পাওয়ার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের জিনে বহন করি। সে হিসেবে, বাস ট্রাকের ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এগুলোকে ভয় পাওয়ার কোনো স্মৃতি আমরা এখনও আমাদের জিনে (এখনও) তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যই বোধ হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিডা কসমিডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন—'Our modern skull house a stone age of mind'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান : চেনা সমীকরণের ভুলে যাওয়া অংশটুকু

মানুষের প্রকৃতি গঠনে পরিবেশ এবং জিন দুইয়েরই জোরালো ভূমিকা আছে। পরিবেশের যে ভূমিকা আছে সেটা সবারই জানা। বড় বড় সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সবাই পরিবেশের গুরুত্বের কথা জানেন। কিন্তু সেই তুলনায় মানবপ্রকৃতি গঠনের পেছনে যে জিনেরও জোরালো ভূমিকা আছে সেটা কিন্তু বহু লোকেই জানে না। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তো বটেই, এমনকি শিক্ষায়তনেও ব্যাপারাটা উহ্যই ছিল এতদিন। এখন সময় পাল্টেছে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা আকর্ষণীয় গবেষণায় প্রতিদিনই হারিয়ে যাওয়া অংশের খোঁজ পাচ্ছেন। এই বইয়ে পরিবেশ এবং জিন নিয়ে কমবেশি আলোচনা করা হলেও, প্রাজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবে না যে, অনাদরে উপক্ষিত অংশটির উপরেই বেশি জোর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং তা করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। আমার মতে জিন তথা জৈববিজ্ঞানের অংশটুকু আমাদের অতি চেনা সমীকরণের 'ভুলে যাওয়া' অংশ। আধুনিক গবেষণার নিরিখে নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে

পারছি, তা বস্তুনিষ্ঠভাবে বাঙালি পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

যে কথাটি এই বইয়ে বারে বারে আসবে তা হলো, বিবর্তন মনোবিদ্যা শুধু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করছে না, সেই সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের বহু প্রচলিত অনুকল্প এবং ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। সারমর্ম করলে ব্যাপারগুলো দাঁড়াবে অনেকটা এরকম—

ক) মানুষ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, জীবজগতেরই অংশ: বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্বীকার্যই হচ্ছে মানুষকে জীবজগতেরই অংশ হিসেবে চিন্তা করা। যতই অস্বস্তি লাগুক আমাদের শুনতে, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষ এক ধরনের পশু বৈ আর কিছু নয়[26] । তার মানে কিন্তু এই নয় যে মানবসমাজে কোনো অনন্য বৈশিষ্ট্য নেই। নিশ্চয় আছে। সে জন্যই তো মানুষ আলাদা একটি প্রজাতি। কুকুর, বিড়াল, হাতি, গরিলা যেমন আলাদা প্রজাতি, ঠিক তেমনি মানুষও একটি প্রজাতি। আর মানুষের মতো সব প্রজাতিতেই অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজলে পাওয়া যাবে। মেরুভল্লুকের লোমশ শরীর, মৌমাছিদের ফুল থেকে মধু আহরণের ক্ষমতা, কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি কিংবা চিতা বাঘের ক্ষীপ্রতা নিঃসন্দেহে তাদের নিজ নিজ প্রজাতির জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করি। অথচ মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলেই জীববিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল সামাজিক মডেলগুলোর শরণাপন্ন হন সমাজবিজ্ঞানীরা। এমন একটা ভাব যে, মানুষ অন্য প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কিছু, জীববিজ্ঞান এখানে অচল। না, এই দৃষ্টিভিঙ্গিটিকেই ভুল বলে মনে করেন সামাজিক জীববিজ্ঞানী এবং বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা। বিখ্যাত সামাজিক জীববিজ্ঞানী পিয়ারি এল ভ্যান দেন বার্গি (Pierre L. van den Berghe) সেজন্যই বলেন—

---

[26] Laura Betzig, People are Animals, Human Nature: A Critical Reader, New York: Oxford University Press, 1997

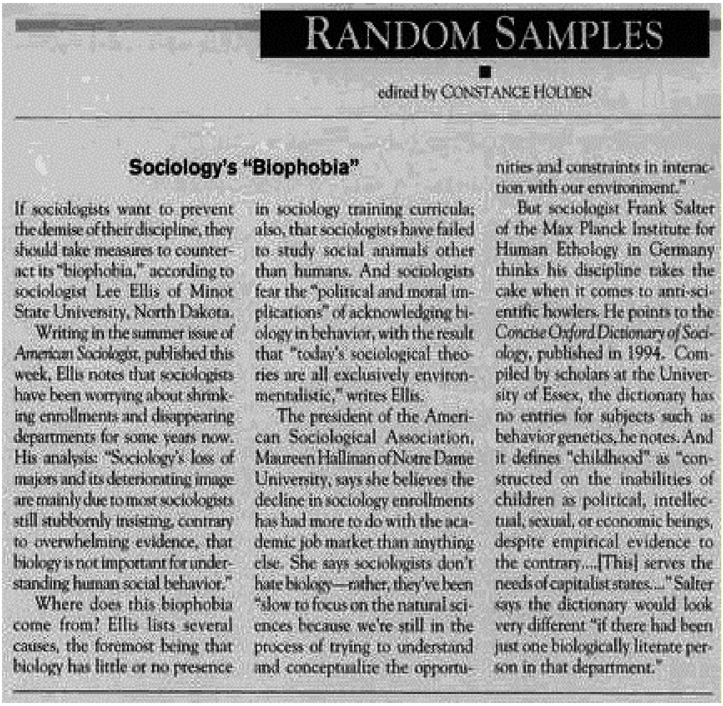
> নিঃসন্দেহে আমরা অনন্য। কিন্তু আমরা স্রেফ অনন্য হবার জন্য অনন্য নই। বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে—প্রতিটি প্রজাতিই আসলে অনন্য, এবং তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে গিয়ে দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই উদ্ভূত হয়েছে।

মানবসমাজের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য কিংবা জটিলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবজগতেরই অংশ। অথচ, সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত প্রমিত মডেল মানুষকে অন্য প্রাণিজগৎ থেকে একেবারেই আলাদা করে ফেলে দেখার পক্ষপাতি। অতীতে বহু সমাজবিজ্ঞানীই জৈবিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানবসমাজের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনাসক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন। গবেষক এলিস লী দাবি করেছেন জৈবিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীদের অনীহা, বিরক্তি এবং ভীতি যেটাকে এলিস 'বায়োফোবিয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন, ধীরে ধীরে শাখাটির পতন ডেকে আনছে[27]।

খ) মানব মস্তিষ্ক স্বর্গীয় কিছু নয়, বিবর্তন প্রক্রিয়ারই উপজাত: প্রতিটি জীব—সেটা মানুষই হোক আর তেলাপোকাই হোক, কতগুলো কর্মক্ষম অংশের (functional parts) সমাহার। জীবের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ, যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, রক্ত, হাড়, মাংশপেশী, যকৃত, চামড়া, অন্ত্র, জননগ্রন্থি সবগুলোরই আলাদা কাজ আছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে এই কর্মক্ষম অংশগুলোর কাজকে আলাদাভাবে দেখার এবং সঠিকভাবে বিশ্লেষণের উপরেই। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বিভিন্ন অঙ্গের আলাদা কাজ করার ক্ষমতাকে বলে অভিযোজন বা এডাপ্টেশন। আর এই অভিযোজন ঘটে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নামে একটি ধীর স্থির এবং দীর্ঘকালীন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

---

27 Ellis Lee, A Discipline in Peril: Sociology's Future Hinges on Curing Biophobia, American Sociologist 27, : p 21–41, 1996



RANDOM SAMPLES

edited by CONSTANCE HOLDEN

Sociology's "Biophobia"

If sociologists want to prevent the demise of their discipline, they should take measures to counteract its "biophobia," according to sociologist Lee Ellis of Minot State University, North Dakota.

Writing in the summer issue of *American Sociologist*, published this week, Ellis notes that sociologists have been worrying about shrinking enrollments and disappearing departments for some years now. His analysis: "Sociology's loss of majors and its deteriorating image are mainly due to most sociologists still stubbornly insisting, contrary to overwhelming evidence, that biology is not important for understanding human social behavior."

Where does this biophobia come from? Ellis lists several causes, the foremost being that biology has little or no presence in sociology training curricula; also, that sociologists have failed to study social animals other than humans. And sociologists fear the "political and moral implications" of acknowledging biology in behavior, with the result that "today's sociological theories are all exclusively environmentalistic," writes Ellis.

The president of the American Sociological Association, Maureen Hallinan of Notre Dame University, says she believes the decline in sociology enrollments has had more to do with the academic job market than anything else. She says sociologists don't hate biology—rather, they've been "slow to focus on the natural sciences because we're still in the process of trying to understand and conceptualize the opportunities and constraints in interaction with our environment."

But sociologist Frank Salter of the Max Planck Institute for Human Ethology in Germany thinks his discipline takes the cake when it comes to anti-scientific howlers. He points to the *Concise Oxford Dictionary of Sociology*, published in 1994. Compiled by scholars at the University of Essex, the dictionary has no entries for subjects such as behavior genetics, he notes. And it defines "childhood" as "constructed on the inabilities of children as political, intellectual, sexual, or economic beings, despite empirical evidence to the contrary....[This] serves the needs of capitalist states...." Salter says the dictionary would look very different "if there had been just one biologically literate person in that department."

চিত্র: এলিস লী সহ অনেক গবেষকই মনে করছেন যে, সমাজবিজ্ঞানীদের জৈবভীতি বা ‘বায়োফোবিয়া’ তাদের শাখাটির ক্রমশ পতন ডেকে আনছে।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন দেহের অন্যান্য অঙ্গের বিকাশে যেভাবে প্রভাব রেখেছে, ঠিক সেরকমভাবেই প্রভাবিত করেছে মস্তিষ্ককে এবং এর সাথে জড়িত স্নায়বিক বর্তনীকেও। কাজেই মস্তিষ্ককেও বিবর্তনের উপজাত হিসেবেই দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে অভিযোজনের মিথস্ক্রিয়ার সমন্বিত প্রতিরূপ হিসেবেই[28]।

সমাজবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশই ভুলভাবে মনে করেন বিবর্তন বোধ হয়

[28] Edward H. Hagen, Institute for Theoretical Biology, Berlin, Is evolutionary psychology another form of genetic determinism?, The Evolutionary Psychology FAQ, http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/epfaq/determinism.html

ঘাড়ের কাছে এসে থেমে গেছে, এর উপরে আর উঠেনি[29]। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারেই ভুল মনে করেন। মানুষের হাতের আঙুল কিংবা পায়ের পাতা তৈরিতে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যৌনতার নির্বাচনসহ বিবর্তনের নানা প্রক্রিয়াগুলো ভূমিকা রেখে থাকে, মস্তিষ্ক তৈরির ব্যাপারেও এটি ভূমিকা রাখবে এটাই স্বাভাবিক। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে সূত্রগুলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য সত্যি মনে করেন, সেগুলো মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যও ব্যবহার করতে চান। তারা (যৌক্তিকভাবেই) মনে করেন, বিবর্তন কখনোই ঘাড়ের কাছে হঠাৎ করেই এসে শেষ হয়ে যায়নি, বরং উঠে গেছে একদম উপর পর্যন্ত।

গ) মানবপ্রকৃতি কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট নয়: সমাজবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ মানবপ্রকৃতিকে একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লেট বা তাবুলা রাসা (Tabula rasa) হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন[30]। তারা মনে করেন, প্রতিটি মানুষ একটা স্বচ্ছ স্লেটের মতো প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়, আর তারপর মানুষ যত বড় হতে থাকে তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশ লিখিত হতে থাকে। কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞানীদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত বিরুদ্ধে বেশ কিছু জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়ছে এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেজন্যই জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম

[29] Anne Campbell, Staying alive: Evolution, culture, and women’s intrasexual aggression, Behavioral And Brain Sciences 22, 203–252, 1999. গবেষণাপত্রটির প্রসঙ্গিক অংশ বিশেষ -

"...Presumably they (social scientists) would acknowledge that such physical differences are the result of evolution. However, their argument suggests that natural selection “**stopped at the neck**,” having no impact upon the minds of the two sexes. It seems arbitrary to exclude from the purview of evolution the most expensive and behaviorally critical organ of the body (and one incidentally that is intimately involved in the endocrinological processes that maintain the physical differences they do acknowledge). The products of the mind which differ between the sexes (e.g., fear, aggression) are suggested to be acquired during socialization yet behavioral genetic studies strongly suggest that psychological traits are only minimally influenced by the home rearing environment."

[30] Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, Viking; 2002

হ্যামিলটন জোরের সাথে বলেন[31], 'The *tabula* of human nature was never *rasa* and it is now being read'।

ঘ) মানবপ্রকৃতি এবং সংস্কৃতি বংশাণু এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল : এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ব্যাপৃত হয়েছে পরিবেশ নির্ণয়বাদ বনাম বংশাণু নির্ণয়বাদকে কেন্দ্র করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানীর যেহেতু ধরেই নেন যে, মানবপ্রকৃতি অনেকটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের মতো, তাই তারা কেবল পরিবেশ এবং সামাজিকীকরণের উপরই জোর দেন, অস্বীকার করেন বংশগতি সংক্রান্ত যে কোনো উপাত্তকে যা মানবপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু এই বইয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখানো হয়েছে যে, জেনেটিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রণেই মূলত গড়ে উঠে মানবপ্রকৃতি। মানবপ্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশাণুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। তাই সম্পূর্ণ বংশাণুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়াটা চরম এবং ভুল অবস্থান, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই। পাঠকেরা বইয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এ নিয়ে চিন্তার উদ্রেককারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনার সন্ধান পাবেন বলে আশা করছি।

প্রতিটি অধ্যায়েই উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো নানাভাবে উঠে আসবে, দেখানোর চেষ্টা থাকবে যে, মানবপ্রকৃতি আসলে জিন-কালচার কোএভুলুশনেরই ফল, এবং এ দুয়ের সুষম সংমিশ্রণ। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি হেত্বাভাস (fallacy) নিয়ে সতর্ক থাকা দরকার, তা নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান: যে হেত্বাভাসগুলো নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন

[31] Endorsement of cover of Laura Betzig's book, People are Animals, Human Nature: A Critical Reader, New York: Oxford University Press, 1997.

কী বনাম উচিত এর হেত্বাভাস ("Is" vs. "Ought" fallacy): এই বইটি পড়লে পাঠকেরা মানবপ্রকৃতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের একটা প্যাটার্নের ব্যাখ্যা পাবেন বেশিরভাগ জায়গাতেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই প্যাটার্নটাই আপনার আমার সবার জন্যই প্রযোজ্য, কিংবা সেটাই সর্বোত্তম। কেন সমাজ বা মানবপ্রকৃতির বড় একটা অংশ কোনো একটা নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে সেটা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, সমাজ কী রকম হওয়া 'উচিত' তা নয়। আরও পরিষ্কার করে বললে বিবর্তন কোনো অথোরিটি দাবি করে না। কাজেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য কেউ ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সমাজে প্রয়োগ করার ঔচিত্যের আহ্বান জানালে সেটা নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্তি বা হেত্বাভাস হবে। কী বনাম উচিত এর কুযুক্তিকে হেত্বাভাস হিসেবে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন আঠারো শতকের বিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ ডেভিড হিউম[32]।

প্রাকৃতিক হেত্বাভাস (Naturalistic fallacy) :আগেই বলেছি, এই বইয়ে বহু জৈবিক প্যাটার্নের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পাবেন পাঠকেরা। কিন্তু কোনো কিছু প্রাকৃতিক হলেই সেটা 'ভালো'—এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা একটি বড় ধরনের ভ্রান্তি। যেমন, বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা পাই কেন পুরুষদের মন মানসিকতা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে বেড়ে উঠেছে, কিংবা কেন তারা অপেক্ষাকৃত সহিংস আর কেন মেয়েরা গড়পড়তা পুরুষদের চেয়ে জৈবিকভাবে বেশি স্নেহপরায়ণ। কিন্তু তার মানে কেউ যদি মনে করেন যে, তাহলে মেয়েরা কেবল গৃহস্থালির কাজ করবে, শিশু আর তার স্বামীপ্রভুর যত্ন-আত্তি করবে, আর ছেলেরা বাইরে ডাণ্ডাগুটি মেরে বেড়াবে—সেটা হবে একটি প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ। আমরা জানি এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল 'স্বাভাবিক' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা

[32] David Hume, A Treatise of Human Nature, London: John Noon. p. 469, 1739.

সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে[33] —

> যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু-গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের 'প্রাকৃতিক'। আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোশাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজাড় করে চলেছে—তারা সবাই আসলে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কুকর্মে নিয়োজিত—কারণ, 'প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না'। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, নাসার মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপন থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা 'শিক্ষিত জনেরা' বড্ড ভালোবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামী, উভকামীদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্দুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরনের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজিতে এই

---

[33] রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষ্যে, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। এছাড়া মুক্তমনায় রাখা 'Tagore without Illusion' পাতাটিও দেখা যেতে পারে।

হেত্বাভাসের পুঁথিগত নাম হলো—'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল' বা 'অ্যাপিল টু নেচার'[34]। এমনি কিছু 'অ্যাপিল টু নেচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক—

১। মিস্টার কলিঙ্গের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিঙ্গ ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মতো গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কমপ্লিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হতো, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?

৫। প্রকৃতিতে প্রায় প্রতিটি প্রজাতিতেই বহুগামিতা দৃশ্যমান, কাজেই মানবসমাজে বহুগামিতা গ্রহণ করে নেওয়াই সমীচীন।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। এমনি

---

[34]হেত্বাভাস নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য http://www.infidels.org/ library/modern/ mathew/logic.html দ্রষ্টব্য

উদাহরণ দেওয়া যায় বহু। আমি আমার সমকামিতা (২০১০) বইয়ে[35] এ ধরনের বহু প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছিলাম। সেগুলো এই বইয়ের জন্যও প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের ব্যাপারটি হেত্বাভাস হিসেবে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন বিশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজ দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মুর[36]।

নৈতিক হেত্বাভাস (Moralistic fallacy) :নৈতিক হেত্বাভাস হচ্ছে প্রাকৃতিক হেত্বাভাসের ঠিক উলটো। এর প্রবক্তা হার্ভাডের মাইক্রোবায়োলজিস্ট বার্নাড ডেভিস[37]। এই ধরনের ভ্রান্তি যারা করেন, তারা 'উচিত'কে 'কী' দিয়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। কোনো কিছু নৈতিকভাবে সঠিক বলে মনে হলেই সেই ব্যাপারটাকে প্রাকৃতিক মনে করাটাই এই ভ্রান্তির মোদ্দাকথা। যেমন, 'ধর্ষণ করা অনৈতিক, ফলে প্রকৃতিতে জীবজগতে কোথাও ধর্ষণ নেই'—এটা একটি নৈতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ। কিংবা কেউ যদি বলেন, 'মানবসমাজের শিক্ষায়তনে কোনো ধরনের বৈষম্য লালন করা হয় না, ফলে প্রকৃতিতেও কোনো ধরনের বৈষম্য নেই'—এটাও নৈতিক হেত্বাভাসের উদাহরণ হবে।

এই বইয়ে যতদূর সম্ভব এ ধরনের হেত্বাভাসগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইয়ের উদ্দেশ্য কেবল নির্মোহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখানো কীভাবে প্রকৃতি কিংবা সমাজের বিভিন্ন প্যাটার্ন কাজ করে, কিন্তু সমাজ কিংবা প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনো মতামত দেয়া হয়নি। আমার প্রত্যাশা থাকবে আমার এই বইয়ের পাঠকেরাও এই বই থেকে কোনো ধরনের বৈধতাসূচক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে উপরের হেত্বাভাসগুলোকে স্মরণ করবেন।

---

35 অভিজিৎ রায়, সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর, ২০১০

36 G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press., 1903

37 B. D. Davis,The moralistic fallacy, Nature. 30;272(5652):390, 1978

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্ল্যাঙ্ক স্লেট

মানুষ কি সত্যই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়?

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনেক কিছু খুব পরিষ্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও, এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক (Radical) যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনও হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। একটা বড় কারণ হতে পারে—আমাদের মধ্যকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, শিশুরা জন্ম নেয় একটা স্বচ্ছ স্লেটের মতো, মানুষ যত বড় হতে থাকে—তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশ লিখিত হতে থাকে। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ সবকিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে একমাত্র পরিবেশ। খারাপ পরিবেশে থাকলে স্লেটে লেখা হবে হিংস্রতা কিংবা পাশবিকতার বীজ, আর ভালো পরিবেশ পেলে স্লেটও হয়ে উঠবে আলোকিত। ব্রিটিশ দার্শনিক লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এখনও অনেকেই (বিশেষত যাদের আধুনিক জেনেটিক্স কিংবা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান পড়া হয়ে উঠেনি) এই মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই ধারণাটি বোধগম্য কারণেই খুবই জনপ্রিয়। কিছুদিন আগেও আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তার এক বক্তৃতায় বললেন—

'একটি শিশু যখন ৬ বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে তার মন থাকে যেন

শুন্য এক বাস্কেট। তারপর ধীরে ধীরে তাদের বাস্কেট ভর্তি হতে শুরু করে। ১৮ বছর বয়স হতে হতে তাদের শূন্য বাস্কেট প্রায় পুরোটাই ভর্তি হয়ে উঠে। এখন কথা হচ্ছে কাকে দিয়ে শিশুটির এই বাস্কেট পূর্ণ হবে? এটা কি ভালো একজন শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু নাকি অসৎ মানুষজনদের দিয়ে?'

এই ব্ল্যাঙ্ক স্লেট তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে খুবই জনপ্রিয় এবং বোধ্য কারণেই। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডুর্খাইম ১৮৯৫ সালেই বলেছিলেন যে, 'সমাজবিজ্ঞানের প্রধান অনুকল্পই হলো প্রতিটি মানুষকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হিসেবে চিন্তা করতে হবে। মানুষ হচ্ছে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট-অন হুইচ কালচার রাইটস'। এর পর থেকে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' দর্শনটি সমাজবিজ্ঞানের জগতে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই পরিগণ্য হয়—'সব মানুষ আসলে জন্মগতভাবে সমান, খারাপ পরিবেশের কারণেই মানুষ মূলত খারাপ হয়ে উঠে'।

কিন্তু এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'-এর ধারণা কি আসলে মানবমনের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে? হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার ২০০২ সালে একটি বই লেখেন 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' নামে[38]। তিনি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে গেঁথে যাওয়া এবং জনপ্রিয় এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একে একধরনের 'ডগমা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন[39]।

পিঙ্কার দাবি করেন, আমাদের কানে যতই অস্বস্তিকর শোনাক না কেন, কোনো শিশুই আসলে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' হয়ে জন্ম নেয় না। বরং একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় কিছু না কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে পুঁজি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ছাপ পরিণত অবস্থাতেও রাজত্ব করে অনেক ক্ষেত্রেই। শুধু মানুষ কেন—প্রাণিজগতের দিকে দৃষ্টি দিলেও ব্যাপারটা খুব ভালোমতই বোঝা যাবে। গুবরে

---

38 Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, Viking; 2002

39 ইন্টারনেটে ইউটিউবে অধ্যাপক পিঙ্কারের কিছু লেকচার রাখা আছে, উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে হবে মনের খোরাক। অধ্যাপক পিঙ্কারের বক্তৃতার ইউটিউবের লিঙ্ক : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c

পোকাকে ধরবার জন্য ইঁদুর যত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, কবুতর তত তাড়াতাড়ি পারে না। বিড়াল যত ভালোভাবে রাতে দেখতে পায়, মানুষ তা পায় না। এই বিষয়গুলো কোনোভাবেই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করা যায় না একই প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলোও। একই প্রজাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেউবা শ্লথ, কেউবা ক্ষিপ্র, কেউবা বাচাল, কেউবা শান্ত, কেউবা অস্থির, কেউ বা রয়ে যায় খুব চুপচাপ। জিনগত পার্থক্যকে গোনায় না ধরলে করলে প্রকৃতির এত ধরনের প্রকরণকে কোনো ভাবেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

১৯৮০র দশকে টম ইনসেল নামে এক বিজ্ঞানী প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস নামে দু' প্রজাতির ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন প্রেইরি ভোলস নামের ইঁদুরগুলো নিজের মধ্যে একগামী সম্পর্ক গড়ে তুলে, যৌনসঙ্গীর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকে, বাচ্চা হবার পর তাদের পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে অনেকটা সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। আর মোন্টেন ভোলসগুলো স্বভাবে ঠিক উলটো। তারা স্বভাবত বহুগামী, এমনকি বাচ্চা জন্মানোর পর সামান্য সময়ের জন্য বাচ্চাদের পরিচর্যা করার পর আর এদের দিকে নজর দেয় না। টম ইনসেল প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস এর মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে তেমন কোনো পার্থক্যই পেলেন না, কেবল প্রেইরি ভোলস নামের ইঁদুরগুলোর ব্রেনে অক্সিটোসিন নামে এক ধরনের হরমোনের আধিক্য লক্ষ করলেন। তিনি আরও লক্ষ করলেন মোন্টেন ভোলস ইঁদুরগুলোর ব্রেনে এই হরমোন একেবারেই নগণ্য। কেবল, বাচ্চা জন্মানোর পর স্ত্রী মোন্টেন ভোলসের মস্তিষ্কে এই হরমোনের আধিক্য সামান্য সময়ের জন্য বেড়ে যায়। টম ইনসেল দেখলেন সেই সামান্য সময়টাতেই স্ত্রী ইঁদুর আর তার বাচ্চার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধনের উপস্থিতি থাকে। টম ইনসেল কৃত্রিমভাবে ইঁদুরদের ব্রেনে অক্সিটোসিন প্রবেশ করিয়ে তাদের স্বভাব এবং প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করলেন। দেখা গেল, এই হরমোনের প্রভাবে মোন্টেন ভোলস ইঁদুরগুলো তাদের পছন্দের বহুগামী স্বভাব পরিবর্তন করে তার যৌনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ

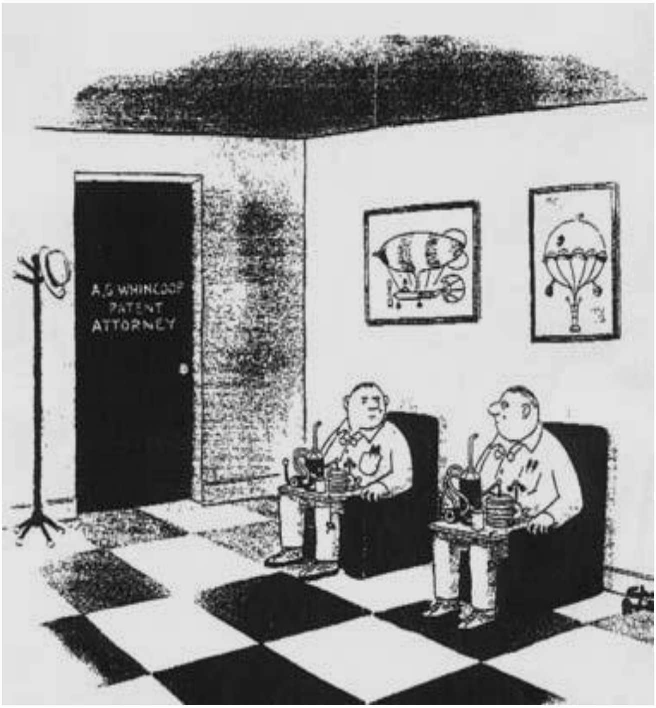
ধরনের আরও গবেষণা করে দেখেছেন, জিন ম্যানিপুলেশন করে নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে আগ্রাসন, নমনীয়তা, হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা বা শ্লথতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য তারা ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ, বংশাণুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে প্রাণীদের স্বভাবেও পরিবর্তন আসে। এখন কথা হচ্ছে, মানুষও কিন্তু প্রকৃতিজগৎ এবং প্রাণিজগতের বাইরের কিছু নয়। অথচ, বংশাণুজনিত পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে স্বভাবগত পার্থক্য হতে পারে— মানুষের ক্ষেত্রে এই রূঢ় সত্যটি মানতে অনেকেই আপত্তি করবেন।

বংশাণুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য যদি মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের বলিষ্ঠ ব্যখ্যা হয়, তবে কাছাকাছি বা প্রায় একই বংশাণুযুক্ত লোকজনের ক্ষেত্রে একই স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া উচিত। স্টিভেন পিঙ্কাররা বলেন তাই পাওয়া যাচ্ছে। পিঙ্কার তার 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইয়ে অভিন্ন যমজদের (আইডেন্টিকাল টুইন) নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার বেশ কিছু মজার উদাহরণ হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অভিন্ন যমজদের একে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন পরিবেশে বড় করা হলেও তাদের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য থেকেই যায়, শুধু চেহারায় নয়—আচার, আচরণ, অভিরুচি, খাওয়া দাওয়া এমনকি ধর্মকর্মের প্রতি আসক্তিতেও। ইউনিভার্সিটি অব মিনিসোটার গবেষকেরা একসময় পঞ্চাশ জোড়া অভিন্ন যমজদের নিয়ে গবেষণা করেন, যে যমজেরা জন্মের পর পরই কোনো না কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বড় হয়েছিল। তাদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকেরা লক্ষ করলেন, তারা আলাদা পরিবেশে বড় হলেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া সহোদরের সাথে আচার-আচরণে অদ্ভুত মিল থাকে। সবচেয়ে মজার হচ্ছে অভিন্ন যমজ সহোদর অস্কার এবং জ্যাকের উদাহরণটি। জন্মের পর পরই বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্কার বড় হয়েছিল চেকোশ্লাভাকিয়ার এক নাৎসি পরিবারে, আর জ্যাক বড় হয়েছিল ত্রিনিদাদের ইহুদি পরিবারে। তারপরও তারা যখন চল্লিশ বছর পরে প্রথমবারের মতো মিনিসোটায় একে অপরের সাথে দেখা করতে আসলেন, তখন দেখা গেল তারা দুজনেই গাঢ় নীল রঙের শার্ট পড়ে উপস্থিত হয়েছেন,

তাদের দুজনের হাতের কব্জিতেই রাবারব্যান্ড লাগানো। দুজনেই কফিতে বাটার টোস্ট ডুবিয়ে খেতে পছন্দ করতেন; তাদের দুজনেই বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে টয়লেট ব্যবহারের আগেই একবার করে ফ্ল্যাশ করে নিতেন, এমনকি দুজনেরই একটি সহজাত মুদ্রাদোষ ছিল—দুজনেই এলিভেটরে উঠে হাঁচি দেয়ার ভঙ্গি করতেন, যাতে লিফটের অন্য সহযাত্রীরা আঁতকে উঠে দু'পাশ থেকে সরে যায়। থমাস বুচার্ড নামের আরেক গবেষকের গবেষণায় জিম স্প্রিঙ্গার এবং জিম লুইস নামের আরেকটি অভিন্ন যমজের চাঞ্চল্যকর মিল পাওয়া গিয়েছিল যা মিডিয়ায় রীতিমত হৈচৈ ফেলে দেয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে বড় হবার পরও জিম-যমজদ্বয় যখন একত্রিত হলো, দেখা গেল—তাদের চেহারা এবং গলার স্বরে কোনো পার্থক্যই করা যাচ্ছে না। একই রকম বাচনভঙ্গি, একই রকম চাহনি, একই রকম অবসাদগ্রস্ত চোখ। তাদের মেডিকেল-হিস্ট্রি থেকে জানা গেল, তারা দুজনেই উচ্চ রক্তচাপ, হেমোরইডস এবং মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন। তারা দুজনেই সালীম সিগারেটের ভক্ত, দুজনেরই টেনশনে নখ কামড়ানোর অভ্যাস আছে এবং দুজনের জীবনের একই সময় ওজন বাড়া শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয়—তাদের দুজনের কুকুরের নাম 'টয়'। তাদের দুজনের স্ত্রীদের নাম 'বেটি', এবং তাদের দুজনেরই আগে একবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এবং এদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নামও কাকতালীয় ভাবে এক—'লিন্ডা'। এখানেই শেষ নয়—দুজনের প্রথম সন্তানের নামও ছিল একই—'জেমস অ্যালেন'; যদিও নামের বানান ছিল একটু ভিন্ন। আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা গেল দুই যমজ মহিলা হাতে একই সংখ্যার আংটি পড়ে এসেছিলেন। তাদের একজন প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন রিচার্ড এন্ড্রু, আর অপরজন রেখেছিলেন এন্ড্রু রিচার্ড। সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসমস্ত মিলগুলোকে নিতান্তই 'কাকতালীয়' কিংবা 'অতিরঞ্জন' ভাবার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও মূল উপসংহার কিন্তু ফেলে দেয়ার মতো নয়—আমরা আমাদের স্বভাব-চরিত্রের অনেক কিছুই হয়তো আসলে বংশাণুর মাধ্যমে বহন করি এবং দেখা গেছে অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে এই উপরের 'কাকতালীয়' মিলগুলো অসদ যমজদের থেকে সবসময়ই বেশি থাকে। শুধু মিনিসোটার যমজ গবেষণা নয়; ভার্জিনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের গবেষকেরাও

তাদের গবেষণা থেকে একই ধরনের ফল পেয়েছেন। এ ধরনের বেশকিছু গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে উইলিয়াম ক্লার্ক এবং মাইকেল গ্রুন্সটেইনের 'আমরা কি নিয়ন্ত্রিত? মানব আচরণে জিনের ভূমিকা' নামের বইটিতে[40]। লেখকেরা বলেছেন —

> 'For nearly all measures personality, heritability is high in western society: identical twins raised apart are much more similar than the fraternal twins raised apart.'।



চিত্র: একটি মজার কার্টুন - জন্মের পর পরই পৃথক হয়ে যাওয়া দুই যমজের হঠাৎ দেখা! (কার্টুনিস্ট - চার্লস এডামস); কার্টুনটি স্টিভেন পিঙ্কারের 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইটি থেকে নেওয়া।

সাইকোপ্যাথ এবং সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও আমাদের

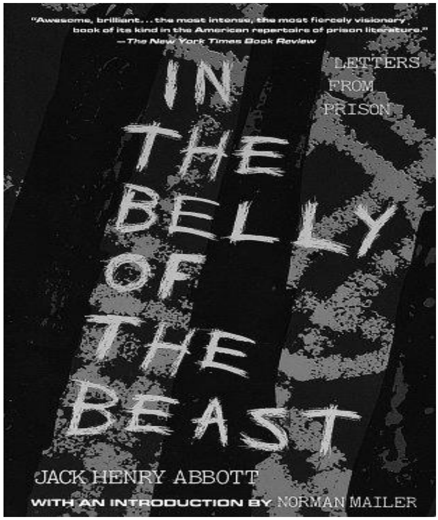
---

[40] William R. Clark and Michael Grunstein, Are We Hardwired?: The Role of Genes in Human Behavior, Oxford University Press, USA, 2004

জন্য অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি যখন এ লেখাটি লিখতে শুরু করেছি, তখন আমেরিকান মিডিয়া 'ক্রেগলিস্ট কিলার' খ্যাত ফিলিপ মার্ডফকে নিয়ে রীতিমত তোলপার। ফিলিপ মার্ডফ বস্টন মেডিকেলের ছাত্র। পড়াশোনায় ভালো। চুপচাপ শান্ত বলেই পরিচিতি ছিল তার। একজন গার্লফ্রেন্ডও ছিল তার। সামনেই বিয়ে করার কথা ছিল তাদের। ফিলিপ আর তার ভাবীবধূর ছবি সমন্বিত ওয়েবসাইটও সে বানিয়ে রেখেছিল। কে জানত যে, এই গোবেচোরা ধরনের নিরীহ রোমান্টিক মানুষটিই রাতের বেলা কম্পিউটারে বসে বসে ক্রেগলিস্ট থেকে মেয়েদের খুঁজে নিয়ে হত্যা করত! পুলিশের হাতে যখন একদিন ফিলিপ ধরা পড়লো, সহপাঠীরা তো অবাক। এমন গোবেচরা ছেলেটির মধ্যে এমন দানব লুকিয়ে ছিল? গার্লফ্রেন্ডটি তখনো ডিনায়ালে—'ফিলিপের তো মাছিটা মারতেও হাত কাঁপত, সে কী করে এত মানুষকে হত্যা করবে? পুলিশ নিশ্চয় ভুল লোককে ধরেছে'। আমেরিকায় প্রতি ২৫ জনে একজন মনোবিকারগ্রস্ত সাইকোপ্যাথ আছে বলে মনে করা হয়। মনোবিজ্ঞানী মার্থা স্কাউট তার 'বাড়ির পাশেই বিকারগ্রস্ত খুনি' বইয়ে অন্তত তিনটি জার্নাল থেকে রেফারেন্স হাজির করে দেখিয়েছেন যে, আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে একজন মনোবিকারগ্রস্ত সাইকোপ্যাথ[41]। তারা আমার আপনার মতো একই রকম 'ভালো পরিবেশে' বাস করছে, দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে কিন্তু আপনার আমার মতো সচেতনতা জিনিসটাকে মাথায় ধারণ করে না। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন রবার্ট হেয়ার তার 'বিবেকহীন: আমাদের মাঝে সাইকোপ্যাথদের অশান্ত পৃথিবী' নামের বইয়ে । কোনো নিয়ম, নীতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। আসলে এসমস্ত 'মানবিক' বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একজন সাইকোপ্যাথের কাজকে ব্যাখ্যার চেষ্টাই হবে বোকামি। অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবে মনোবিকারগ্রস্ত সাইকোপ্যাথ তার মাথায় যেটা থাকে, সেটা করেই ছাড়ে।

[41] Martha Stout, The Sociopath Next Door, Three Rivers Press, 2006

যখন কোনো সাইকোপ্যাথের মাথায় ঢোকে কাউকে খুন করবে, সেটা সম্পন্ন করার আগ পর্যন্ত তার স্বস্তি হয় না। পিঙ্কার তার বইয়ে জ্যাক এবট্ নামক এক সাইকোপ্যাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন খুন করার আগের মানসিক অবস্থা তুলে ধরে—



> তুমি টের পাবে যে তার জীবন-প্রদীপ তোমার হাতে ধরা ছুরির মধ্যে দিয়ে তির তির করে কাঁপছে। তুমি বুঝতে পারবে হত্যার জিঘাংসা তোমাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। তোমার শিকারকে নিয়ে একটু নিরালয়ে চলে যাবে যেখানে গিয়ে তুমি তাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারো। ...মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকানোর মতোই সহজ একটা কাজ—কোনো ধরনের বাধাই তুমি পাবে না। তাদের চোখে শেষ মুহূর্তে এক ধরনের অন্তিম কাতরতা দেখবে, যা তোমাকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলবে।

প্রথম অধ্যায় শুরু করেছিলাম মন্টু মিয়ার গল্প দিয়ে যে কি না ইলাস্টিক দিয়ে জানালার কাচ ভাঙতো—সেই মন্টু মিয়া হয়তো মনোবিকারগ্রস্ততার একটু ছোট স্কেলের উদাহরণ। বড় বড় উদাহরণগুলোর কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি। জ্যাক দ্য রিপার, 'বিটিকে কিলার' ডেনিস রেডার, 'গ্রীন রিভার কিলার' গ্রে রিজ ওয়ে, 'সন অব স্যাম' ডেভিড বার্কোউইজ, 'বুচার অব রুস্তভ' আঁদ্রে চিকাতিলো, চার্লস এং, ডেরিক টড লি, জন ওয়েন গেসি প্রমুখ। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে বিষয়টি তুলে এনেছেন তার বইয়ে পিঙ্কার, সেটি হলো—''মনোবিকারগ্রস্তদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা যায় না''। তিনি বলেন,

> আমরা যতদূর জানি, বিকারগ্রস্ত খুনিদের (সাইকোপ্যাথ) নিরাময় করা যায় না। বরং ম্যারিন রাইস দেখিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসা প্রদান - যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা হিতে বিপরীত হয়ে বিকারগ্রস্ত খুনিদের আরও বিপজ্জনক করে তুলে।

সমাজের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে যে মনোবিকারগ্রস্ত মানুষদের স্বভাব অনেক সময়ই পরিবর্তন করা যায় না সেই ‘সত্যটি’ (?) পিঙ্কার তার বইয়ে তুলে ধরেছেন উপরে উল্লিখিত জ্যাক এবট্-এর একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি এরকম : পুলিতজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক নর্মান মেইলার জেলখানায় বন্দি দাগি আসামি জ্যাক এবট্-এর কিছু চিঠি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে, যে তিনি নর্মান মেইলারকে জামিনে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন। নর্মান মেইলার সে সময় গ্যারি গিলমোর নামের আরেক অপরাধীকে নিয়ে একটি বই লেখার কাজ করছিলেন। জ্যাক এবট্ তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখককে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন। জ্যাক এবট্-এর রচনা এবং চিন্তা ভাবনা নর্মান মেইলারকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি এবট্কে ‘প্রথাবিরুদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভাবনাময় লেখক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁকে লেখা এবট্-এর চিঠিগুলো সংকলিত করে তিনি ১৯৮০ সালে এবট্-এর একটি বই প্রকাশ করতে সহায়তাও করেন, বইটির নাম ছিল ‘জানোয়ারের উদরে’ (In the belly of the beast)[42]।

বইটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নর্মান মেইলারের তদ্বিরে ছাড়া পাওয়ার পর এবট্ বেশ নামিদামি মহলে অনেক বিদগ্ধ লোকজনের সাথে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত হতেন। অথচ এর মধ্যেই ছ’সপ্তাহের মাথায় নিজের সাইকোপ্যাথেটিক চরিত্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটালেন এবট এক রেস্তোরার বেয়ারাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ভাগ্যের কী পরিহাস—এবট যেদিন দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে পুলিশের

---

[42] Jack Henry Abbott, In the Belly of the Beast: Letters From Prison, Vintage, 1991

খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন, ঠিক তার পরদিনই তার ‘জানোয়ারের উদরে’ বইটির চমৎকার একটি রিভিউ বেরিয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস-এ । পত্রিকার সম্পাদক খুব আগ্রহ ভরেই সেটি ছাপিয়েছিলেন এবটের আগের দিনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থেকে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা খুব স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেই মনোবিকারগ্রস্ত কিংবা শিশুনিপীড়নকারীরা নিজেদের শিশুবয়সে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় তারা বড় হয়ে অন্য মানুষদের মেরে কিংবা শিশুদের ধর্ষণ করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ ব্যাপারটি অনেকাংশেই ঠিক নয়। আমি যে বিটিকে খুনি ডেনিস রেডার, ‘গ্রীন রিভার কিলার’ গ্রে রিজ ওইয়ের উদাহরণ দিয়েছি, তারা কেউই শিশু বয়সে নিপীড়নের শিকার হয়নি। ডেনিস রেডার ছোটবেলায় খুব ভালো পরিবেশেই বড় হয়েছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রী, এবং দু’ ছেলে নিয়ে আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতোই জীবনযাপন করতেন[43]।

গবেষক জোয়ান এলিসন রজার্স তাঁর ‘যৌনতা: একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস’ বইটিতে লিখেছেন যে বেশীর ভাগ শিশু যৌন নিপীড়নকারীদের নিজেদের জীবনে শিশু নিপীড়নের কোনো ইতিহাস নেই বলেই প্রমাণ মেলে[44]। বংশাণুবিজ্ঞানী ফ্রেড বার্লিনের উদ্ধৃতি দিয়ে রজার্স তার বইয়ে বলেছেন যে, ‘বিকৃত যৌন আচরণ শেখান নয়, এটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত’। অবশ্য তিনি এটাও বলতে ভুলেননি যে, সমাজকে রক্ষা করার জন্যই অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু একই সাথে ঐ আচরণকে অর্থাৎ এ ধরনের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টাও আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত। স্টিভেন পিঙ্কারও তাঁর বইয়ের **৩১১** পৃষ্ঠায় বলেন যে কানাডীয়রা আমেরিকানদের মতো একই টিভি শো দেখে কিন্তু কানাডায় অপরাধজনিত হত্যার

---

[43] উৎসাহী পাঠকেরা বিটিকে সিরিয়াল কিলার ডেনিস রেডারের উপর একটা ডকুমেন্টরী ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারেন। বিটিকে কিলার, ইউটিউবের লিঙ্ক - http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q

[44] Joann Ellison Rodgers, Sex: A Natural History, W. H. Freeman, 2002

হার আমেরিকার ১/৪ ভাগ মাত্র। তার মানে সহিংস টিভি শো দেখে দেখে আমেরিকানরা সহিংস হয়ে উঠেছে – এই সনাতন ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই বলি 'হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে পোলাটা বখে গেছে' কিংবা বলি 'ছোটবেলায় বাবা মা পিস্তল জাতীয় খেলনা কিনে দেয়াতেই আজকে পোলা মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে'। কিন্তু এ ধরনের 'বিশ্লেষণ' আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে? সত্যি বলতে কী—'জেনেটিক ডিটারমিনিজম' ঠেকাতে আমরা নিজের অজান্তেই 'কালচারাল ডিটারমিনিজমের' আশ্রয় নিয়ে নেই। খুন-খারাবির পেছনে জেনেটিক কোনো প্রভাব থাকতে পারে, এটা অস্বীকার করে আমরা দোষারোপ করি ছোটবেলার খেলনাকে। কিংবা ধর্ষণের পেছনে পর্নোগ্রাফিকে। কিন্তু এই মনোভাবও যে আসলে উন্নত কোনো কিছু নয় তা ম্যাট রীডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'সাংস্কৃতিক নির্ণয়বাদ বংশাণু নির্ণয়বাদের মতোই ভয়ঙ্কর হতে পারে'[45]। একই কথা বলেছেন নারীবাদী ডারউইনিস্ট হেলেনা ক্রনিন তার 'মানবপ্রকৃতির সঠিক পরিচিতি' প্রবন্ধে একটু অন্যভাবে—'কেউ যদি বংশাণু নির্ণয়বাদকে ভয় পায়, তবে তার একই কারণে পরিবেশ নির্ণয়বাদকেও ভয় পাওয়া উচিত'[46]। পিঙ্কারও তার বইয়ে সহিংসতা নিয়ে আমাদের সনাতন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, এ সমস্ত শিশুরা যুদ্ধ বা সহিংস খেলনার সাথে পরিচিত হবার অনেক আগেই সহিংস প্রবণতার লক্ষণ দেখায়। কাজেই শিশুরা আসলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা যেরকম ভাবে অনাদিকাল থেকে শিখিয়ে আসছেন—সেরকম ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হয়ে জন্মায় না কখনই। আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে অনেক ক্ষেত্রেই এর স্বপক্ষে সত্যতা পাওয়া গেছে। তারপরেও 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' ডগমা আমাদের মানসপট আচ্ছন্ন করে আছে বহু কারণেই। বাংলায় 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ডগমাকে' খণ্ডন করে মানবপ্রকৃতির উপর জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একেবারেই

[45] 'Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism', Quoted from Agile Gene, Matt Ridley, 2003

[46] Helena Cronin, Getting Human Nature Right; John Brockman (Editor), Science at the Edge, Union Square Press, 2008

নেই বললেই চলে। মুক্তান্বেষার ২য় সংখ্যায় (জানুয়ারী ২০০৮) প্রকাশিত ‘মানবপ্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত?’ নামের প্রবন্ধটি এ দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা যায়।

পাঠকদের মনে হয়তো চিন্তা আঁকিবুকি করতে শুরু করেছে এই ভেবে যে, এবটের মতো উদাহরণগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো আমাদের কপালে ঘোর ‘খারাবি’ আছে। সব কিছু যদি ‘জিন’ই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তবে তো তা আমাদের ‘জেনেটিক ডিটারমিনেজম’ বা বংশাণু নির্ণয়বাদের দিকে ঠেলে দেবে। চিন্তা করে দেখুন—সব কিছু যদি জিনেই লেখা থাকে তাহলে আর আমাদের চেষ্টা করেই বা কি লাভ? ‘জিনেই লেখা আছে ছেলে বড় হয়ে সিরিয়াল কিলার হবে’, আর ‘মনোবিকারগ্রস্ত মানুষদের স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না’ - তা তো উপরেই দেখলাম। এই আপ্তবাক্যদ্বয় মেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর ভাগ্যবাদীদের সাথে পার্থক্য থাকল কোথায়?

না রসিকতা করছি না একেবারেই। আমার এই কথাকে হাল্কা কথা ভেবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে কিন্তু ভুল হবে। আমি হাল্কাভাবে ভাগ্যের কথা বললেও জেনেটিক্সের এই সমস্ত নতুন দিক বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই একদল ‘বিশেষজ্ঞ’ মানুষের আচার ব্যবহার, আনন্দ, হাসি কান্না, দুঃখ যাবতীয় সবকিছুকেই ‘জিনের’ মধ্যে খুঁজে পাওয়া শুরু করে দিলেন। এক দিকে রইলো ব্ল্যাঙ্ক স্লেটওয়ালারা—যারা সবকিছু পরিবেশ বদল করেই সমাধান করে ফেলতে চান, আর আর অন্যদিকে তৈরি হলো আরেক চরমপন্থি ‘জেনেটিক ডিটারমিনিস্ট’-এর দল—যারা পরিবেশ অস্বীকার করে সব কিছু বংশাণু দিয়েই ব্যাখ্যা করে ফেলেন। এই গ্রুপের একদল আবার আরও এক কাঠি সরেস হয়ে ‘জিন কেন্দ্রক ভাগ্যবাদ’ কিংবা ‘বংশাণু নির্ণয়বাদ’ প্রচার করা শুরু করে দিলেন। যেমন, জিনোম প্রজেক্ট শেষ হবার পর পরই ডাবল-হেলিক্সের আবিষ্কারক অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন বলা শুরু করলেন—

আগে মানুষ ভাবত আকাশের তারায় বুঝি ভাগ্য লেখা আছে। এখন মানুষ বুঝবে, ভাগ্য তারায় লেখা নেই, তার ভাগ্য লেখা রয়েছে জিনে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা কি এতই সরল? ওয়াটসনের কথা মতো মানুষের সমস্ত ভাগ্য কি তাহলে জিনেই লেখা আছে?

এপিজেনেটিক্স এবং নিউরোপ্লাস্টিসিটির শিক্ষা

না এতটা ভাগ্যবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বংশাণুগুলো আমাদের মানসপটের বিনির্মাণ করলেও সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোহার দরজার মতো অনড় নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই কাদামাটির মতোই নরম। পরিবেশের প্রভাবে এদের সক্রিয়করণ বা নিষ্ক্রিয়করণ ঘটানো যায়— অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন/অফ-এর মতোই। যে বংশাণুগুলোকে কয়েক বছর আগেও মনে করা হতো একদমই অনমনীয়, মনে করা হতো বংশাণুর গঠনের সিংহভাগই ভ্রূণে থাকা অবস্থায় তৈরি হয়ে যায়, ভাবা হতো পরবর্তীকালের পরিবেশে এদের রদবদল হয় সামান্যই, আধুনিক 'এপিজেনেটিক্স'এর গবেষণা হতে পাওয়া ফলাফল এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলেই এখন মনে করা হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা ক্রমশ জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কীভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে বদলে ফেলে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী এদের চিহ্নিত করেন 'নমনীয় জিনোম' (Malleable Genome) হিসেবে, কেউ বা নাম দিয়েছেন 'চপল জিন' (Agile Gene)। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ড ম্যাগাজিনের ২০০৬ সালের অক্টোবর সংখ্যায় ডগলাস স্টেইনবার্গ আধুনিক 'এপিজেনেটিক্স'এর বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ফলাফল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[47]। ফলাফলগুলো একদিকে যেমন চিন্তা জাগানিয়া, তেমনি অন্যদিকে এর আবেদন সুদূরপ্রসারী। আসলে জিনের গঠন আর বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, জিনের প্রকাশভঙ্গি যদি আমরা পরিবেশ দিয়ে

---

[47] Douglas Steinberg, Determining Nature vs. Nurture, Molecular evidence is finally emerging to inform the long-standing debate, Scientific American Mind, October 4, 2006

নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তবে লাটাইয়ের সুতা অনেকটাই নিজেদের কব্জায় রাখতে পারবো। ড. ডাওসন চার্চ তার সাম্প্রতিক ‘আপনার জিনের ভিতরে জ্বিন’ বইয়ে সেজন্যই বলেছেন[48] —

> বিজ্ঞান ক্রমশ খুঁজে বের করছে—আমাদের ক্রোমজোম কতকগুলো নির্ধারিত জিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে জিনগুলোর সক্রিয়তা নির্ভর করে আমাদের আত্মগত অভিজ্ঞতা এবং কীভাবে সেগুলোকে আমরা প্রক্রিয়াজাত করব, তার উপর।

পিঙ্কারের বইয়ের এবটের উদাহরণে আরেকটিবার ফেরত যাই। সাইকোপ্যাথ জ্যাক এবটের অনমনীয় মনোভাবের যে উদাহরণ পিঙ্কার তার বইয়ে হাজির করেছেন তা হয়তো অত্যধিক ‘চরম মাত্রার’ উদাহরণ। আমাদের চারপাশের উদাহরণগুলো এমনতর চরম সীমায় অবস্থান করে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ পরিবর্তন করে করে কিংবা কড়া সামাজিক নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে মানুষের ব্যবহার যে পরিবর্তন করা যায়, তা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। আমার জীবন থেকেই একটা উদাহরণ হাজির করি—

প্রথম আমেরিকায় আসার পর নতুন নতুন গাড়ি চালানো শুরু করেছি। প্রায় দু’বছর বড় ধরনের কোনো এক্সিডেন্ট ছাড়া সময় পার করে দেবার পর সাহস গেল অতিমাত্রায় বেড়ে। হাইওয়ে ছেড়ে বাসার উপরের ছোট্ট রাস্তায় ঢুকতে হলে যে একটু গতি কমিয়ে ঢুকতে হবে—তা মাথায়ই থাকত না। যে রাস্তায় চলাচলের গতিসীমা সর্বোচ্চ ৩৫, সে রাস্তায় আমি ঢুকতাম প্রায় ৫০ মাইল বেগে। ফলে যা হবার তাই হলো, এক বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পুলিশের গাড়ির খপ্পরে পড়ে গেলাম। ব্যস জরিমানা গুনতে হলো। দিন কয়েক খুব সাবধানে গাড়ি চালালাম। তারপর ক’দিন বাদেই আবার যেই কি সেই। একদিন সকালে উঠে দেখলাম ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। ঠিক নয়টায় অফিসে একটা জরুরি মিটিং

[48] Dawson Church, Genie in Your Genes, Energy Psychology Press; 2009

আছে। গাড়ি বের করে দেখলাম তেল নেই। তেল নিতে গিয়ে আরও মিনিট দশেক নষ্ট হলো। এবারে বুঝলাম মিটিং আর ধরা যাবে না। পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি বের করে সেই রাস্তাটায় উঠে যেই না এক্সিলেটরে পা রেখে মেরেছি এক ধুন্ধুমার টান—অমনি পাশ থেকে পুলিশ বাবাজির অভ্যুদয়। আবারো জরিমানা। এক মাসের ব্যবধানে একই রাস্তার উপরে দু'দুবার টিকেট পাওয়ার পর বোধ হয় চৈতন্য ফিরলো। ফিরবে নাই বা কেন—এমন টিকেট আর বার দুয়েক পেলেই আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাই চলে যাবে। এখন হাইওয়ে থেকে রাস্তায় উঠলেই দেখি যতই আনমনা থাকি না কেন, স্পিডোমিটারের কাঁটা কখনই ত্রিশ অতিক্রম করে না। শাস্তির ভয়ে কিংবা কঠোর নিয়ম নীতি আরোপের ফলে যে মানুষ তার বহুদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারে এটাই তো একটা ভালো উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিত এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক (সঙ্গত কারণেই নামটি উল্লেখ করছি না) বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন। স্বভাবে একটু বদরাগী। রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না অনেক সময়ই। ঝগড়ার সময় বউকেও চড় থাপ্পড় মেরে বসেন। বউও প্রথম প্রথম সহ্য করত, কিংবা হয়তো মানিয়ে নিতে চাইত। কাউকে বলতো না। সবাই ভাবতো সুখের সংসার বুঝি তাদের। আর বউকে নেহাৎ গোবেচারা পেয়ে স্বামীরও সাহস গেল বেড়ে। নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। একদিন বউ থাকতে না পেরে নাইন-ওয়ান-ওয়ানে সোজা কল করে দিল। পুলিশ এসে স্বামী বাবাজিকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক বোধ হয় ভেবেছিলেন বউয়ের গায়ে একটু আধটু হাত তোলা আর এমন কী অপরাধ। দেশে তো সবাই করে! কিন্তু আমেরিকায় এগুলো আইনকানুন খুবই কড়া। তারপরও পুলিশ ভদ্রলোকের কান্নাকাটি দেখে হয়তো মায়া করে গারদে না ঢুকিয়ে বকাঝকা দিয়ে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন এরপর যদি গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আসে, তাহলে তার কপালে বিপত্তি আছে। ভদ্রলোকও ছাড়া পেয়ে ভাবলেন 'যাক! অল্পের উপর দিয়ে ফাঁরা কাটানো গেছে'। কিছু দিন

ভালো থাকলেন, সংসার ধর্ম পালন করলেন। কিন্তু কথায় বলে বউ পেটানোর স্বভাব নাকি মজ্জাগত, একবার যে বউয়ের গায়ে হাত তুলে, সে নাকি আবারো তুলে। ভদ্রলোকও আরেকদিন ঝগড়ার সময় বউয়ের গালে থাপ্পড় মেরে বসলেন। আর বউও কল করলেন পুলিশে। এবারে ফলাফল হলো ভ্যাবহ। স্বামী প্রবরকে ধরে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো সোজা জেল হাজতে। কেউ ছাড়াতে এল না। এমনকি কাছের বন্ধু-বান্ধবেরাও নয়। দু'দিন হাজতবাসের পর শেষ পর্যন্ত স্বামীর কান্নাকাটিতে বোধ হয় বউয়ের দয়া হলো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হোক, আর সামাজিকতার চাপেই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীর উপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে স্বামীকে জেল থেকে বের করে আনলেন। তবে পুলিশের মন এত সহজে গললো না। একেবারে ঠিকুজি কুঠি সমস্ত বৃত্তান্ত ফাইলবন্দি করে রাখলেন। বলে রাখলেন, তাকে নজরবন্দি রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো ধরনের উল্টো-পাল্টা আচরণ দেখলেই সোজা ডিপোর্ট করে দেয়া হবে। তা বউ-পেটানো স্বভাব মজ্জাগত হোক আর শয্যাগতই হোক, পুলিশের ধাতানির উপর তো আর কারো কথা নাই, কারণ বাঘে ছুলে পনেরো ঘা, আর পুলিশে ছুলে নাকি আঠারো ঘা। আর তাছাড়া ডিপোর্ট হবার ভয় আসলেই প্রবাসী বাঙালির বড় ভয়। সবকিছু মিলিয়ে ভদ্রলোক এমন চুপসানো চুপসালেন যে, তার সেই পরিচিত আগ্রাসী চরিত্রই গেল বদলে। কারো সামনে আর মুখ তুলে কথা বলেন না। বউয়ের উপর এখন রাগ করা তো দূরের কথা—বউকে তোয়াজ করা ছাড়া এক পা চলেন না। বাংলায় যাকে বলে 'স্ত্রৈণ পুরুষ'—সেটাতেই রূপ নিয়ে নিলেন পুরোমাত্রায়। এই ঘটনার পর বহু বছর কেটে গেছে। বউয়ের উপর নির্যাতনের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কাজেই জিন-ওয়ালাদের দাবি অনুযায়ী বউ পেটানোর অভ্যাস যদি কারো মজ্জাগত কিংবা বংশাণুক্রমিক হয়েও থাকে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চাপ অর্থাৎ সর্বোপরি পরিবেশ বাধ্য করে তার প্রকাশভঙ্গিকে বদলে ফেলতে।

আমার গাড়ি চালানোর উদাহরণটা কিংবা উপরের 'ভদ্রলোকের' বউ-পেটানোর উদাহরণটি নেহাৎ খুব ছোট স্কেলে, বড় স্কেলে ঘটা উদাহরণগুলোতে একটু চোখ

বুলাই। দেশে যখন খুন-খারাবি কিংবা রাহাজানি বেড়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, কখনো বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয় বা ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আশির দশকে যখন বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের হার ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আইন প্রবর্তন করে তা বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল—যেন এধরনের অমানুষিকতা বন্ধ হয়। বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল এসিড নিক্ষেপের হার অনেক কমিয়ে আনা গিয়েছে। দেশের বাইরে এ ধরনের উদাহরণ আরও অনেক বেশি। বহু দাগি আসামি যারা তারুণ্যে সহিংস কিংবা জনবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল, কিংবা পরিচিত ছিল গ্যাংস্টার হিসেবে তাদের অনেককেই পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাদের ব্যবহার পরিবর্তন করেই। এদের অনেকেই তাদের অতীতের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করে বইও লিখেছেন, কেউ বা আজ এক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করছেন; মানুষকে তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। দাবি-দাওয়া পূরণ করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া, সারের দাম কমিয়ে কৃষকদের শান্ত করার উদাহরণ আমরা প্রতিদিনের পত্রিকাতেই পড়ি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কার্ফু জারি করে উন্মত্ত জনতাকে স্বাভাবিক আর শৃঙ্খলিত জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তা আমরা বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি।

তাই জিন আমাদের মানসিক কাঠামোর বীজ বপন করলেও কখনোই আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে না। পরিবেশের একটা প্রভাব থেকেই যায়। চাকরির টেনশন, স্ট্রেসফুল জীবনযাপনের প্রভাব শরীরে যে পড়ে সেটা পরীক্ষিত সত্য। ধূমপান, অত্যধিক মদ্যপান, ড্রাগ সেবনের প্রভাব শরীরে আছে বলেই ডাক্তাররা সেগুলো থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে পরামর্শ দেন। সেজন্যই একই ধরনের জিন শরীরে বহন করার পরও অনেক সময় দেখা যায়, অভিন্ন যমজদের একজন দিব্যি সুস্থ সবল রয়েছে, অন্যজন বেহিসেবি জীবনযাপনে শরীরকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় 'Live Long?

Die Young? Answer Isn't Just in Genes'[49] প্রবন্ধে কলামিস্ট জিনা কোলাটা দুই যমজ বোনের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন এক বোন ৯২ বছর বয়সেও দিব্যি সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত জীবনযাপন করছে, অথচ অন্য যমজ বোনটির অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই 'কেরোসিন'! সম্প্রতি রোগাক্রান্ত বোনটির 'হিপ রিপ্লেসমেন্ট' করতে হয়েছে, 'ডিজেনেরেটিভ ডিসঅর্ডারে' দৃষ্টিশক্তি প্রায় পুরোটাই চলে গেছে। দেহের অস্থিক্ষয়ের পরিমাণও উল্লেখ করার মতোই। আসলে জীবনযাপন এবং অভ্যাসের প্রভাব যে দেহের উপর পড়ে তা অস্বীকার করা উপায় নেই। সে জন্যই চিকিৎসক অধ্যাপক মাইকেল রেবিনফ বলেন,

> অভিন্ন যমজেরা একই ধরনের জিন বিনিময় করলেও সেই জিনগুলো দেহে একই ধরনের রোগের প্রকাশ অনেকসময়ই ঘটায় না, যদিও সাধারণভাবে ব্যাপারটিকে খুবই জেনেটিক বলে মনে করা হয় ।



চিত্র: জোসেফাইন তেজাউরো এবং তার জমজ বোন - জেনেটিক প্রকৃতি এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৈহিক অবস্থা একই রকম নয় (নিউইয়র্ক টাইমস, অগাস্ট ২০০৬)।

আরেকটি চাঞ্চল্যকর ফলাফল পাওয়া গেছে সম্প্রতি অধ্যাপক র‍্যান্ডি জার্টেল এর ইঁদুর

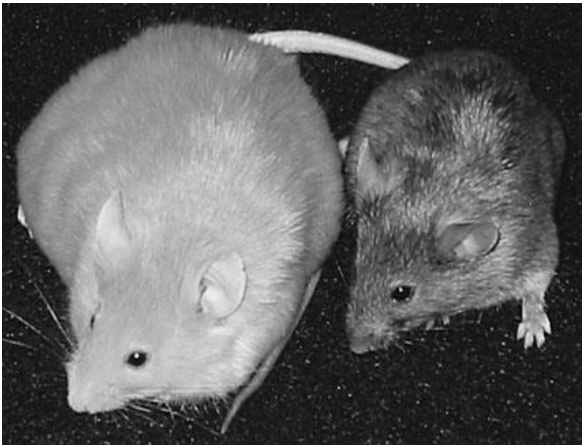
---

[49] Live Long? Die Young? Answer Isn't Just in Genes, GINA KOLATA, The NewYork Times, August 31, 2006, Online link: http://www.nytimes.com/ 2006/08/31/health/31age.html

নিয়ে গবেষণা থেকে। তিনি দেখেছেন, Agouti নামের যে জিনটি মানুষের ওবিসিটি বা স্থূলত্ব এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেটি এক ধরনের ইঁদুরের মধ্যেও প্রবলভাবে দৃশ্যমান। হলুদ বর্ণের এই এগুটি ইঁদুর জন্মের পরপরই রাক্ষসের মতো কেবল খেয়েই চলে। এবং এদের অধিকাংশই মানুষের মতো ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। এমনকি তাদের বাচ্চা জন্ম নিলেও তারা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি নিয়েই জন্মায়। অধ্যাপক জার্টেল কিছু ইঁদুরকে আলাদা করে ল্যাবের কাঁচের জারে রেখে তাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন ইঁদুরদের জেনেটিক প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, এবং বাচ্চা যা জন্ম নিচ্ছে তা অধিকাংশই রোগের ঝুঁকিমুক্ত। এমনকি সদ্য জন্মানো বাচ্চার গায়ের রঙেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পেলেন গবেষকেরা। আণবিক স্তরে জেনেটিক কোডের কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে শুধু খাদ্যাভাস এবং পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের এক অনন্য নজির পেলেন তারা। তারা বুঝলেন মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিকভাবে হৃদরোগ কিংবা ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অনেকেই জন্মানোর পরও ডাক্তারদের কথা শুনে কম শর্করা আর চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করে, নিয়মিত ব্যায়াম করে, ধূমপানমুক্ত জীবনযাপন করে কীভাবে আমরা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি কমিয়ে নিতে পারি।

এখন কথা হচ্ছে, পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় তা না হয় দেখলাম, কিন্তু পরিবেশ বদলে দিয়ে একইভাবে মানসিক প্রকাশভঙ্গিকেও কি বদলানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলেন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মোজে সিজফ এবং মাইকেল মেনি—এ দুজন বিজ্ঞানীও জার্টেলের মতোই ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তারা দেখলেন একধরনের ইঁদুর আছে যাদের মা ইঁদুরেরা তাদের বাচ্চাদের জন্য কোনো ধরনের যত্ন-আত্তি করে না। মা'দের আরেক দল আছে যারা আবার বাচ্চা জন্মানোর পর থেকেই জিব দিয়ে গা চেটে আর অতিরিক্ত আদর যত্ন

করে বাচ্চাদের বড় করে। দেখা গেছে যে বাচ্চাগুলোর



চিত্র: কেবল মা ইঁদুরের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে অধ্যাপক জার্টেল দেখলেন ইঁদুরটি যে বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা (ডিস্কভার, নভেম্বর, ২০০৬)।

আদর যত্ন নেওয়া হয় তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠে। আর মায়ের অবহেলায় থাকা বাচ্চারা বেড়ে উঠে অস্থির আর ভীতু স্বভাবের হয়ে। তাদের দু দলের ব্রেনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করলেন বিজ্ঞানীরা। আদর পাওয়া বাচ্চাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস নামের প্রত্যঙ্গটি থাকে অনেক বিবর্ধিত, আর তাদের স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের (cortisol) উপস্থিতি অনেক কম পাওয়া গেল। আর অবহেলায় বড় হওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই হরমোন পাওয়া গেল অনেক বেশি। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা খুব স্ট্রেস্ফুল জীবনযাপন করে থাকে, তাদের দেহে কর্টিসলের উপস্থিতি থাকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। তাদের হৃদরোগের ঝুঁকিও থাকে অনেক প্রবল। ড. সজফ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি ওই ভীতু ইঁদুর দলের ব্রেনে এমন এক ধরনের এনজাইম (এসিটাইল গ্রুপ) প্রবেশ করালেন যা কর্টিসলের উৎপাদনকে বাধা দেয়। দেখা গেল ইঁদুরদের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে। আবার একইভাবে আদরে বড় হওয়া সাহসী ইঁদুরের দল থেকে ইঁদুর নিয়ে তাদের মাথায় মিথাইল গ্রুপ প্রবেশ করিয়ে ভীতু আর অস্থির বানিয়ে দিলেন তারা। এদের গবেষণাকে ফিচার

করে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা ডিস্কভার-এ। প্রবন্ধের শিরোনাম - DNA Is Not Destiny [50]।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে (উপরের উদাহরণে) দেখা গেছে, যে সব বাচ্চাকে আদর যত্ন নেওয়া হয়েছে তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তারা থাকে অন্যদের প্রতি অনেক সংবেদনশীল। আর মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে বড় হওয়া বাচ্চাগুলো হয়ে উঠে অস্থির, ভীতু এবং অসামাজিক। মানুষের ক্ষেত্রেও কি এটা ঘটা সম্ভব নয়? যে বাচ্চারা মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে অবহেলায় বড় হয় তাদের মধ্য থেকেই একটা অংশ হয়তো বড় হয়ে অসামাজিক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা সরলীকরণ মনে হলেও এটা ঘটা সম্ভব খুবই সম্ভব। সেজন্যই বোধ হয় প্রতিটি মা বা শিশুকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে আদর যত্ন করে বড় করতে চান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিক নেস্টলার দীর্ঘদিন ধরে বিষণ্ণতায় ভোগা রোগীদের মাথার ভিতরে হিপোক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, তাদের হিপোক্যাম্পাসের আকার এবং আয়তন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের হিপোক্যাম্পাসের মধ্যকার একধরনের প্রোটিনে (হিস্টোন) মিথাইল গ্রুপের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন (অনেকটা ওই ভীতু ইঁদুর দলের মতোই)। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন কীভাবে মানুষের বিষণ্ণতা সারাতে হয়। তারা ওষুধের মাধ্যমে এসিটাইল গ্রুপকে হিস্টোনের সাথে সংযুক্ত করে দেন, যা মিথাইল গ্রুপের কাজকর্মকে বাধা দেয়। এজন্যই এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধগুলো এত সহজে কাজ করে—বিষণ্ণতা দূর করে মনকে ফুরফুরে করে তোলে। শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেনিস গ্রেসন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের উপর এসিটাইল গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করে অনেক রোগীকেই সারিয়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন

---

[50] DNA Is Not Destiny, The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and identity; Ethan Watters, Discover Magazine, Nov. 2006 issue, Online link: http://discovermagazine.com/2006/nov/cover/?searchterm=Randy%20Jirtle

শিশু বয়েসের পরিবেশ, পরিচর্যা আমাদের মানসজগৎ গঠনে সাহায্য শুধু করে না, পরবর্তীতে জিনের প্রকাশভঙ্গিকে বদলে দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে। যতই এপিজেনেটিক্সের আধুনিক গবেষণার ফলাফল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, ততই মানবপ্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে জেনেটিক্সের পাশাপাশি পরিবেশ এবং পরিচর্যার গুরুত্ব আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছে, আর এগুলো মানবপ্রকৃতি বিষয়ক বিতর্কে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের ২০০৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় এ জন্যই বলা হয়েছে—

> নতুন গবেষণার ফলাফলের আলোকে এখন বোঝা যাচ্ছে মায়ের পরিচর্যার রীতি শিশুর জিনের প্রকাশভঙ্গির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

এপিজেনেটিক্স ছাড়াও ব্রেনের নিউরোপ্লাস্টিসিটি নিয়ে পল ব্যাচি রিটা, মাইকেল মার্জেনিচ, ভিলায়ানুর রামাচন্দ্রনের আধুনিক গবেষণাগুলোও খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে কীভাবে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মস্তিষ্কও নিজেকে বদলে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও বিষদভাবে জানতে হলে উৎসুক পাঠকেরা নর্মান দইজের 'মস্তিষ্ক—যা নিজে থেকেই নিজেকে বদলে ফেলছে' (২০০৭) বইটি পড়ে নিতে পারেন[51]।

ব্ল্যাঙ্ক স্লেট বনাম জুক বক্স

তাহলে পরিবেশ নির্ণয়বাদ বনাম বংশাণু নির্ণয়বাদের এই দড়ি টানাটানি থেকে কী উপসংহার বেরিয়ে এল? বেরিয়ে এল যে, সম্পূর্ণ বংশাণুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়া—দুই ক্ষেত্রেই ভুল। মানবপ্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশাণুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। জিনের গুরুত্ব এ কারণে যে, আমরা বংশগতভাবে যে সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছি, তার টার্ন অন বা অফের

---

[51] Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science, Penguin (Non-Classics), 18, 2007

মাধ্যমে জেনেটিক এক্সপ্রেশন বদলাতে পারি পরিবেশ থেকে বিবিধ সিগন্যাল নিয়ে। কিন্তু কোনো কারণে সেই মুল জিনটিই যদি আমার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, আমি যত সিগন্যাল পাঠাই না কেন তা বদলানো সম্ভব হবে না। আবার পরিবেশের গুরুত্ব সবসময়ই থাকবে কারণ জিনের প্রকাশভঙ্গি বদলানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে পরিবেশ থেকে কী ধরনের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে তার উপর [52]। আমাদের শরীরের ওজনের কথাই ধরা যাক। অনেক ক্ষেত্রেই দেহের কাঠামো মোটা হবে না চিকন হবে—তার অনেক কিছুই কিন্তু জেনেটিক। কিন্তু তা বলে জিনের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকি না। আপনার যদি একটুতেই 'মুটিয়ে' যাওয়ার প্রবণতা থাকে, তবে আপনি খাবারের উপর আরও যত্নবান হবেন, ব্যায়াম করবেন, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবেন—এইটাই ধর্তব্য। তা না করে আপনি যদি বেহিসেবি জীবন কাটাতে থাকেন, খানাপিনা পানীয়-এর প্রতি লালায়িত থাকেন, সমানে ভুরিভোজ করে যেতে থাকেন—হয়তো আপনার দেহের জিনগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপনার দেহকে নাদুসনুদুস করে তুলবে। কাজেই জিনের অভ্যন্তরস্থ জিনগত প্রকাশভঙ্গি কীভাবে বদলাবেন—তার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার দেয়া পরিবেশের উপরই নির্ভর করবে।

একই কথা মানবপ্রকৃতি এবং মানুষের অর্জিত ব্যবহারের জন্যও খাটে। মানবপ্রকৃতি গঠনে জিন যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি রাখে পরিবেশ। অনেক সময় প্রকৃতিকে পরিবেশ থেকে আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার চেষ্টাও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ম্যাট রিডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে সেজন্যই বলেছেন —

> আমার কথা আরও একবার স্পষ্ট করে বলি। আমি মনে করি, মানুষের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হলে প্রকৃতি এবং পরিবেশ দুটোকেই গোনায় ধরতে হবে। ...নতুন আবিষ্কারের আলোকে বোঝা যাচ্ছে কীভাবে জিনগুলো মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত

---

[52] কিছু কিছু ব্যাপারকে পুরোপুরি জেনেটিক বলে মনে করা হয়। যেমন, হান্টিংটন রোগ - এই রোগটি ১০০% জেনেটিক। এটা পরিবেশ নির্ভর নয়। আবার শিশুদের মাতৃভাষা রপ্ত করার বিষয়টিকে পুরোপুরি পরিবেশ নির্ভর হিসেবে দেখা হয়। কারণ দেখা গেছে যেকোন শিশুকে যে কোন দেশে রেখে বড় করা হলে – সেই দেশের ভাষা রপ্ত করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। জিনগত বৈশিষ্ট্য মূখ্য ভুমিকা পালন করলে এমনটি হতে পারতো না। তবে – পুরোপুরি জেনেটিক এবং পুরোপুরি পরিবেশ - এই দুই চরমসীমার মধ্যকার অধিকাংশ বিষয় আশয়কেই আসলে জিন এবং পরিবেশের সুষম মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

> করে, আবার কীভাবে মানুষের ব্যাবহার জিনগুলোর প্রকাশভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কাজেই বিষয়টা আর প্রকৃতি বনাম পরিবেশ (nature versus nurture) নয়, বরং পরিবেশ দিয়ে প্রকৃতি (nature via nurture)।

বংশাণু আর পরিবেশ—আসলে আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহুর মতো। একটি দৈর্ঘ্য, আরেকটি প্রস্থ। মানবপ্রকৃতি নির্মাণে কার ভূমিকা বেশি—জিন না পরিবেশ? এ প্রশ্ন কেউ করলে এর জবাবটিও আরেকটি প্রশ্ন করেই দেয়া যায়—আয়তক্ষেত্র তৈরিতে কার ভূমিকা বেশি—দৈর্ঘ্য নাকি প্রস্থ?



চিত্র : বর্তমানে অনেক বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী মানব মনকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের বদলে জুক বক্সের সাথে তুলনা করছেন।

বংশাণু আর পরিবেশের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, মানুষের মন যে আসলে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হয়ে জন্মায় না তা এখন সমাজবিজ্ঞানীরাও মোটামুটিভাবে মেনে নিতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই ভাবছিলেন এই ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ব্যাপারটাকে অন্য কিছু দিয়ে পরিবর্তন করা যায় কি না। বিজ্ঞানী জন টুবি এবং লিডা কসমাইডস

একটি বিকল্প প্রস্তাব করেছেন সম্প্রতি। মানব মনকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট না বলে জুক বক্স হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে[53]। স্লেটের তুলনায় জুক বক্স অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং মিথস্ক্রিয়াময়। জুকবক্সকে যেমন কেবল ভিতরের সরঞ্জামাদি দিয়ে বিচার করা যায় না, ঠিক তেমনি যায় না কেবল বাইরের সম্ভরণ দিয়েও। যেমন, F6 বোতাম টিপলে কোনো সুরই বাজবে না, যদি না বোতামের সাথে ভিতরে কোনো রেকর্ডের সংযোগ থেকে থাকে। অর্থাৎ বোতাম টেপা এবং সেই সাথে ভেতরের রেকর্ডের উপস্থিতি আর সুগ্রন্থিত সংযোগের মাধ্যমেই আমরা সফলভাবে জুকবক্স থেকে সুরধ্বনি শুনতে পাই। পুরোপুরি না হলেও, বাংলাদেশে আমরা যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে থাকি, সেটার ব্যাপারও অনেকটা প্রায় একই রকমের। হারমোনিয়ামের চাবি টিপে আপনি কেমন সুর তুলবেন তা হয়তো আপনার উপরেই নির্ভর করছে—সেটা 'খাঁচার ভিতর অচীন পাখি'র সুরই হোক, কিংবা হোক 'না চাহিলে তারে পাওয়া যায়' এর সুর—কিন্তু সুর তোলার মতো উপকরণগুলো হারমোনিয়ামের চাবির সাথে আগে থেকেই যুক্ত থাকতে হবে। কোন্ চাবির সাথে 'সা' আর কোন্ চাবির সাথে 'রে' আর কোনো চাবি টিপলে 'গা' তা আপনাকে জানতে হবে, এবং হারমোনিয়ামের সঠিক চাবি থেকে সঠিক সুর বেরুতে হবে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করছে ভিতর এবং বাইরের সুষম সমন্বয়ের উপর। আমাদের মনও কাজ করে অনেকটা সেরকম ভাবেই, ভিতরের জেনেটিক কাঠামোর সাথে বাইরের পরিবেশের এক ধরনের সুষম মিথস্ক্রিয়ায়।

[53] Douglas Kenrick, Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature, Basic Books , 2011

তৃতীয় অধ্যায়
সংস্কৃতির ‘ভূত’

আগেই বলেছি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান সমাজ এবং সংস্কৃতির অনেক কিছু খুব পরিষ্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনও হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে একটা কারণ আমাদের মধ্যেকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার।

তবে ওটাই একমাত্র কারণ নয়। বিতর্কের মুল কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, বিতর্কটা যতটা না সংস্কারের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত অনুকল্প আর এর থেকে পাওয়া বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কারণে।

মূল বিতর্কটা নিঃসন্দেহে মানব মনের স্বরূপ নিয়ে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা রঙ্গমঞ্চে হাজির হবার আগে সার্বজনীন ‘মানবপ্রকৃতি’ বলে কিছু আছে কি না সেটাই ঠিকমত আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না। যেমন, স্প্যানিশ লিবারেল দার্শনিক হোসে ওর্তেগা গ্যাসেট মানবপ্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলতেন, ‘মানুষের কোনো প্রকৃতি নেই, যা আছে তা হলো ইতিহাস’। ব্রিটিশ-আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ অ্যাশলে মন্টেগু বলতেন, ‘মানুষের সহজাত স্পৃহা (instinct) বলে কিছু নেই; কারণ তার সব কিছুই তার চারপাশের সমাজ-সংস্কৃতি থেকেই শেখা’। কেউ বা আবার মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার

করে নিলেও তাকে একেবারেই কাঁচামালের মতো আদিম মনে করতেন। যেমন প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মার্গারেট মীড বলতেন, 'মানবপ্রকৃতি হচ্ছে অশোধিত, সবচেয়ে ম্যাড়মেড়ে কাঁচামাল'[54]।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এসে মানবপ্রকৃতি নিয়ে এই প্রচলিত ছকটিকেই উলটে দিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। একজন শৈলচিকিৎসক যখন হাসপাতালে অপারেশনের জন্য আসা কোনো রোগীর পেটের ভিতর ছুরি চালাবেন বলে ঠিক করেন তখন তিনি জানেন যে, পেট কাটলে এর ভিতরে কী পাওয়া যাবে। পাকস্থলি, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি। পাকস্থলির জায়গায় পাকস্থলি থাকে, আর অগ্ন্যাশয়ের জায়গায় অগ্ন্যাশয়। অন্য রোগীর ক্ষেত্রেও পেট কেটে চিকিৎসক পাকস্থলির জায়গায় পাকস্থলি দেখবার প্রত্যাশাই করেন। এটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন রোগীর পাকস্থলিতে পার্থক্য থাকতে পারে—কারোটা মোটা, কারোটা চিকন, কারোটা দেখলেই হয়তো বোঝা যাবে ব্যাটা আমাশয় রোগী, কারোটা আবার স্বাস্থ্যকর। বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, মানুষের পাকস্থলি দেখে কারো গরুর কিংবা ঘোড়ার পাকস্থলি বলে ভুল হবে না। কারণ মানুষের পাকস্থলির একটা প্রকৃতি আছে, যেটা গরুর পাকস্থলি থেকে আলাদা। আমি অবশ্য গরুর পাকস্থলি বিশেষজ্ঞ নই, যিনি বিশেষজ্ঞ—যেমন পলাশি বাজারের সলিমুল্লাহ কসাই—তিনি খুব ভালো করেই আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন গরুর পাকস্থলি কেমন হয়, খাসিরটা কেমন, ভেড়ারটা কেমন আর মুরগিরটা কেমন। ঠাটারিবাজারের নিত্যানন্দ কসাই হলে তার লিস্টে শুয়োরের পাকস্থলিও চলে আসতে পারে। সলিমুল্লা কিংবা নিত্যানন্দ কসাইয়ের অভিজ্ঞ চোখকে খাসির পাকস্থলির নামে শুয়োরের পাকস্থলি বলে চালানোর চেষ্টা করে ধোঁকা দেয়া যাবে না। কারণ তারা জানেন, খাসির পাকস্থলির প্রকৃতি শুয়োরেরটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একই কথা মানুষের পাকস্থলির জন্যও প্রযোজ্য। একথা বলা ভুল হবে না যে, মানুষের পাকস্থলির প্রকৃতিই অন্যপ্রাণীর পাকস্থলি থেকে তাকে আলাদা করে দিচ্ছে।

---

[54] মার্গারেট মীডের মূল উদ্ধৃতিটি ছিল - 'Human nature is the rawest, most undifferentiated of raw material'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পেটের ভিতরে পাকস্থলির যেমন একটা প্রকৃতি আছে, তেমনি মানুষের মনেরও আলাদা একটা প্রকৃতি আছে—যেটা অন্য প্রাণী থেকে আলাদা। উদাহরণ দেয়া যাক। মানুষের খুব কাছাকাছি প্রজাতি শিম্পাঞ্জি। শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জিনগত মিল শতকরা ৯৯ ভাগ। কাজেই ধরে নেওয়া যায় শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের অনেক কিছুতেই মিল থাকবে। কিন্তু যতই মিল থাকুক না কেন—সার্বজনীনভাবে মানবপ্রকৃতি শিম্পাঞ্জির প্রকৃতি থেকে আলাদা হবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি, অনেকটা উপরের উদাহরণের পাকস্থলির প্রকৃতির মতোই। কিছু উদাহরণ হাজির করি। শিম্পাঞ্জি সমাজে মেয়ে শিম্পাঞ্জিরা বহুগামী হয় – তারা যত ইচ্ছা ছেলেদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে—তাদের আসলেই কোনো বাছ বিচার নেই। পুরুষ শিম্পাঞ্জিরা আবার অন্য মেয়ে শিম্পাঞ্জি (যাদের সাথে এখনও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই)—তাদের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। এ ধরনের কোনো প্যাটার্ন আমাদের মানবসমাজে চোখে পড়ে না। চোখে না পড়াই স্বাভাবিক, কারণ মানুষের প্রকৃতি শিম্পাঞ্জিদের প্রকৃতি থেকে আলাদা।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীদের কথামত আমরা জানলাম 'মানবপ্রকৃতি' বলে একটা কিছু তাহলে আছে, যেটা অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। কিন্তু কেমন সে প্রকৃতি? সমাজবিজ্ঞানী কিংবা নৃতাত্ত্বিকরা অনেকদিন ধরেই এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। তারা বলেন এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মানবসমাজের সংস্কৃতিতে। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডুর্খাইম কোনো সার্বজনীন মানবপ্রকৃতির জন্মগত প্রকরণকে অস্বীকার করে তাকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের সাথে তুলনা করেছিলেন। তার মতে সাংস্কৃতিক বিভাজনই মানবপ্রকৃতিকে তুলে ধরার একমাত্র নিয়ামক। কাজেই মানবপ্রকৃতি বিষয়ে যে প্রশ্নই করা হোক না কেন—এর উত্তর আমাদের খুঁজে নিতে হবে সংস্কৃতিতে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি সহিংস কেন—এর উত্তর হলো—সংস্কৃতিই এর কারণ। ছেলেরা কেন সত্তুর বছরের বুড়ির চাইতে বিশ বছরের ছুঁড়ির প্রতি বেশি লালায়িত হয়—এর উত্তর হচ্ছে সংস্কৃতি। ছেলেরা কেন মেয়েদের

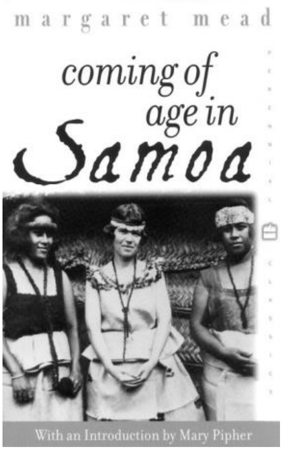
চেয়ে বেশি পর্নোগ্রাফি দেখে, কিংবা বহুগামী—উত্তর একটাই—‘সংস্কৃতি’! ওম সংস্কৃতায়ঃ নমো! *Omnia cultura ex cultura*!

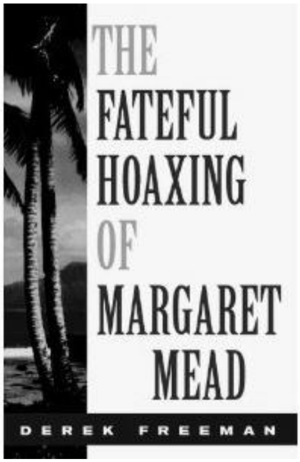
সমাজবিজ্ঞানের পুরোধা এমিল ডুর্খাইম যে ইটের গাথুঁনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাতে ‘সংস্কৃতির প্রাসাদ’ বানাতে এবারে এগিয়ে এলেন নৃতাত্ত্বিকেরা। নৃতত্ত্ববিদের জনক বলে যাকে অভিহিত করা হয় সেই—ফ্রানজ বোয়া এবং মার্গারেট মীড ছিলেন এদের মূল কান্ডারি। ফ্রানজ বোয়া যে মতবাদ প্রচার করলেন তাতে সকলের মনে হলো, মানুষের প্রকৃতি বুঝি একেবারেই নমনীয়। এতে জন্মগত কোনো বৈশিষ্ট্যের কোনো ছাপ নেই, কোনোদিন ছিলও না। সব কিছুই সংস্কৃতিনির্ভর। আর বোয়ার প্রিয় ছাত্রী ‘নৃতত্ত্বের রানি’ মার্গারেট মীড আদিম ‘স্যামোয়া’ জাতির মেয়েদের নিয়ে এমন এক আদর্শিক সমাজ কল্পনা করে ফেললেন, যার বাস্তব অস্তিত্ব আসলে পৃথিবীর কোথাওই নেই। মীডের ‘স্যামোয়া’ যেন আক্ষরিক অর্থেই হচ্ছে স্বর্গের প্রতিরূপ। সেখানে কারো মধ্যে নেই কোনো ঝগড়া, নেই কোনো ঘৃণা, ঈর্ষা কিংবা হিংসা। যৌনতার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানকার মেয়েরা বহুগামী, যৌনতার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন—যখন ইচ্ছে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রিয় মানুষের সাথে সম্পর্ক করে নিতে পারে। তারা স্বাধীনভাবে যেটা চায় সেটা করতে পারে। মীডের অনুকল্প ছিল, স্যামোয়া জাতির সংস্কৃতিই তাদের মেয়েদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বাধীন করে তুলেছে। তিনি সেসময় ফাপুয়া (Fa'apua'a) এবং ফোফোয়া (Fofoa) নামের দুজন স্যামোয়ান নারীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য তার গবেষণায় ব্যবহার করেন। তাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মীড সিদ্ধান্তে আসেন, বংশগতি নয় বরং সংস্কৃতিই ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। মার্গারেট মীড তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করে ১৯২৮ সালে ‘Coming of Age in Samoa’ নামের যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি ‘সংস্কৃতিভিত্তিক প্রাসাদের’ এক অগ্রগণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়[55]। কিন্তু পরবর্তীতে ডেরেক ফ্রিম্যানসহ অন্যান্য

---

[55] মুক্তান্বেষার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় মার্গারেট মীডকে নিয়ে ফরিদ আহমেদের একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—'মার্গারেট মিড : নৃতত্ত্বের রাণী' শিরোনামে।

গবেষকদের গবেষণায় প্রমানিত হয় যে, মীডের অনুকল্পগুলো স্রেফ 'উইশফুল থিংকিং' ছাড়া আর কিছু ছিল না[56, 57]। গবেষকেরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, মীডের গবেষণা ছিল একেবারেই সরল এবং মীড স্যামোয়ান মেয়েদের দ্বারা নিদারুণভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। ফ্রিম্যানের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল, স্যামোয়ান জাতির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, ঘৃণা, হত্যা লুণ্ঠন—আর দশটা জাতির মতোই প্রবলভাবে বিদ্যমান, সরলমনা মীড সেগুলো দেখতেই পাননি। ডেরেক ফ্রিম্যানের অনুমান এবং অভিযোগের একেবারে সরাসরি সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় মীডের গবেষণা প্রকাশের ষাট বছর পর। ১৯৮৮ সালের মে মাসে ফাপুয়া (Fa'apua'a), যখন তার বয়স ৮৬ বছর অফিশিয়ালি স্যামোয়ান সরকারের কাছে স্বীকার করে নেন যে, তিনি আর তার বন্ধু ফোফোয়া স্যামোয়ান নারীদের যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে যে তথ্য মীডকে ১৯২৬ সালে দিয়েছিলেন তার সবটুকুই ছিল বানোয়াট। এ কমপ্লিট হোক্স।





চিত্র : দুটি বহুল আলোচিত বই : বাম পাশে মার্গারেট মীডের কামিং অফ এজ ইন সামোয়া (১৯২৬), আর ডানে ডেরেক ফ্রিম্যানের দ্য ফেটফুল হোক্সিং অব মার্গারেট মীড (১৯৯৯)।

---

56 Derek Freeman, Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth, Penguin, 1983.

57 Derek Freeman, The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of her Samoan Research Basic Books, 1999

সেজন্যই ম্যাট রীডলী তার ‘এজাইল জিন’ বইয়ে মীডের গবেষণা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন[58], ‘তার মানবপ্রকৃতির সাংস্কৃতিক ভিন্নতা খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা অনেকটা এমন কুকুর খুঁজে পাওয়ার মতোই—যে কুকুর ঘেউ ঘেউ না করে মিউ মিউ করে’।

মার্গারেট মীডের মতোই শান্তিপূর্ণ এক জাতির সন্ধান করতে গিয়ে সত্তুরের দশকে লেজে গোবরে করেছেন ম্যানুয়েল এলিজাল্ডে জুনিয়র (Manuel Elizalde Jr)। তিনি দেখাতে গিয়েছিলেন ঢালাওভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সহিংসতা, যুদ্ধবাজির কথা ঢালাওভাবে উল্লেখ করা থাকলেও ফিলিপাইনের এক জঙ্গলে টেসাডে (Tasaday) নামে এমন এক ট্রাইব আছে যারা নাকি আক্ষরিক অর্থেই এখনও সেই আদিম প্রস্তর যুগে বাস করছে। তারা ছাল বাকল পড়ে ঘুরে বেড়ায়, গুহায় বসবাস করে আর তারা নাকি এমনই শান্তিপ্রিয় যে তাদের ভাষাতে সহিংসতা, আগ্রাসন কিংবা সংঘর্ষসূচক কোনো শব্দই নেই। তাদের সংস্কৃতি একেবারে শান্তিতে শান্তিময়। এই মহা ব্যতিক্রমী শান্তিপূর্ণ মানবপ্রজাতি নিয়ে ১৯৭৫ সালে একটি বইও বের হয়েছিল 'শান্ত টেসাডে' নামে[59]।



চিত্র: মার্কোস সরকারের পরিকল্পনায় সভ্য মানুষকে অর্ধনগ্ন করে ছাল বাকল পড়িয়ে শান্তিপূর্ণ

[58] ম্যাট রিডলীর মূল উক্তিটি ছিল— ‘Her failure to discover the cultural determinism of human nature is like the dog that failed to bark’।

[59] John Nance, The gentle Tasaday: A Stone Age people in the Philippine rain forest, Harcourt Brace Jovanovich, 1975

টেসাডের মিথ সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হয়।

কিন্তু থলের বেড়াল বেরিয়ে আসতে সময় লাগেনি। আশির দশকের শেষদিকে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এল যে ম্যানুয়েল এলিজাল্ডের আগেকার কাজকর্ম আসলে ছিল পুরোটাই সাজানো[60]। আশে পাশের গ্রাম থেকে জিন্স আর টিশার্ট পরা সুশিক্ষিত ছেলেপিলেদের ছাল বাকল পরিয়ে 'শান্ত টেসাডে' সাজানো হয়েছিল। টেসাডের শান্তিময় ধরনের কোনো ট্রাইবই আসলে ফিলিপাইনে নেই, ছিলও না কখনোই। সত্তুরের দশকে ফিলিপাইনের একনায়ক ক্ষমতাশীন মার্কোস সরকারের পরিকল্পনায় ম্যানুয়েল এলিজাল্ডের কুকর্মে ইন্ধন যোগানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'শান্ত টেসাডে'কে পুঁজি করে বহির্বিশ্বে ফিলিপাইনের ইমেজ বাড়ানো।

আসলে সংস্কৃতির বিভাজনের কথা ঢালাওভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতিতে আর নৃতত্ত্বে উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় এই বিভাজন মোটেই বস্তুনিষ্ঠতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় না। ব্যাপারটা নৃতত্ত্ববিদ আর সমাজবিদদের জন্য এক নিদারূন লজ্জার ব্যাপার। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সংস্কৃতির যত বিভাজনই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই দেখা যায়, মানুষেরা অনেকটা একইভাবে রাগ অনুরাগ, হিংসা, ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। পশ্চিমা বিশ্বের আলো ঝলমলে তথাকথিত 'আধুনিক' সভ্যতা থেকে শুরু করে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যত গহীন অরণ্যের যত নাম না জানা গোত্রের মধ্যেই অনুসন্ধান করা হোক না কেন—দেখা যাবে নাচ, গান, ছবি আঁকার ব্যাপারগুলো সব সংস্কৃতিতেই কম বেশি বিদ্যমান। কেউ হয়তো গুহার পাথরে হরিণ শিকারের ছবি আঁকছে, কেউ পাথরে খোদাই করে মূর্তি বানাচ্ছে, কেউ নদীর ধারে বসে পাল তোলা নৌকাকে ক্যানভাসে উঠিয়ে আনছে, কেউবা আবার মাটির পটে গড়ে তুলছে অনবদ্য শিল্পকর্ম। সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান যোগ হবার কারণে ব্যক্তি কিংবা সংস্কৃতিভেদে চিত্রকল্পের প্রকাশ ভঙ্গিতে হয়তো পার্থক্য আছে কিন্তু চিত্র প্রকাশের বিমূর্ত স্পৃহাটি সেই একই রকম থেকে যাচ্ছে। শুধু ছবি আঁকা

[60] The Gentle Tasaday Are Merely a Persistent Hoax, The Newyork Times, January 9, 1988.

নয়, নাচ-গানের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখব। এক দেশে কেউ একতারা হাতে বাউল গান গেয়ে চলছে তো আরেকজন অন্য দেশে নিবিষ্ট মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলছে। কেউবা চোখ মুদে সেতার বাজাচ্ছে তো কেউবা গিটার কিংবা কেউ সন্তুর। যে একেবারেই আলসে সে হয়তো পড়াশুনা করার টেবিলকেই ঢোল বানিয়ে তাল ঠুকছে রবীন্দ্র সংগীতের সাথে। এক সংস্কৃতিতে কেউ হয়তো ডিস্কো নাচ নাচছে, অন্য জায়গায় সেরকমই একজন কেউ ভরত নাট্যম, আরেক জায়গায় কেউ ল্যাটিন ফিউশন, কেউবা কোনো অচেনা ট্রাইবাল ড্যান্স। নাচের রকমফেরে কিংবা মুদ্রায় পার্থক্য থাকলেও সংস্কৃতি নির্বিশেষে নাচ-গানের অদম্য স্পৃহাটি কিন্তু এক সার্বজনীন মানবপ্রকৃতিকেই উর্ধ্বে তুলে ধরছে। যুদ্ধের এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারটিও অনেকটা তাই—কম হোক বেশি হোক—প্রতিটি সংস্কৃতিতেই যুদ্ধের উপাদান কম বেশি আছে। কেউ বা যুদ্ধ করেছে লাঠি-সোটা দিয়ে, কেউ বা বল্লম দিয়ে, কেউ বা তীর ধনুক দিয়ে কিংবা কেউ বুমেরাং ব্যবহার করে, কেউবা কামান বন্দুক ব্যবহার করে, কেউবা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়ে। আদিম গুহাচিত্রগুলোতেও দেখা যায় তীক্ষ্ণ সেসব অস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পশু শিকার করেছে, কখনো বা হানাহানি মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যেই। কাজেই কেউ যদি হঠাৎ এসে দাবি করে কোনো এক দেশের বিচিত্র সংস্কৃতিতে মানুষ এতোই শান্তিপ্রিয় যে তাদের ভাষাতে কিংবা সংস্কৃতিতে সহিংসতা, আগ্রাসন কিংবা সংঘর্ষসূচক কোনো শব্দই নেই, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা সার্বজনীনতার বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু আদৌ পাওয়া যায়নি। বরং যারা বিভিন্ন সময়ে সেরকম এক্সোটিক কিছু দাবি করেছিলেন, তাদের দাবিই শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপরের শান্তিময় টেসাডে কিংবা স্যামোয়ার উদাহরণগুলো কিন্তু তারই প্রমাণ। এই ব্যাপারটির তাৎপর্য উপলব্ধি করেই ডোনাল্ড ব্রাউন তার ‘Human Universals’ গ্রন্থে বলেছেন[61]—‘It is the human universals not the differences that are truly intriguing’।

[61] Donald Brown, Human Universals, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 1991

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সংস্কৃতি ব্যাপারটা মানবসমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হলেও এটি কোনো গায়েবি পথে নয়, বরং অন্য সব কিছুর মতো জৈব বিবর্তনের পথ ধরেই উদ্ভূত হয়েছে (evolved biologically)[62]। আমরা উপরে যে নাচ, গান, ছবি আঁকা, যুদ্ধসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছি (যেগুলো মানব সভ্যতার যে কোনো সংস্কৃতিতেই খুঁজে পাওয়া যাবে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে), সেরকম অন্তত ৪০০টি বৈশিষ্ট্য স্টিভেন পিঙ্কার লিপিবদ্ধ করেছেন তার ব্ল্যাঙ্ক স্লেট বইয়ের পরিশিষ্টে[63]। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন এগুলো সবগুলোই অভিন্ন মানবপ্রকৃতির দিকেই ইঙ্গিত করে। বাহ্যিকভাবে যত পার্থক্যই আমরা দেখি না কেন, আসলে আমরা মানুষেরা এক অভিন্ন সংস্কৃতির অংশ। কারণ, আমাদের দেহ কাঠামোর মতো সংস্কৃতিও মোটা দাগে মানব বিবর্তনের অভিযোজনগত ফসল। ঠিক যেমন আমাদের হাত পা কিংবা অগ্ন্যাশয় তৈরি হয়েছে বংশাণু বা জিনের নিয়ন্ত্রণে, ঠিক তেমনি মানবসংস্কৃতিও তৈরি হয়েছে বংশাণুর দ্বারাই (বংশাণুর দ্বারা বলা হচ্ছে কারণ, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশাণু যা আবার মস্তিষ্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক, আর সংস্কৃতি হচ্ছে সেই মানব মস্তিষ্কেরই সম্মিলিত অভিব্যক্তি)।

বাঘের যেমন নখর বিশিষ্ট থাবা আছে, ক্যাঙ্গারুর পেটে আছে থলি, ঠিক তেমনি মেরুভল্লুকের গায়ে আছে পুরু পশম। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন স্ব-স্ব প্রজাতির ক্ষেত্রে অনন্য বৈশিষ্টের দিকে নির্দেশ করে; ঠিক তেমনি মানবসমাজের জন্য অনন্য বৈশিষ্টের নিয়ামক হয়ে আছে মানবসংস্কৃতি। বাঘে বাঘে নখরের আকার আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও সেটা যেমন শেষ পর্যন্ত বাঘের নখরই, ঠিক তেমনি সংস্কৃতিতে কিছু বাহ্যিক ছোটখাট ভেদাভেদ থাকলেও সেটা শেষ পর্যন্ত অভিন্ন মানব সংস্কৃতিই। হ্যাঁ, শতধা

[62] Pierre van den Berghe, a pioneer sociobiologist at the University of Washington, puts it best when he says,

> Certainly we are unique, but we are not unique in being unique. Every species is unique and evolved its uniqueness in adaptation to its environment. Culture is the uniquely human way of adapting, but culture too evolved biologically.

[63] Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, Viking, 2002, p 435-9, appendix

বিভক্তি সত্ত্বেও মানব কালচারগুলো আসলে সম্মিলিতভাবে সার্বজনীন সংস্কৃতি বা কালচারাল ইউনিভার্সাল (Cultural Universal)-কেই উর্ধ্বে তুলে ধরে, অন্তত বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের তাই অভিমত।

২০১০ সালের আগস্ট মাসে মুক্তমনা ব্লগে যখন আমার লেখাটা 'সংস্কৃতির ভূত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক একই সময় ড. নৃপেন্দ্র সরকারও একটি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন—*বিবর্তনের চোখে চোখের জল* শিরোনামে। সেখানে তিনি ব্যথা বেদনা আর চোখের জলের বিবর্তনীয় উৎস খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছিলেন[64]। লেখায় সংস্কৃতিভেদে কান্নার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, প্রিয়জনের মৃত্যুতে কান্নাকাটিতে হিন্দুদের জুড়ি নেই। কান্না চলবে দিনের পর দিন। কোনো কোনো হিন্দু সমাজে এই কান্না এক মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়। মাস শেষে শ্রাদ্ধ করে অফিসিয়ালি কান্নার ইতি দেওয়া হয়। হিন্দু কান্না এখানেও শেষ হয় না। গয়াতে পিণ্ড দেওয়ার সময় একবার। কাশীতেও একবার। সেই পিণ্ডদান একবছর পরেই হোক আর বার বছর পরেই হোক। বুক ভাঙবে, চোখে বৃষ্টির ধারা বইবে। কিন্তু ড. সরকার তার লেখাটিতে তিব্বতীদের মধ্যে এক গোত্রের উল্লেখ করেছিলেন যারা প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাঁদে না, দেবতা রুষ্ট হবে এই ভয়ে। তারা নাকি চোখের জল শুকিয়ে ফেলে। অনেকের মনে হতে পারে, তিব্বতীদের এই ব্যাপারটা (যদি না ব্যাপারটা মার্গারেট মীড কিংবা ম্যানুয়েল এলিজাল্ডে জুনিয়রের মতো হোক্স কিছু হয়) সার্বজনীন সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আসলে কিন্তু তা নয়। তারাও আমার আপনার মতো স্বজন হারার দুঃখে ব্যথিত হয়। হয়তো কল্পিত দেবতার শাস্তির ভয়ে প্রকাশ করে না, কিন্তু ব্যথা অনুভবের ব্যাপারটা থেকেই যায়। আমি লেখাটি মুক্তমনায় দেওয়ার পর 'আবেগ বিশ্বজনীন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে' বলে সেটাই স্পষ্ট করেছেন মুক্তমনা ব্লগার জওশন আরা তার একটি মন্তব্যে[65]—

---

[64] নৃপেন্দ্র সরকার, বিবর্তনের চোখে চোখের জল, মুক্তমনা, আগস্ট ১২, ২০১০; http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=9578

[65] জওশন আরা, অভিজিৎ রায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, মুক্তমনা, আগস্ট ১৪, ২০১০ at ১২:৫৯ অপরাহ্ণ |

আমাদের স্বাতন্ত্র্য পরিমাপ করি, পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে আমরা কতটুকু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করি, কাজ করি, সেইটুকু বিচার করে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা 'ইউনিভার্সাল হিউম্যান কালচারের' বাইরে যাই না। কেবল বহুল প্রচলিতর চেয়ে ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করি। স্বজন হারানোয় কে চল্লিশ দিন কাঁদল আর কে চোখ শুষ্ক করে রেখেছিল, সেগুলো কেবল মাত্র মানদণ্ড থেকে ভিন্নতার উদাহরণ। ভিত্তিভূমি হলো, স্বজন হারানোতে বিচ্ছেদ ব্যথা বা কষ্ট অনুভব করা। এইখানেই সার্বজনীনতা।

মানব সংস্কৃতি কোনো উদ্ভট কিংবা বিচিত্র সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশের জোড়াতালি দেয়া ফসল নয়, বরং, জৈবিক পথেই উদ্ভূত একটি অভিন্ন এবং সার্বজনীন মানব উপাদানের অংশ।

চতুর্থ অধ্যায়

সখি, ভালোবাসা কারে কয়?

ডারউইন দিবস এবং ভালোবাসা দিবস

মুক্তমনায় আমরা প্রতি বছর ডারউইন দিবস পালন করি। সেই বিশেষ দিনটিতে চার্লস ডারউইন এবং তার যুগান্তকারী বিবর্তন তত্ত্বকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার চেষ্টা করা হয়। হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এরকম ঘটা করে অজানা অচেনা দিনটিকে স্মরণ করার কারণ কী? কারণ আছে। আসলে পৃথিবীতে খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই কিন্তু জনসাধারণের মানসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব এমনি বিপ্লবী তত্ত্ব, তেমনি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইন আর রাসেল ওয়ালেস প্রস্তাবিত বিবর্তনতত্ত্ব। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট তার একটি বইয়ে বলেছিলেন[66],

> আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরস্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।

কাজেই এমন যুগান্তকারী একটি তত্ত্ব, তার সঠিক উদযাপন না হলে কী চলে! বলা বাহুল্য, মুক্তমনাই প্রথমবারের মতো ডারউইন দিবসকে বাঙালি পাঠকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বটুকু কাঁধে তুলে নিয়েছিল ২০০৬ সালে। আন্তর্জালের বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা সে বছর ডারউইন দিবস পালন করে প্রথমবারের মতো।

---

[66] Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, Simon & Schuster, 1996, p 21.

এর পর থেকে প্রতি বছরই পালন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় আকারে পালন করেছিলাম আমরা ২০০৯ সালে। কারণ ঐ বছরটাই ছিল ডারউইনের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী আর সেই সাথে তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ‘প্রজাতির উদ্ভব’ বা ‘অরিজিন অব স্পিশিজ-এর প্রকাশেরও দেড়শত বছর। এখন তো বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, যুক্তিবাদী কাউন্সিল সহ বহু সংগঠনই ঘটা করে ডারউইন দিবস পালন করে, দিনব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান কিংবা র‍্যালির আয়োজন করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের জন্য ডারউইন দিবস ডারউইনের দীর্ঘ শ্মশ্রুমন্ডিত মুখচ্ছবির কোনো স্তব ছিল না, বরং তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের যথাযথ স্বীকৃতি, তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের প্রতি নির্মোহ আর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ডারউইন দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর ১২ই ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের প্রায় কেউই এই বিশেষ দিনটির সাথে পরিচিত না হলেও এর দু দিন পরের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখটির সাথে প্রায় সবাই পরিচিত। সেই যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে—বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই ভালোবাসা দিবস কী, কিংবা কাহাকে বলে তা নিয়ে বোধ হয় বিশদ না বললেও চলবে। কারণ এ ব্যাপারটি কারোরই এখন অজানা কিছু নয়। কিন্তু যেটি অজানা তা হলো, এই ভালোবাসা দিবসের উদযাপিত ভালোবাসার সাথে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা! এই অধ্যায়টি সেই ঘনিষ্ঠ প্রেমময় সম্পর্কেরই উন্মোচন।

গত বছর ২০১০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি আমাদের মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন ‘ভালোবাসা ও বিবর্তন’ শিরোনামে[67]। দুই দিবসের তাৎপর্যকে বিনি সুতার মালায় তিনি গাঁথলেন এক অনুপম ছন্দে। তিনি তার প্রবন্ধ শুরুই করলেন এই বলে—

রসকষহীন ডারউইন দিবসের পর আসে রসে ভরপুর ভালোবাসা দিবস প্রেমিকদের

[67] অপার্থিব, ভালবাসা ও বিবর্তন, মুক্তমনা, ২৯ মাঘ ১৪১৬ (ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১০), লিঙ্ক - http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=৩ ; =

ডারউইন দিবসের কঠিন শীতল শিক্ষা থেকে রেহাই দিয়ে ভালোবাসার মিষ্টি আমেজের ছোঁয়া নিয়ে। দুটো দিবসের প্রায় একই সময় পালন করাটা হয়তো এক যোগসূত্রহীন কাকতালীয় ব্যাপার। ডারউইনের জন্মদিন আর রোমান পাদ্রী সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদিবসের মধ্যে কি যোগসূত্রই বা থাকতে পারে। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব তথা বিবর্তনের সঙ্গে সত্যই ভালোবাসার এক গভীর যোগসূত্র আছে, যা মোটেই কাকতালীয় নয়। ডারউইনের "প্রজাতির উৎস (Origin of Species)" আর "মানুষের উৎপত্তি (The Descent of man)" বই দুটি প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ অবধি ডারউইনের সেই মূল তত্ত্বকে ভিত্তি করে ও নতুন সাক্ষ্য প্রমাণ আর পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান এর দ্বারা সেই তত্ত্বকে পরিশীলিত ও সংশোধিত করে মানবপ্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টায় জীববিজ্ঞানীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। 'প্রেম কী?' 'মানব নৈতিকতার উৎস কি?' এ ধরনের সনাতন প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আসছে সামাজিক-জীববিজ্ঞানী আর বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বদৌলতে, বিশেষ করে বিংশ শতকের শেষ দুই দশকে প্রখ্যাত গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা থেকে। তাঁদের গবেষণা মানব অনুভূতির সকল দিকেরই কারণ হিসেবে আমাদের বৈবর্তনিক ইতিহাসের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অন্য সব অনুভূতির মতো প্রেমানুভূতির মূলও বিবর্তনে নিহিত।

অপার্থিব ভুল কিছু বলেননি। বিবর্তনের কল্যাণে প্রেম ভালোবাসার অন্তিম রহস্যগুলোর অনেক কিছুই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। তবে কিছু কথা আছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা প্রেম শব্দটিকে কেবল আধো আধো প্লেটোনিক কিংবা স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না থেকে এটাকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। ফস্টি নস্টি কিংবা টক ঝাল মিস্টি ভালোবাসার অনুভুতির বাইরে আছে পারস্পরিক মনোদৈহিক আকর্ষণ। পাশাপাশি থাকে রাগ, অভিমান, ঈর্ষা। এর সাথে থাকে সঙ্গী নির্বাচনের কৌশল, আনন্দ, ভয় , ঘৃণা, বিচ্ছেদ এমনকি যৌনমিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও।

শুরু করা যাক সেই চিরপুরাতন অথচ সদা নতুন প্রশ্নটি দিয়ে। প্রেম কী?

শেক্সপিয়র তার একটি নাটিকায় তার সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন, “what 'tis to love?”[68]। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তার একটি বিখ্যাত গানে একই ধরনের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন[69] —

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?
সখি, যাতনা কাহারে বলে ?
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী – ‘ভালোবাসা’, ‘ভালোবাসা’
সখি, ভালোবাসা কারে কয়!
সেকি কেবলি যাতনাময়।
সেকি কেবলই চোখের জল?
সেকি কেবলই দুখের শ্বাস? ...

ভালোবাসা নিয়ে ইংরেজিতেও অনেক ধরনের গান আছে। এর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় গানটি হচ্ছে—I'll Never Fall in Love Again।[70] গানের কথাগুলো এরকমের—

What do you get when you fall in love?
A guy with a pin to burst your bubble
That's what you get for all your trouble
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

What do you get when you kiss a girl
You get enough germs to catch pneumonia
After you do, she'll never phone you
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

---

[68] William Shakespeare (1564–1616), Dialogue between Phebe and Silvius, in As You Like It, act 5, sc. 2, l. 83-98.

[69] গানটি ইউটিউবে শোনা যাবে শ্রাবণী সেনের কণ্ঠে, এই লিঙ্ক থেকে - http://www.youtube.com/watch?v=emvIYPWbqDk

[70] এই গানটি ইউটিউব থেকে শোন যাবে Gail Blanco’র কণ্ঠে এই লিঙ্ক থেকে - http://www.youtube.com/watch?v=vUHx6UE_U1w

কিন্তু কবিগুরু যখন 'সখি ভালোবাসা কাহারে বলে?' বলে গানে গানে প্রশ্ন করেছিলেন কিংবা শেক্সপিয়র তার নাটকের সংলাপ লিখেছিলেন, "what 'tis to love?" বলে, তখন কি তারা একবারের জন্যও ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষা করছে তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে? বিবর্তন মনোবিজ্ঞানসহ বিবর্তনের বিভিন শাখা থেকে পাওয়া প্রান্তিক জ্ঞানের বদৌলতে প্রেমের এক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কিন্তু দেয়া সম্ভব।

কিছুদিন আগেও আমরা ঢালাওভাবে বলে দিতাম ভালোবাসার কোনো সংজ্ঞা নেই, বিজ্ঞান ভালোবাসার কোনো ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম ইত্যাদি। সেই দিন আর নেই। বিজ্ঞান এখন চোরের মতো সিঁদ কেটে ঢুকে পড়েছে ভালোবাসার গোপন কুঠুরিতে। চলুন আমরাও সে কুঠুরিতে পা রাখি...

কুদ্দুস সিমির প্রেম : নিশা লাগিলো রে...

কুদ্দুস 'লবে' পড়িয়াছে। তাহার মন উড়ু উড়ু। পড়ালেখায় মন নেই। বই খুললেই কেবল সিমির মুখ ভেসে উঠে। আনমনে গাইতে থাকে আগুনের গান—

> ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে মন বসে না
> বই খুললেই দেখি তার মুখখানা
> অস্থির মন আর বাধা মানে না।
>
> একা পথে চললেই পাশে চলে সে
> নিবিড় হয়ে সে বলে সে মোরে
> ভালোবাসি ভালোবাসি ..।

ক্যামন যেন ঘোরের মধ্যে থাকে কুদ্দুস সর্বক্ষণ। একটা পাখি দেখলে মনে হয়— ইস পাখির মতো ডানা মেলে যদি সিমির সাথে উড়ে বেড়ানো যেতো। একটা গোলাপ ফুল দেখলেই মনে হয়—আহা যদি সিমির হাতে তুলে দেয়া যেত! রাস্তার পাশে চটপটির গাড়ি দেখলে মনে হয়—আহা সিমির সাথে মিলে ফুচকা খাওয়া যেত!

না সিমির সাথে ফুচকা খাওয়া আর কুদ্দুসের হয়ে উঠে না। কারণ সিমি রাস্তার আজে বাজে জিনিস খায় না। সিমি মহা বড়লোকের মেয়ে। বসুন্ধরার আলিশান ফ্ল্যাটে থাকে। পাজেরো জিপে করে ভার্সিটিতে আসে। ড্রাইভার সাহেব দরজা খুলে দেয়, আর সিমি আলতো পায়ে গাড়ি থেকে নেমে সটান হাঁটা দেয় ক্লাসের দিকে। স্টিফেনি মেয়র কিংবা লিসি হ্যারিসনের ইংরেজি উপন্যাসের বই বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'হাবি জাবি পোলাপাইনরে' পাত্তাই দেয় না সিমি। মোটের উপর সিমি জানেই না তার জন্য কোনো এক মজনু দিওয়ানা!

আর ওদিকে তো মজনু কুদ্দুসের অবস্থা আসলেই কেরোসিন। সারাক্ষণই ঘোরের মধ্যে থাকে। মনে মনে আকাশ-কুসুম কল্পনা। ভাবে কোনোদিন হয়তো চলতে গিয়ে কিংবা সিড়ি ভেঙে নামতে গিয়ে সিমি উষ্টা খেয়ে পড়বে, স্টেফানি মেয়ারের বইগুলো বগল থেকে ছিটকে পড়ে যাবে, আর ঠিক সেসময়ই বীর পুরুষের মতো রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটবে নায়করাজ কুদ্দুসের। পড়ে যাওয়া বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সিমির হাতে তুলে দিবে, সিমি প্রথম বারের মতো অবাক নয়নে তাকাবে কুদ্দুসের দিকে, সে দৃষ্টিতে থাকবে আধো কৃতজ্ঞতা, আধো প্রেম, আর আধো রহস্যের ছোঁয়া...

নিশা লাগিলো রে,
বাঁকা দু' নয়নে নিশা লাগিলো রে ...

কিন্তু সাতমন ঘিও পুড়ে না, আর সিমিও উষ্টা খায় না। আর কুদ্দুসের প্রেমের শিকেও ছিঁড়ে না। কিন্তু ছিঁড়ে না ছিঁড়ে না বলেও শেষ পর্যন্ত ছিঁড়লো একদিন। ক্যামনে? ক্যামনে আর, এমনে—

চোখ থাকলেই চোখাচোখি হবে।
হলো!
এখানেই শেষ হতে পারত -
না, প্রেম হয়ে গেল!

তা কুদ্দুস-সিমির প্রেম ক্যামনে হলো, আর তারপর আর কী কী হলো আমরা আর সেখানে এখন না যাই। আমরা বরং চিন্তা করি—কুদ্দুসের এই সদা ঘোর লাগা অবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? এ নিয়ে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ হেলেন ফিশার এবং স্নায়ুচিকিৎসক লুসি ব্রাউন, আর্থার অ্যারোন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রায় ৪০ জন প্রেমে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উপর এক গবেষণা চালান[71]। তাদের গবেষণার ধরনটি ছিল এরকমের। প্রেমিক-প্রেমিকাদের সামনে তাদের ভালোবাসার মানুষটির ছবি রাখা হলো, এবং তাদের মস্তিষ্কের ফাংশনাল এমআরআই (fMRI) করা হলো। দেখা গেল, এ সময় তাদের মস্তিষ্কের ভেন্ট্রাল এবং কর্ডেট অংশ উদ্দিপ্ত হচ্ছে, আর সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিন নামক এক রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটছে। অবশ্য কারো দেহে ডোপামিন বেশি পাওয়া গেলেই যে সে প্রেমে পড়েছে তা নাও হতে পারে। আসলে নন-রোমান্টিক অন্যান্য কারণেও কিন্তু ডোপামিনের নিঃসরণ বাড়তে পারে। যেমন, গাঁজা কিংবা কোকেইন সেবন করলে। সেজন্যই আমরা অনেক সময়ই দেখি ভালোবাসায় আক্রান্ত মানুষদের আচরণও অনেকটা কোকেইনসেবী ঘোরলাগা অবস্থার মতোই টালমাটাল হয় অনেক সময়ই।

তবে ভালোবাসার এই রসায়নে কেবল ডোপামিনই নয় সেই সাথে জড়িত থাকে অক্সিটাইসিন, ভেসোপ্রেসিন সহ নানা ধরনের বিতিকিচ্ছিরি নামের কিছু হরমোন। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই হরমোনগুলো নাকি ‘ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে’ মানে প্রেমিক-প্রেমিকার বন্ধন দীর্ঘদিন জোরালো করে রাখতে সহায়তা করে। এমনকি বিজ্ঞানীরা এও বলেন কেউ মনোগামী হবে না বহুগামী হবে—তা অনেকটাই কিন্তু নির্ভর করছে এই হরমোনগুলোর তারতম্যের উপর। দেখা গেছে রিসেপটর বা গ্রাহক জিনে ভেসোপ্রেসিন হরমোনের আধিক্য থাকলে তা পুরুষের একগামী মনোবৃত্তিকে ত্বরান্বিত করে। বিজ্ঞানীরা প্রেইরি ভোলস আর মোন্টেইন ভোলস নামক দুই ধরনের ইঁদুরের উপর

[71] Helen Fisher, What is Love?, On Air, BBC International Magazine 98:12-15

গবেষণা চালিয়ে তারা দেখেছেন, একগামিতা এবং বহুগামিতার মতো ব্যাপারগুলো অনেকাংশেই হরমোনের ক্রিয়াশীলতার উপর নির্ভরশীল। এমনকি বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে ভেসোপ্রেসিনের প্রবাহকে আটকে দিয়ে একগামী ইদুঁরকে বহুগামী, কিংবা অতিরিক্ত ভেসোপ্রেসিন প্রবেশ করিয়ে বহুগামী ইঁদুরকে একগামী করে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। তবে ইঁদুরের ক্ষেত্রে যেটা সত্য তার পুরোটুকু মানুষের ক্ষেত্রে সত্য কি না তা নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে। অন্তত বহুগামী লুলপুরুষদের লোলুপতাকে কেবল ইঁদুরের মতো হরমোন চিকিৎসার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বললে অধিকাংশই দ্বিমত করবেন।

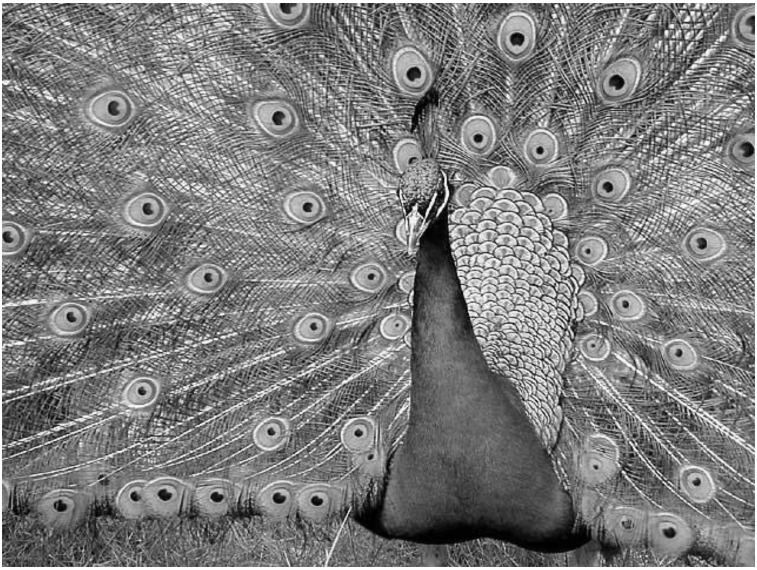
আমরা না হয় কুদ্দুসের প্রেমময় সময়গুলোই বিশ্লেষণে আনি এই মুহূর্তে। কথা হচ্ছে তীব্র প্রেমের সময়গুলোতে কেন দিগ্‌বিদিকশূন্য নেশার ঘোর লাগা ভাবের উদয় হয়, কেন বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পায়? কেনই বা ভয়ভীতি উবে যায় রাতারাতি? এ সময় বন্ধুদের পরামর্শও মাথায় ঢোকে না। যদি কেউ কুদ্দুসকে বলতো ‘ঐ ব্যাটা কুদ্দুস—সিমির পিছে অযথা ঘুইরা লাভ নাই, ওর জগৎ আর তোর জগৎ আলাদা...’ কুদ্দুসের মাথার দেওয়াল সেই তথ্য পৌঁছুবেই না। কিন্তু কেউ যদি আবার উলটো বলে যে, ‘সিমি আজকে তোর সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল ...’ সাথে সাথেই কুদ্দুসের মনে হবে এ যেন ‘মক্কা বিজয়’! আসলে তীব্রপ্রেমের সময়গুলোতে কেন মানুষজনের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় তার একটা ভালো ব্যাখ্যা আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। আমাদের মস্তিষ্কে অ্যামাগডালা বলে একটি বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গ আছে। সেটা এবং মস্তিষ্কের কর্টেক্সের কিছু এলাকা আমাদের ভয়-ভীতি নিয়ন্ত্রণ করে, অকস্মাৎ বিপজ্জনক পরিস্থিতি এলে আমাদের আগাম সতর্ক করে দিতে পারে। দেখা গেছে প্রেমের রোমাঞ্চকর এবং উত্তাল সময়গুলোতে মস্তিকের এ এলাকাগুলোর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভয় ভীতি কিংবা ‘ক্রিটিকালি’ চিন্তা করার ব্যাপারস্যাপারগুলো পুরোপুরি লোপ পায় তখন। দুর্মুখেরা বলে, বেশি পরিমাণে গাঁজা-ভাং খেলেও নাকি ঠিক এমনটিই হয়।

বিবর্তন ও প্রেম

কুদ্দুসের এই কোকেইন মার্কা প্রেমানুভূতির মূল উৎস বা কারণ কী তাহলে? উত্তরটা কিন্তু খুব সোজা। ঘুরে ফিরে সেই একই ব্যাপার, যা বিবর্তনের একেবারে গোড়ার কথা—বংশাণু রক্ষার তাগিদ বা নিজের জিনকে টিকিয়ে রাখার অবচেতন প্রয়াস। আসলে প্রতিলিপি, পরিব্যক্তি এবং প্রকারণের সমন্বয়ে গঠিত প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন শুধু প্রেমানুভূতিই নয়, বস্তুত এটি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা, প্রণয়, আকাঙ্ক্ষা সহ মানুষের সব ধরনের অনুভূতি ও আচরণেরই জন্ম দেয়।

আসলে বংশাণু রক্ষার জন্য যে কোনো প্রাণী অন্তত দুটি কাজ সুচারুভাবে করতে চায়। এক—প্রজননক্ষম বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়, আর দুই—সঠিক যৌনসঙ্গী নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের বংশাণু পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে চায়। সঠিক সঙ্গী নির্বাচন করাটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিই প্রধানত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মূল উপলক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। ডারউইন নিজেও ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক চিন্তা করেছিলেন এবং তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) পাশাপাশি যৌনতার নির্বাচন (Sexual Selection)কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। না দিয়ে তো উপায় ছিল না। ডারউইন লক্ষ করেছিলেন যে, প্রাণী জগতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে যা কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে টিকে থাকার কথা নয়। এগুলো টিকে আছে, কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিপরীত লিঙ্গের যৌনসঙ্গীর দ্বারা বংশপরম্পরায় দিনের পর দিন আদৃত হয়েছে। একটি ক্লাসিক উদাহরণ হচ্ছে পুরুষ ময়ূরের দীর্ঘ পেখম থাকার উদাহরণ। এমন নয় যে দীর্ঘ পেখম পুরুষ ময়ূরকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে কোনো বাড়তি উপযোগিতা দিয়েছিল। বরং দীর্ঘ পেখম স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহতই করার কথা, এবং করেছেও। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে ময়ূরের দীর্ঘ পেখমকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দীর্ঘ পেখম ময়ূরদের জন্য চরম অসুবিধাজনক। দীর্ঘ পেখম থাকলে দৌঁড়াতে অসুবিধা হয়, শিকারিদের চোখয়ে পড়ার

সম্ভাবনাও থাকে বেশিমাত্রায়। কাজেই টিকে থাকার কথা বিবেচনা করলে দীর্ঘ পেখম ময়ূরের জন্য কোনো বাড়তি উপযোগিতা দেয়নি বিবর্তনের পথ পরিক্রমায়। দীর্ঘ পেখম টিকে গেছে মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে। পুরুষ ময়ূরের লম্বা পেখমকে ভালো বংশাণুর নির্দেশক হিসেবে দেখত ময়ূরীরা । কাজেই দীর্ঘ পেখমের ঢেউ তোলা সুশ্রী ময়ূরেরা যৌনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত হতে পেরেছিল, কারণ বিপরীত লিঙ্গের যৌনসঙ্গীদের কাছে তারা ছিল একেকজন 'ব্রাড পিট' কিংবা টম ক্রুজ! তারাই শেষপর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিল ময়ূরীদের যৌনাকর্ষণের ভিত্তিতে[72]।



চিত্র: ময়ূরের দীর্ঘ পেখম টিকে আছে মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছন্দ তথা যৌনতার নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে।

[72] এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, যৌনতার নির্বাচন কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে একটু আলাদা। যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো বেঁচে থাকায় বাড়তি উপাদান যোগ করে না, এগুলো বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে যায় কেবল বিপরীত লিঙ্গের পছন্দ এবং অভিপ্রায়কে মূল্য দিয়ে। তারপরও, ময়ূরের যে পেখম বেঁচে থাকায় কোন সহায়তা দিচ্ছে না, সেটা কেন বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ ময়ূরীর কাছে কাছে সৌন্দর্য হিসেবে প্রতিভাত হবে – এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে। এর কারণ হল, যে ময়ূরের দীর্ঘ পেখম আছে, সে ময়ূর জেনেটিকভাবে অধিকতর 'ফিট' বলে ময়ূরীর কাছে প্রতিভাত হয়; কারণ, দীর্ঘ পেখম তৈরি এবং এবং এর অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে টিকে থাকায় কিছু বাড়তি শক্তি ব্যবহার করতে হয়। যারা এটা করতে পারে, ময়ূরীর কাছে তারাই 'সুন্দর'! ইসরাইলী বিজ্ঞানী জাহাবির একটি প্রিন্সিপল আছে – Handicap principle ।এর আলোকে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ নিয়ে এই অধ্যায়ের শেষদিকে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

মোটা দাগে, যৌনতার নির্বাচন কোনো বাড়তি সুবিধা দেয় না প্রজাতির বেঁচে থাকায়। এগুলো কেবলই গয়নাগাটির মতো 'অর্নামেন্টাল প্রোডাক্ট'। ময়ূরের পেখমের মতো মানবসমাজেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো অর্নামেন্টাল বা অলংকারিক। কবিতা লেখা, গান করা থেকে শুরু করে গল্প বলা, আড্ডা মারা, গসিপ করা, ভাস্কর্য বানানো—প্রভৃতি হাজারো বৈশিষ্ট্য মানবসমাজে দেখা যায় যেগুলো স্রেফ অলংকারিক—এগুলো বেঁচে থাকায় কোনো বাড়তি উপাদান যোগ করেনি, কিন্তু এগুলো টিকে গেছে যৌন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে।

এই 'মেটিং সিলেকশনের' মায়াবী খেলা চলে কম-বেশি সব প্রাণীর মধ্যেই। স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রায় সব প্রজাতিতেই দেখা যায় পুরুষেরা সাধারণত অনেক বড় এবং বলশালী হয়, সেই সাথে দেখা যায় অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সমাহার (যেমন, উজ্জ্বল রঙ, শিং, কেশর, দ্রুতগামিতা, ক্ষিপ্রতা, নৃত্য এবং সংগীতে পারদর্শিতা ইত্যাদি)। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। বড় চুল রাখা, দামি সানগ্লাস, কেতাদুরস্ত কাপড় পরা থেকে শুরু করে দামি গাড়ি, বাড়ি, শিক্ষা, বাকচাতুর্য, প্রতিভা, নাচ, গান, বুদ্ধিমত্তা সবকিছুই মানুষ কাজে লাগায় বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণের কাজে। মানবসমাজের নারীপুরুষের বহু বৈশিষ্ট্য এবং অভিব্যক্তিই মোটাদাগে সম্ভবত যৌনতার নির্বাচনের ফল। আমি মুক্তমনা ব্লগে বেশ কিছু যৌনতার নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে বেশ কিছু লেখা আগে লিখেছি[73, 74]; সংশপ্তক কিছুদিন আগে মেটিং সিলেকশনে পুরুষের নাচের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন মুক্তমনায় 'পুরুষের নৃত্য এবং নারী' শিরোনামে[75]। এগুলো সবই মানবসমাজে যৌনতার নির্বাচনের গুরুত্বকে সুচারুভাবে তুলে ধরে। অপার্থিব তার 'ভালোবাসা ও

---

[73] অভিজিৎ রায়, সহিংসতা, নির্যাতন এবং 'লুল পুরুষ' উপাখ্যান—একটি বিবর্তনীয় অনুসন্ধান, মুক্তমনা, ২০ শ্রাবণ ১৪১৭ (আগস্ট ৮, ২০১০)

[74] অভিজিৎ রায়, পুরুষ মানুষ দুই প্রকারের – জীবিত আর বিবাহিত, মুক্তমনা, ৩১ ভাদ্র ১৪১৭ (সেপ্টেম্বর ১৫th, ২০১০)

[75] সংশপ্তক, পুরুষের নৃত্য এবং নারী, মুক্তমনা, ১৪ অগ্রহায়ন ১৪১৭ (নভেম্বর ২৮, ২০১০)

বিবর্তন' (পূর্বোক্ত) লেখায় লীন মার্গুলিস ও ডরিয়ান সেগান "Mystery Dance: On the Evolution of Human Sexuality" বই থেকে একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

> "প্রযুক্তি কিংবা সভ্যতা আমাদেরকে আমাদের পশুত্ব থেকে খুব দূরে সরাতে পারেনি, বরং তা আরও জোরাল ভাবে সেটা অধিষ্ঠিত করেছে। সৌখিন চশমা, স্কন্ধালঙ্কার ইত্যাদি যেন অনেকটা ময়ূরের পুচ্ছের মতোই।"

যৌনতার নির্বাচন আমাদের মানসপটে কাজ করে বলেই কারো সুন্দর চেহারা কিংবা মনোহারী ব্যক্তিত্ব দেখলে আমরা সবাই মনের অজান্তেই আন্দোলিত হয়ে উঠি। বঙ্কিমচন্দ্র যে একসময় বলেছিলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'—ব্যাপারটা কিন্তু মিথ্যে নয় একেবারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ কিংবা সংস্কৃতিভেদে সবাই বিপরীত লিঙ্গের যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে 'আকর্ষণীয়' বলে মনে করে সেগুলো হলো—পরিষ্কার চামড়া এবং প্রতিসাম্যময় মুখ, পরিষ্কার চোখ, সুন্দর এবং সুগঠিত দাঁত, সতেজ এবং সুকেশী চুল এবং চেহারার গড়পড়তা। সুন্দর চামড়া[76] (Unblemished skin), স্বচ্ছ চোখ (clear eyes), সুন্দর এবং সুগঠিত দাঁত (intact teeth), সতেজ এবং সুকেশী চুল (luxuriant hair) কেন পছন্দনীয় তা বোঝা কঠিন কিছু নয়। এগুলো তারুণ্য, সুস্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি প্রজনন ক্ষমতার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের কাছে। একই ব্যাপার খাটে প্রতিসাম্যময় মুখের (symmetrical face) ক্ষেত্রেও। এ ধরনের সুগঠিত চেহারা বিপরীত লিঙ্গের কাছে প্রমাণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল যে তার পছন্দনীয় মানুষটি অপুষ্টির শিকার নয়, কিংবা জীবাণু কিংবা পরজীবীদের আবাসস্থল নয়। অর্থাৎ এ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল বংশাণু টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে সঠিক

[76] পরিস্কার চামড়া বলতে এখানে সাদা চামড়া বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হয়েছে Unblemished skin বা নিষ্কলঙ্ক চামড়াকে। বলা বাহুল্য, সাদা, কালো বাদামি সব চামড়াই আনব্লেমিশড বা নিষ্কলঙ্ক হতে পারে। এই নিষ্কলঙ্ক চামড়া এক ধরনের 'ফিটনেস মার্কার' ছিল আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচনে বলে ধারণা করা হয়, কারণ এ ধরনের চামড়া সুস্থতার প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল তাদের কাছে।

যৌনসঙ্গী নির্বাচনের একধরনের ‘সফল মার্কার’।

চেহারার গড়পড়তা ব্যাপারটা সাদা দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। কেন গড়পড়তা চেহারাকে ‘আকর্ষণীয়’ বলে মনে হবে? এটা মনে হয় কারণ, ‘গড়পড়তা চেহারা’ একটা বিশেষ ব্যাপারকে তুলে ধরে। সেটা হচ্ছে ‘জেনেটিক ডাইভার্সিটি’ বা বংশাণুক্রমিক বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য বজায় থাকা মানে বাহক অধিকতর রোগ প্রতিরোধে সক্ষম এবং প্রতিকূল পরিবেশে সহজে অভিযোজিত হবার ক্ষমতা সম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। আসলে আমরা যে গড়পড়তা চেহারাকে ‘সুন্দর’ বলে রায় দেই, তা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন একটি ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে। নির্বিচারে ১০ টি চেহারা নিয়ে ফটোশপ কিংবা কোনো প্রফেশনাল সফটওয়্যারে চেহারাগুলো মিশ্রিত (blend) করে উপস্থাপন করলে সেটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। নীচের ছবিটি লক্ষ করুন। প্রথম দুটো ছবিকে মিশ্রিত করে তৃতীয় ছবিটি তৈরি করা হয়ছে। মনঃস্তাত্বিক জরিপে অধিকাংশ লোকেই তৃতীয় ছবিটিকে অন্য দুটো ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় বলে রায় দেয়!



চিত্র: যখন একাধিক আসল চেহারাকে মিশ্রিত করে গরপরতা চেহারাতে পরিণত করা হয়, সেটি অধিকাংশ মানুষের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

তবে যৌনতার নির্বাচন শুধু অভিন্ন মানবপ্রকৃতি গঠন করেছে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। বহুক্ষেত্রেই এটি পার্থক্য সূচিত করেছে নারী পুরুষের পছন্দ-অপছন্দে। অভিন্ন কিছু

বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যৌনতার নির্বাচন আবার কাজ করেছে নারী-পুরুষের পার্থক্যসূচক মানসজগৎ তৈরিতেও—পলে পলে একটু একটু করে। আসলে সত্যি বলতে কি যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করে পুরুষ যেমন গড়েছে নারীকে, তেমনি নারীও গড়েছে পুরুষের মানসপটকে। এক লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলোর আবেদন তৈরি করেছে আরেক লিঙ্গের চাহিদা। তৈরি এবং ত্বরান্বিত হয়েছে বিভিন্ন লিঙ্গ-ভিত্তিক নানা পছন্দ অপছন্দ। পুরুষ দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেছে বলে স্বভাবে হয়ে উঠেছে অনেক সহিংস। আবার নারীরাও একটা সময় পুরুষদের এই সহিংসতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কারণ এ ধরনের পুরুষেরা নিজ নিজ ট্রাইবকে রক্ষা করতে পারত বহিঃশত্রুর হাত থেকে। এ ধরনের সমর দক্ষ পুরুষেরা ছিল সবার হার্টথ্রব—এরা দিয়েছিল নিজের এবং পরিবারের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা। এ ধরনের সাহসী পুরুষেরা নিজেদের জিন ছড়াতে পেরেছে অনেক সহজে, আমার মতো কাপুরুষদের তুলনায়! ফলে নারীরাও চেয়েছে তার সঙ্গীটি কাপুরুষ না হয়ে সাহসী হোক, হোক বীরপুরুষ! এই ধরনের চাহিদার প্রভাব এখনও সমাজে দৃশ্যমান। ডেট করতে যাওয়ার সময় কোনো নারীই চায় না তার সঙ্গী পুরুষটি উচ্চতায় তার চেয়ে খাটো হোক। সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে এ যেন এক অলিখিত নিয়ম, শুধু আমেরিকায় নয়, সব দেশেই! বাংলাদেশে বিয়ে করতে গেলে পাত্রের উচ্চতা বউয়ের উচ্চতার চেয়ে কম দেখা গেলেই আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে গাই-গুঁই শুরু হয়ে যায় মুহূর্তেই। খাটো স্বামীকে বিয়ে করতে হলে স্ত্রীরও মনোকষ্টের সীমা থাকে না। হাই হিল জুতো আর তার পরা হয়ে ওঠে না। আসলে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রভাব মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই এটি ঘটে। লম্বা চওড়া জামাই সবার আদরনীয়, কারণ একটা সময় লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান এই সব পূর্বপুরুষেরা রক্ষা করতে পেরেছিল স্বীয় গোত্রকে, রক্ষা করেছিল উত্তরপুরুষের জিনকে—অন্যদের তুলনায় অনেকে ভালোভাবে। সেই আদিম মানসপট আধুনিক মেয়েদের মনে রাজত্ব করে তাদের অজান্তেই!

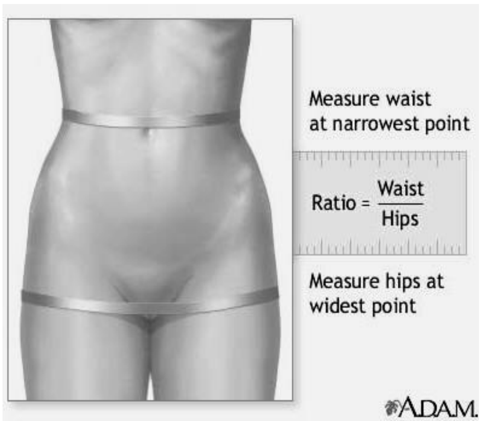
আবার পুরুষদের মানসজগতেও নারীদেহের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদগ্র আগ্রহ

দেখা যায় সম্ভবত বিবর্তনীয় তথা যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে মানসপট তৈরি হবার কারণেই। যে কোনো দেশের সাহিত্যের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে - নারীর পিনোন্নত স্তন, সুডৌল নিতম্ব আর ক্ষীণ কটিদেশ নিয়ে যুগের পর যুগ কাব্য করেছে পুরুষ—সকল সংস্কৃতিতেই। কারণ নারীদেহের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই সকল পুরুষের কাছে মহার্ঘ্য বস্তু। কিন্তু কেন? কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলেন, আদিম সমাজে পুরুষদের কাছে বৃহৎ স্তন এবং নিতম্বের মেয়েরা অধিকতর আদৃত ছিল প্রাকৃতিক কারণেই। বিপদসঙ্কুল জঙ্গুলে পরিবেশে মেয়েদের বাচ্চা কোলে নিয়ে পুরুষদের সাথে ঘুরতে হতো। এলাকায় খাদ্যস্বল্পতা দেখা দিলে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়ে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে হতো। অতি আধুনিক কালের কৃষিবিপ্লবের কথা বাদ দিলে মানুষকে আসলেই শতকরা নব্বই ভাগ সময় যুদ্ধ করতে হয়েছে খাদ্যস্বল্পতার বিরুদ্ধে। যে নারী দীর্ঘদিন খাদ্যস্বল্পতার প্রকোপ এড়িয়ে বুকের দুধ খাইয়ে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, তারা টিকে গেছে অনেক বেশি হারে। কাজেই কোনো নারীর বৃহৎ স্তন পুরুষদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে ভবিষ্যত-প্রজন্মের জন্য 'অফুরন্ত খ্যাদ্যের ভাণ্ডার' হিসেবে। এ এক অদ্ভুত বিভ্রম যেন। এই বিভ্রম দীর্ঘদিন ধরে পুরুষকে করে তুলেছে পৃথুল স্তনের প্রতি আকর্ষিত। তারা লালায়িত হয়েছে, লুব্ধ হয়েছে—এ ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নারীর সাথে সম্পর্ক করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে জৈবিক তাড়নায়। ঠিক একই ভাবে, বহিঃশত্রু যখন আক্রমণ করেছে তখন যে নারী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে বাঁচতে পেরেছে, তাদের জিন রক্ষা পেয়েছে অনেক সহজে। এই পরিস্থিতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নারীর কোমড় হয়েছে ক্ষীণ, আর নিতম্ব হয়েছে সুদৃঢ়। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষদের কাছে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আদরণীয়।

নারীর সুদৃঢ় নিতম্বের প্রতি পুরুষদের আগ্রহের অবশ্য আরও একটি বড় কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বিগত পাঁচ মিলিয়ন বছরে মানুষের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ফলে এটি বাচ্চার জন্মের সময় তৈরি করেছে জন্মসংক্রান্ত জটিলতার। এই কিছুদিন আগেও সারা পৃথিবীতেই বাচ্চা জন্ম দিতে

গিয়ে মারা যাওয়া মায়েদের সংখ্যা ছিল খুবই উদ্বেগজনকভাবে বেশি। আজকের দিনের সিসেক অপারেশন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এই জটিলতা থেকে নারীকে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আদিম সমাজে তো আর সি-সেকশন বলে কিছু ছিল না। ধারণা করা হয়, সভ্যতার উষালগ্নে ক্ষীণ নিতম্ববিশিষ্ট নারীদের মৃত্যু অনেক বেশি হয়েছে বড় মাথাওয়ালা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে। টিকে থাকতে পেরেছে সুডৌল এবং সুদৃঢ় নিতম্ব-বিশিষ্ট মেয়েরাই। কারণ তারা অধিক হারে জন্ম দিতে পেরেছে স্বাস্থ্যবান শিশুর। ফলে দীর্ঘদিনের এই নির্বাচনীয় চাপ তৈরি করেছে নারী দেহের সুদৃঢ় নিতম্বের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক উদগ্র কামনা!





চিত্র: অধ্যাপক দেবেন্দ্র সিংহ তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত মোটামুটি ০.৭ এর মধ্যে থাকলে তা তৈরি করে মেয়েদের 'classic hourglass figure', এবং এটি পুরুষদের মনে তৈরি করে আদি অকৃত্রিম যৌনবাসনা।

পুরুষের চোখে নারীর দেহগত সৌন্দর্যের ব্যাপারটাকে এতদিন পুরোপুরি 'সাংস্কৃতি'ব্যাপার বলে মনে করা হলেও আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক দেবেন্দ্র সিংহ তার গবেষণা থেকে দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারীর কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত ০.৬ থেকে ০.৮ মধ্যে থাকলে

সার্বজনীনভাবে আকর্ষণীয় বলে মনে করে পুরুষেরা। অধ্যাপক সিংহের মতে মোটামুটি কোমর : নিতম্ব = ০.৭—এই অনুপাতই তৈরি করে মেয়েদের 'classic hourglass figure', যা পুরুষদের মনে তৈরি করেছে আদি অকৃত্রিম যৌনবাসনা । সংস্কৃতি নির্বিশেষে এই উপাত্তের পেছনে সত্যতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়[77]। সম্প্রতি পোলিশ একটি গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সুডৌল স্তন, সরু কোমড় এবং হৃষ্ট নিতম্ব মেয়েদের সর্বচ্চ উর্বরতা প্রকাশ করে, যার পরিমাপ পাওয়া গেছে দুটো প্রধান যৌনোদ্দীপক হরমোনের (17-β-estradiol & progesterone) আধিক্য বিশ্লেষণ করে[78]। পুরুষের মনে প্রথিত হওয়া যৌনোদ্দীপক কোমর/নিতম্বের অনুপাত আসলে তারুণ্য, গর্ভধারণক্ষমতা (Fertility) এবং সাধারণভাবে সুসাস্থ্যের প্রতীক। কাজেই এটিও পুরুষের কাছে প্রতিভাত হয় এক ধরনের 'ফিটনেস মার্কার' হিসেবে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর জন্সটন তাঁর 'Why We Feel? The Science of Emotions' বইয়ে বলেন যে মেয়েদের কোমর ও নিতম্বের অনুপাত ০.৭ হলে এন্ড্রোজেন ও এস্ট্রোজেন হরমোনের যে অনুপাত গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে অনুকুল সেই অনুপাতকে প্রকাশ করে। এরকম আরেকটি নিদর্শক হলো সুডৌল ওষ্ঠ। সেজন্যই গড়পড়তা পুরুষেরা এঞ্জেলিনা জোলি কিংবা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের পুরুষ্টু ওষ্ঠ ছবিতে দেখে লালায়িত হয়ে ওঠে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যের উপলব্ধি কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। এর সাথে যৌন আকর্ষণ এবং সর্বোপরি গর্ভধারণক্ষমতার একটা গভীর সম্পর্ক আছে, আর আছে আমাদের দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথপরিক্রমার সুস্পষ্ট ছাপ।

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা

শচীন দেব বর্মনের গাওয়া আমার একটা খুব প্রিয় গান আছে। গানটির কথাগুলোর সাথে অবশ্য অনেকেই পরিচিত (এখানে একটি কথা বলে রাখি, গানটির গীতিকার

[77] Singh, D. (2002) Female Mate Value at a Glance: Relationship of Waist-to-Hip Ratio to Health, Fecundity, and Attractiveness. Neuroendocrinology Letters. Special Issue, 23, 81-91.

[78] Jasienska, G., Ziomkiewicz, A., Ellison, P.T., Lipson, S.F., Thune, I. (2004) "Large breasts and narrow waists indicate high reproductive potential in women." Proceedings of the Royal Society of London "B", 271: 1213-1217

কিন্তু হলেন মীরা দেব বর্মন; শচীন কর্তার স্ত্রী[79]!) -

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে
হৃদয়ে দিয়েছ দোলা
রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে
একি তব হোলি খেলা
তুমি যে ফাগুন রঙেরও আগুন
তুমি যে রসেরও ধারা
তোমার মাধুরী তোমার মদিরা
করে মোরে দিশাহারা
মুক্তা যেমন শুক্তিরও বুকে
তেমনি আমাতে তুমি
আমার পরানে প্রেমের বিন্দু
তুমিই শুধু তুমি ...

প্রেমের কথা বলতে গেলে গন্ধের কথা আলাদাভাবে বলতেই হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে গন্ধের অনুভূতিই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এমনকি এককোষী ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত কেবল 'গন্ধ শুঁকে' বুঝতে পারে কোন খাবারটা পুষ্টিকর আর কোনটা তাদের জন্য মরণবিষ। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু খাদ্যদ্রব্য শোকাই নয় যৌনতার পছন্দ অপছন্দের ক্ষেত্রে কিংবা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও গন্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইঁদুর, বিড়াল, কুকুরসহ অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীই বেঁচে থাকা কেবল নয়, যৌনসম্পর্কের ব্যাপারেও অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকে গায়ের গন্ধের উপর। আসলে যৌনতার নির্বাচনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয় শরীরের গন্ধকে। আমাদের প্রত্যেকের আঙুলের ছাপ যেমন আলাদা, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের শরীরের গন্ধও আলাদা, যা অবচেতন মনেই সঙ্গী নির্বাচনের

[79] মীরা দেব বর্মনকে কেবল শচীন দেব বর্মনের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত করাটা অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে ছাড়াও শোন গো দখিন হাওয়া, বিরহ বড় ভাল লাগে, সুবল রে বল বল, তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল সহ অনেক জনপ্রিয় গানেরই গীতিকার ছিলেন তিনি।

ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, গন্ধের এই তথ্যগুলো জীবদেহে লিপিবদ্ধ থাকে এক ধরনের জিনের মধ্যে, যার নাম— 'হিস্টোকম্পিট্যাবিলিটি কমপ্লেক্স জিন' বা সংক্ষেপে MHC gene[80]।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য জিনের পাশাপাশি গন্ধ পরিবহনের পিছনে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থেরও ভূমিকা খুঁজে পেয়েছেন সেটাকে ফেরোমোন (Pheromone) বলে তারা অভিহিত করেন। এই ফেরোমোন 'নার্ভ জিরো' নামে এক ধরনের করোটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়ে প্রাণিজগতে সঙ্গী নির্বাচন এবং প্রজননকে ত্বরান্বিত করে বলে ধারণা করা হয়[81]। দেখা গেছে গন্ধের উপর নির্ভর করে অনেক প্রাণীই লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ, সামাজিক পদমর্যাদা, অঞ্চল, প্রজননগত অবস্থানসহ অনেক কিছু নির্ণয় করতে পারে। যেমন, ১৯৫৯ সালে ইঁদুরের উপর হিল্ডা ব্রুসের একটি গবেষণা[82] থেকে পাওয়া গেছে যে, সঙ্গমের পর যদি কোনো ইঁদুর অপরচিত কোনো ইঁদুরের গন্ধের খোঁজ পায়, তাহলে তার জরায়ুতে ভ্রুণ প্রতিস্থাপিত না হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু পরিচিত বা পছন্দের সঙ্গীর গন্ধ গর্ভধারণে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তার মানে ফেরোমোনের সাহায্যে পছন্দের সঙ্গীর মাধ্যমে গর্ভধারণ নিশ্চিত করতে কিংবা বাতিল করতে পারে এ ধরনের ইঁদুরেরা।

২০০৬ সালে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী লিন্ডা বাক এবং তার সহযোগী সিয়াটলের একটি ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে গবেষণারত অবস্থায় নতুন গ্রাহক প্রোটিনের পরিবারের ১৫টি সদস্যকে সনাক্ত করতে সমর্থ হন। ইঁদুরের নাকে খুঁজে পাওয়া এই গ্রাহকগুলো ফেরোমোনকে সনাক্ত করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাণিজগতে ফেরোমোনের ভূমিকা খুব ভালোভাবে প্রমাণিত হলেও মানুষের মধ্যে

---

80 Meredith F. Small, Nosing Out A Mate, Scientific American, 1999

81 R. Douglas Fields, Sex and the Secret Nerve, Scientific American Mind, February 2007

82 H.M. Bruce An exteroceptive block to pregnancy in the mouse, Nature, 184:105, 1959

এর সরাসরি সম্পর্ক যে খুব জোরালো—সেটা কিন্তু এখনও বলা যাবে না[83]। আসলে অন্য প্রাণীরা তাদের বেঁচে থাকা এবং সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গন্ধের উপর খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হলেও বিবর্তনের ক্রমধারায় গন্ধের উপযোগিতা এবং গুরুত্ব মানব প্রজাতিতে কমে এসেছে। মানুষ তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণেন্দ্রিয় কিংবা বুদ্ধিমত্তার উপর যেভাবে নির্ভর করে, ঠিক তেমনভাবে গন্ধের উপর নয়। তারপরেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের ঘ্রাণজ আবরণীকলায় (olfactory epithelium) এখনও প্রায় ৩৪৭টি ভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল নিউরনের অস্তিত্ব আছে[84]। এই নিউরনগুলো ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ সনাক্ত করতে পারলেও আমাদের মাথায় বহুসময়েই গন্ধগুলো মিশ্রিত হয়ে উপস্থাপিত হয়, অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেটা আলাদাই থাকে। লিন্ডা বাক ইঁদুরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ফারমোনের গ্রাহক জিনে খুঁজে পেয়েছিলেন, তার অন্তত ছয়টি মানুষের মধ্যেও আছে।



চিত্র: বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মে কিংবা ছাত্রী-আবাসে একই কক্ষে একাধিক ছাত্রীরা বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থান করলে তাদের রজঃস্রাব একই সময়ে সমাপতিত হয়ে যায়। ফেরোমোন প্রবহের কারণেই এটি হয় বলে বেশ কিছু গবেষণায় আলামত পাওয়া গেছে।

[83] Warren S. T. Hays, Human pheromones: have they been demonstrated? Behavioral Ecology and Sociobiology, 54:89-97, 2003

[84] R. Douglas Fields, Sex and the Secret Nerve, Scientific American Mind, February 2007

অন্য প্রাণীদের মতো মানুষের জীবন যাত্রাতেও ফেরোমোনের প্রভাব থাকতে পারে—এ ব্যাপারটি বোঝা যেতে শুরু করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মার্থা ক্লিনটক এবং ক্যাথলিন স্টার্নের একটি গবেষণা থেকে। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মে কিংবা ছাত্রী-আবাসে একই কক্ষে একাধিক ছাত্রীরা অবস্থান করলে তাদের ঋতু বা রজঃস্রাব একই সময়ে সমাপতিত হয়ে যায়। এই রহস্যময় ব্যাপারটিকে বলে ঋতুচক্রের সমলয়ীকরণ (menstrual synchrony)। মার্থা ক্লিনটক তার ১৯৭১ সালের গবেষণাপত্রে দেখিয়েছিলেন যে এটার পেছনে মূল ভুমিকা পালন করে ফেরোমোন[85]।

১৯৯৮ সালে মার্থা ক্লিনটক তার আগের গবেষণাকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি তার এ পরীক্ষায় দেখান, যে ফেরোমোন শুধু ঋতুচক্রের সমলয়ীকরণই নয়, সেই সাথে মেয়েদের অনিয়মিত মাসিককে নিয়মিত করতেও ভূমিকা রাখে। সাধারণত দেহের লোমশ জায়গাগুলোকে (যেমন, বগলের তলা কিংবা যৌনাঙ্গের এলাকা প্রভৃতি) ফেরোমোনের উৎস বলে মনে করা হয়। মার্থা ক্লিনটক এই পরীক্ষায় কিছু স্বেচ্ছাসেবক পুরুষের বগল থেকে নেওয়া ঘামের ফেরোমোন নারীদের ঠোঁটে লাগিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা করে দেখেন, এর ফলে মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক নিয়মিত হয়ে যাচ্ছে[86]। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, অন্য প্রাণীদের মতো এত ব্যাপক আকারে না হলেও শরীরের গন্ধ মানব শরীরেরও রোগ প্রতিরোধতন্ত্র গঠনে বড় ভূমিকা রাখে, এবং এর পেছনে আছে বিবর্তনীয় কারণ। হেলেন ফিশার তাঁর *অ্যানাটমি অফ লাভ* বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন[87] —

> পুরুষের গায়ের গন্ধ (ঘাম) মেয়েদের ঋতুচক্রকে স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

---

85 MK McClintock, Menstrual synchrony and suppression. Nature 229 (5282): 244–5, 1971

86 K Stern, MK McClintock, "Regulation of ovulation by human pheromones". Nature 392 (6672): 177–9, 1998.

87 Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray, Ballantine Books , January 3, 1994; বাংলা অনুবাদ - অপার্থিব, ভালবাসা ও বিবর্তন, মুক্তমনা, ২৯ মাঘ ১৪১৬ (ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১০)

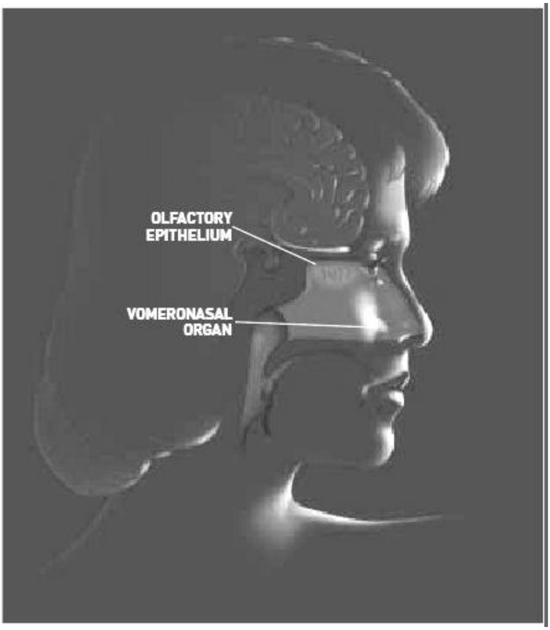
> সেজন্যই ছেলেদের ঘামের গন্ধের প্রতি মেয়েদের (অবচেতন) আকর্ষণ খুব সম্ভবত বিবর্তনজনিত। পুরুষদের সুগন্ধি ব্যবহার করার ও মেয়েদের তা পছন্দ করার কারণ হলো পণ্য উৎপাদনকারীর বিজ্ঞাপকদের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাই যার দরুন ঘাম হওয়াকে অপরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়।

অর্থাৎ, এ ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে যে, ঘামের পচা গন্ধ যে আমরা অপছন্দ করি সেটা এবং ফেরোমোনের গন্ধ কিন্তু এক নয়। ঘামের দুর্গন্ধ তৈরি হয় ঘামের ব্যাক্টেরিয়া পচনের ফলে, যা আবহাওয়ায় ছড়ায় কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু অন্যদিকে ফেরোমোনের গন্ধ মূলত দেহজাত যা খুবই সূক্ষ্ম এবং সেটা সচেতনভাবে পাওয়া যায় না। আমরা যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি না কেন, সেটা সবসময়ই দেহ থেকে বের হতে থাকে বলে মনে করা হয়। ছেলেরা যখন এগারো বারো বছর বয়সের দিকে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন তাদের দেহ হয়ে উঠে নানা ধরনের নতুন ধরনের গন্ধের আড়ত, যা তার আগেকার শিশু বয়সের গন্ধ থেকে একেবারেই আলাদা। স্নায়ুবিজ্ঞানী লোয়ান ব্রিজেন্ডিন তার সাম্প্রতিক 'মেইল ব্রেন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই নতুন গন্ধটি টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে পুরুষের দেহজ ঘামগ্রন্থি থেকে নির্গত ফেরোমোন এবং এন্ড্রোস্টেনেডিওনের একধরনের সুষম মিশ্রণ[88]। আর ছেলেদের এই গন্ধটা মেয়েরা পায় প্রবৃত্তিগতভাবে, ঘ্রাণজ আবরণীকলার মাধ্যমে নয়, বরং এর বাইরে আরেকটি পৃথক অঙ্গের মাধ্যমে যাকে বলা হয় ভোমেরোনাসা তন্ত্র (Vomeronasal Organ) বা সংক্ষেপে VNO[89]।

---

[88] Louann Brizendine M.D., The Male Brain, Broadway; March 23, 2010

[89] Vomeronasal Organ – An organ thought to supplement the olfactory system in receiving pheromonic communication. The sensory part of the organ is in two long, thin sacs, situated on either side of the nasal septum at its base.



চিত্র: বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভোমেরোনাসা তন্ত্র নামক পৃথক একটি তন্ত্র ফেরোমোন সনাক্ত এবং প্রবাহে ভূমিকা রাখে।

গন্ধ যে মানুষের মনের মেজাজ মর্জি পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে তা কিন্তু আমরা প্রাত্যহিক জীবনের নানা উদাহরণ থেকে খুব সাধারণভাবেই জানি। পুজা-অর্চনার সময় ধূপধুনা জ্বালানো, কিংবা মিলাদ মাহফিলে আগর বাতি জ্বালানো হয় গন্ধের মাধ্যমে চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করে মানসিক ভাবগাম্ভীর্যতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই। গোলাপের গন্ধে মন প্রফুল্ল হওয়া, লেবুর গন্ধে সতেজ থাকা, ফিনাইল এলকোহলের গন্ধে রক্তচাপ কমার কিংবা ইউক্যালিপ্টাস পাতার ঘ্রাণে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হবার কিছু প্রমাণ বিজ্ঞানীরাও পেয়েছেন। আর বিভিন্ন সৌগন্ধিক কোম্পানিগুলো টিকেই আছে পারফিউমের সুবেশী গন্ধকে প্রফুল্লতায় নিয়ে যাওয়ার নানা রকম চেষ্টার উপকরণের উপরেই। কিন্তু এসবের বাইরেও বিজ্ঞানীরা গন্ধের আরও একটি বড় ভূমিকা খুঁজে পেয়েছেন। আমরা যে ‘হিস্টোকম্পিট্যাবিলিটি কমপ্লেক্স জিন’ বা MHC জিনের কথা আগে জেনেছি, দেখা গেছে অনেক প্রাণী গন্ধের মাধ্যমে MHC জিন সনাক্ত করতে পারে। এভাবে তারা গন্ধ শুঁকে নিজেদের পরিবারে কিংবা নিকটাত্মীয়দের সাথে সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এই বিরত থাকার

ব্যাপারটা কিন্তু বিবর্তনীয় পথেই সৃষ্ট হয়েছে। মানবসমাজেও খুব কাছের পরিবার পরিজনদের (বাবা, মা ভাই বোন কিংবা নিকটাত্মীয়) মধ্যে যৌনসঙ্গমকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়, সামাজিকভাবেই একে 'ব্যাভিচার' হিসেবে গণ্য করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, খুব কাছের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মায় দেখা গেছে তার বংশাণু বৈচিত্র্য হ্রাস পায়, ফলে সে ধরনের সন্তানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়। শুধু তাই নয় জীববিজ্ঞানীরা গবেষণা থেকে দেখেছেন যে, বাবা কিংবা মায়ের পরিবারে যদি কোনো জিনবাহিত রোগ থাকে, তবে শতকরা ২৫ ভাগের মতো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্ভাবনা থেকে যায় ক্রুটিপূর্ণ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সন্তান জন্মানোর। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'কনজেনিটাল বার্থ ডিফেক্ট' (congenital birth defects) বা জন্মগত সমস্যা। নিঃসন্দেহে আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যাপারটি অনুধাবন করেছিলেন যে কাছাকাছি পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত মানুষজনের মধ্যে যৌনসম্পর্ক হলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিচ্ছে এবং সে সমস্ত শিশুর মৃত্যু হার বেশি। সামাজিকভাবেই এটিকে প্রতিহত করার প্রবণতা দেখা দেয়। সেজন্যই বিবর্তনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমাদের প্রবৃত্তিগুলো এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের পরিবারের সদস্যদের দেখে যৌন আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয় না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন অন্য প্রাণীদের মতো মানুষও অবচেতনভাবেই গন্ধের সাহায্যে ব্যাপারটির ফয়সলা করে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে জীববিজ্ঞানী ক্লাউস ওয়েডেকাইণ্ডের একটি গবেষণায়[90]।

সেই পরীক্ষায় সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লাউস ওয়্যাইন্ড ১০০ জন কলেজ ছাত্রকে আলাদা করে তাদের সুতির জামা পরিয়ে রেখেছিলেন দুই দিন ধরে। সেই দুই দিন তারা কোনো ঝাল-ঝোলওয়ালা খাবার খায়নি, ধূমপান করেনি, কোনো ডিওডারেন্ট ব্যবহার করেনি, এমনি কোনো সুগন্ধি সাবানও নয়, যাতে করে নমুনাক্ষেত্র প্রভাবান্বিত হবার ঝামেলা-টামেলাগুলো এড়ানো যায়। তারপর যেটা করা

[90] C Wedekind; T. Seebeck, F. Bettens, and A. J. Paepke, "MHC-dependent mate preferences in humans". Proc Biol Sci 260 (1359): 245–249, 1995

হলো তা বেশ মজার। তাদের সবগুলো জামা একত্রিত করে একটি বাক্সে ভরে আরেকদল অপরিচিত ছাত্রীদের দিয়ে শোঁকানো হলো। মেয়েদেরকে গন্ধ শুঁকে বলতে বলা হলো কোনো টি-শার্টের গন্ধকে তারা 'সেক্সি' বলে মনে করে। দেখা গেল মেয়েরা সেসমস্ত টি-শার্টের গন্ধকেই পছন্দ করছে কিংবা যৌনোদ্দীপক বলে রায় দিচ্ছে যে সমস্ত টি-শার্টের অধিকারীদের দেহজ MHC জিন নিজেদের থেকে অনেকটাই আলাদা। আর যাদের MHC জিন নিজের জিনের কাছাকাছি বলে প্রতীয়মান হয়, তাকে মেয়েরা অনেকটা নিজের ভাইয়ের মতো মনে করে[91]!

১৯৯৭ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বংশগতিবিদ ক্যারোল ওবারের এ ধরনের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে একই MHC জিন বিশিষ্ট বাহকেরা সাধারণত একে অপরের সাথে যৌন সম্পর্কে অনিচ্ছুক হয়[92]। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই পৃথিবীতে দম্পতিদের বন্ধ্যাত্ব এবং গর্ভপাত সমস্যার একটি বড় কারণ আসলে লুকিয়ে আছে দম্পতিদের MHC জিনের সমরূপতার মধ্যে। ডাক্তাররা ১৯৮০ সালের পর থেকেই কিন্তু এ ব্যাপারটা মোটামুটি জানেন। তারা দেখেছেন অনেক নারী দৈহিক এবং মানসিকভাবে কোনো ধরনের সমস্যার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও সন্তান হচ্ছে না কেবল দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার MHC জিন তার স্বামীর জিনের কাছাকাছি হওয়ায়। অনেক সময় যদিওবা সন্তান হয়ও তা থাকে পর্যাপ্ত ওজনের অনেক নীচে। আর এ ধরনের একই MHC জিন বিশিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের হারও থাকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি[93]। 'হিউম্যান লিউকোসাইট এন্টিজেন' (সংক্ষেপে HLA) নামে আমাদের ডিএনএ-এর একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ আছে যা দেহের রোগ প্রতিরোধের সাথে জড়িত। জুরিখের বংশগতি বিশেষজ্ঞ তামারা ব্রাউনের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে এই HLAর বৈচিত্র্যই 'সঠিক ভালোবাসার মানুষ'

---

[91] ইউটিউবে এ নিয়ে চমৎকার একটি ভিডিও রাখা আছে, লিঙ্ক - http://www.youtube.com/watch?v=pEmX8Rim-hs&feature=related

[92] Nicholas Wade, Scent of a Man Is Linked To a Woman's Selection, NY Times, 2002.

[93] F. Bryant Furlow, The Smell of Love, Psychology Today, published on March 01, 1996 - last reviewed on August 13, 2010

নির্বাচনে বড় সড় ভুমিকা রাখে। সাধারণভাবে বললে বলা যায়, আপনার হবু সঙ্গীর HLAর বিন্যাস আপনার থেকে যত বেশি বৈচিত্র্যময় হবে, তত বেশি বাড়বে তার প্রতি আপনার আকর্ষণের মাত্রা এবং সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা[94]। এই ধরনের জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সঙ্গী খঁজে পাওয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য জিনপার্টনার ডট কম (genepartner.com)-এর মতো সাইটগুলো ইতোমধ্যেই বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। এর মাধ্যে এর মক্কেলরা নাকি তাদের থুতু পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারবেন, তার ভবিষ্যত সঙ্গীর HLAর বিন্যাস বৈচিত্র্য তাকে কতটুকু আকর্ষিত কিংবা বিকর্ষিত করতে পারে, আর এতে খরচ পড়বে পরীক্ষা প্রতি ৯৯ ডলার! কে জানে হয়তো তৃতীয় বিশ্বের মতো দেশগুলোতে বহুদিন ধরে চলে আসা 'এরেঞ্জড ম্যারেজ'-এর জেনেটিক রূপ দেখা যাবে ভবিষ্যতের 'উন্নত পৃথিবীতে'। MHC জিন কিংবা HLAর বিন্যাস দেখে গুনে শুনে দল বেধে সঙ্গী নির্বাচন করছে প্রেমিক-প্রেমিকেরা কিংবা বিবাহ ইচ্ছুকেরা[95]!

তবে পাঠকদের নিশ্চয় বুঝতে দেরি হবার কথা নয় যে, কেবল 'জেনেটিক ম্যাচ' বা বংশগতীয় জুড়ির উপর নির্ভর করে সঙ্গী নির্বাচনের চেষ্টা খুব বেশি সফল হওয়ার কথা নয়, কারণ মানব সম্পর্ক এমনিতেই অন্য প্রাণীর চেয়ে অনেক জটিল। মানুষের সম্পর্কের স্থায়িত্ব জিনের বাইরেও অনেক বেশি নির্ভরশীল পরিবেশ এবং সম্পর্কের সামাজিকীরনের উপর। সেজন্যই দেখা যায় অনেক সময় বংশগতীয় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল না আশা সত্ত্বেও অনেকের ক্ষেত্রেই সম্পর্ক তৈরি এবং বিকাশে সমস্যা হয়নি, কেবল সামাজিক উপাদানগুলোর কারণেই। তারপরেও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন বংশগতীয় ব্যাপারটা মিলে গেলে সম্পর্ক তৈরিতে সেটা অনুকূল প্রভাব আনতে পারে ভবিষ্যত পৃথিবীতে সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে। ক্লাউস ওয়্যাইন্ড, ক্যারোল

---

[94] Elizabeth Heathcote, Tamara Brown: Don't sniff at smelling a potential lover, The Observer, Sunday 11 July 2010, Republished in Guardian, Online link : http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jul/11/my-bright-idea-tamara-brown

[95] ইউটিউব থেকে একটি ভিডিও- http://www.youtube.com/watch?v=YRJU-hG5xds&feature=player_embedded

ওবার, তামারা ব্রাউন সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, আমাদের ডিএনএতে প্রকাশিত এই ভালোবাসার সংকেতগুলো শেষ পর্যন্ত ফেরোমোন প্রবাহের মাধ্যমেই আমাদের মস্তিকে পৌঁছায়, যার ভিত্তি মূলত লুকিয়ে আছে সঙ্গীর গায়ের গন্ধের মধ্যেই। সেজন্যই বিলিয়ন ডলারের ম্যাচ-মেকিং সাইটগুলো এখন ভালোবাসার রসায়ন বুঝতে ডিএনএ বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি গায়ের গন্ধ নিয়েও আগ্রহী হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে শুরু করেছি যে, আর সব প্রাণীর মতো মানুষও অবচেতন মনেই গন্ধ শোঁকার মাধ্যমে সঙ্গী বাছাইয়ের কাজটি করে থাকে। কথিত আছে, ১৫ শতকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় হেনরীর শাসনামলে সম্রাটের আমন্ত্রণে মারিয়া নামে এক নর্তকী রাজপ্রাসাদে নাচতে এসেছিল। শোনা যায়, নাচ শেষ হবার পর ঘর্মাক্ত শরীর একটি তোয়ালে দিয়ে মুছে মারিয়া সম্রাটের দিকে ছুড়ে দেয়। সম্রাট সেই তোয়ালে পেয়ে 'ভালোবাসার গন্ধে' এমনই বিমোহিত হন, যে মারিয়াকে আর প্রাসাদ থেকে যেতে দেননি, তাকে সম্রাজ্ঞী হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, আমাদের মতো অধিকাংশ ছা-পোষা মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের গন্ধকেন্দ্রিক পছন্দগুলো সম্রাট হেনরীর এত প্রকটভাবে দৃশ্যমান নয়। আর আগেই বলেছি, গন্ধের মাধ্যমে পছন্দের এই ব্যাপারটি আসলে সচেতন ভাবে নয়, বরং প্রবৃত্তিগতভাবেই ঘটে, এবং এটি উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তনেরই ক্রমিক ধারায়।

চুমুর বিজ্ঞান



প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে ।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-'পরে ।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে ।

দেহমিলন নামে চতুষ্পদী কবিতার শুরুতে কবিগুরু উপরের যে চরণগুলো লিখেছেন, তা যেন প্রেম ভালোবাসার একেবারে মোদ্দা কথা—'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে'! সত্যই তো। চুমুবিহীন প্রেম—যেন অনেকটা লবনহীন খিঁচুড়ির মতোই বিস্বাদ!

তাই ভালোবাসার কথা বললে অবধারিতভাবেই চুমুর কথা এসে পড়বে।

ভালোবাসা প্রকাশের আদি এবং অকৃত্রিম মাধ্যমটির নাম যে চুম্বন—সেই বিষয়ে সম্ভবত কেউই দ্বিমত করবেন না। কাজেই কেন কবিগুরুর কথামতো আমাদের অধর মরিতে চায় অন্যের অধরে—তার পেছনের বিজ্ঞানটি না জানলে আমাদের আর চলছে না।

বাঙালি, আফগানি, জাপানিজ, মালয় থেকে শুরু করে পশ্চিমা সংস্কৃতি—সব জায়গাতেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চুম্বন পাওয়া যাবে। সংস্কৃতিভেদে চুম্বনের তারতম্য আর ভেদাভেদ আছে ঠিকই—কোথাও প্রেমিক প্রেমিকাকে কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে চুমু খায় গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যে, কারো চুম্বন শীতল, কারোটা বা উদগ্র, কেউ ঘার কাৎ করে চুমু খায় কেউ বা খায় মাথা সোজা রেখে। কিন্তু চুম্বন আছেই—মানবসভ্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে[96]। তাই চুম্বনের বিবর্তনীয় উৎসটি আমাদের জানা চাই।

আর শুধু মানুষই নয়, অনেকে জেনে হয়তো অবাক হবেন, চুমুর অস্তিত্ব রয়েছে এমনকি অন্যান্য অনেক প্রাণীর মধ্যেই[97]। ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল, পাখি থেকে শুরু করে শিম্পাঞ্জি, বনোবো সহ বহু প্রাণীর মধ্যেই চুম্বনের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এ সমস্ত প্রাণীদের কেউ বা চুমু খায় খাদ্য বিনিময় থেকে শুরু করে আদর সোহাগ বিনিময় এমনকি ঝগড়া-ফ্যাসাদ মেটাতেও। বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ফ্র্যান্স ডি ওয়াল তার প্রাইমেট সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় দেখিয়েছেন চুম্বনের ব্যাপারটা মানবসমাজেরই কেবল একচেটিয়া নয়, আমাদের অন্য সকল জ্ঞাতিভাই প্রাইমেটদের মধ্যেও তা প্রবলভাবেই দৃশ্যমান।

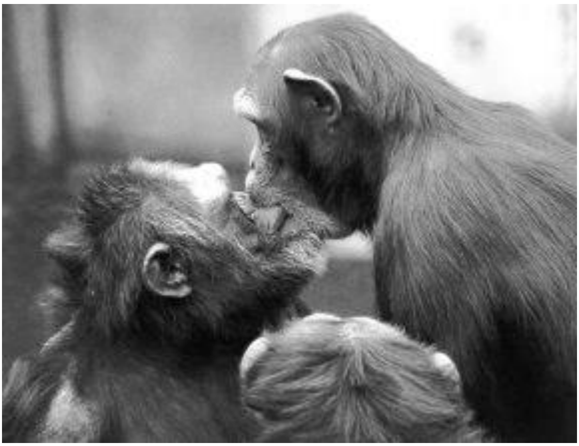
---

[96] অবশ্য চুম্বন ব্যপারাটি সংস্কৃতি নির্বিশেষে সার্বজনীন (কালচারাল ইউনিভার্সাল) কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিছু গবেষক দেখেছেন যে মানব সমাজের সব জায়গায় চুম্বনের প্রচলন নেই। ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার নাইরোপ তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন ফিনিশ একটি গোত্রে একসাথে নগ্ন হয়ে স্নান করার প্রচলন আছে, কিন্তু চুম্বনের নেই। অনেক জায়গায় চুম্বনকে ঘৃনিত প্রথা বলেও মনে করা হয়। কিন্তু এই স্বল্প কয়েকটি সংস্কৃতি বাদ দিলে মানব সমাজের মোটামুটি সবাই চুম্বন ব্যাপারটার সাথে পরিচিত।

[97] "How animals kiss and make up". BBC News. October 13, 2003.



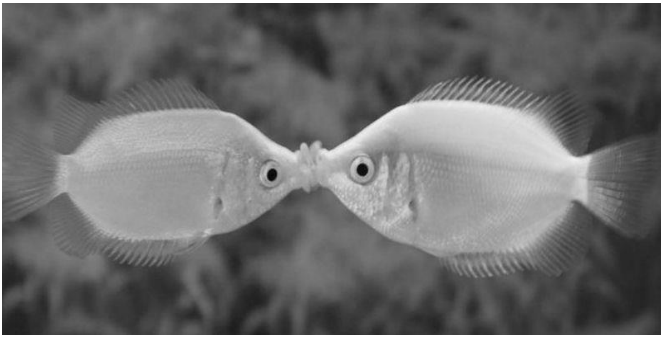
চিত্র: চুম্বনের ব্যাপারটা মানবসমাজেরই কেবল একচেটিয়া নয়, প্রাইমেট এবং নন প্রাইমেট অনেক প্রাণীর মধ্যেই চুম্বনের অস্তিত্ব দেখা যায়। ছবিতে প্রেইরি কুকুর নামে খ্যাত একধরনের ইঁদুরের মধ্যকার চুম্বন।



চিত্র: দুটি শিম্পাঞ্জির মধ্যকার চুম্বন দেখানো হয়েছে।

কেউ কি কবুতরের চুমু খাওয়া দেখেছেন? ওরা ঘরের চালে একেবারে উপরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট আংটার মতো করে আটকিয়ে দেয়। তারপরে বিশেষ ছন্দে উঠা নামা করে মিনিট খানেক। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে একে বলে “নালি ভাঙ্গা। তারা বলে,

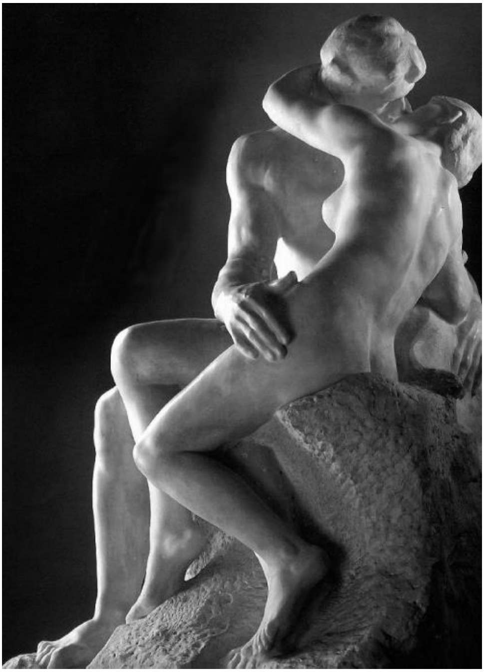
কবুতর “নালি ভাঙছে। বাচ্চা হবে”[98]। কিসিং গোরামি (kissing gourami) নামে এক ধরনের মাছ আছে, যাদের মধ্যেও চুম্বন ব্যাপারটা বেশ প্রচলিত। যারা অ্যাকুরিয়ামে গোরামি মাছ পালেন, তারা প্রায়শই এদের চুম্বনলীলা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন ।



চিত্র: যারা অ্যাকুরিয়ামে গোরামি মাছ পালেন, তারা প্রায়শই এধরনের চুম্বনলীলা দেখতে পান। এই আচরণের জন্য এধরনের মাছদের ‘কিসিং গোরামি’ নামে ডাকা হয়।

তবে কিসিং গোরামিদের চুম্বন আসলে ‘সত্যিকার’ চুম্বন নয়। এদের চুম্বন আসলে এক ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্বরূপ, যার মাধ্যমে তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে; আর সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটা চুম্বন হিসেবে প্রতিভাত হয়। কুকুর, বিড়াল এবং পাখিদের মধ্যে মুখ দিয়ে অবলেহন (licking) এবং পরিচ্ছন্নতা (grooming) নির্দেশক অনেক কিছু করতে দেখা যায়, যা অনেক সময়ই অনেকের কাছে ভুলভাবে চুম্বন বলে মনে হতে পারে। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে মানুষের মধ্যে চুম্বনের ক্ষেত্র অনেকটাই ভিন্ন।

[98] মুক্তমনায় আমার ‘সখি, ভালবাসা কারে কয়, তৃতীয় পর্বে (চুম্বনের বিজ্ঞান) ড. নৃপেন সরকারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য।



চিত্র: ফরাসি স্থপতি অগুস্ত রদ্যাঁর (Auguste Rodin) একটি বিখ্যাত স্থাপত্যকর্ম - The Kiss। আমি আর বন্যা প্রথমবার ২০০২ সালে প্যারিসে গিয়ে রদ্যাঁর এই অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্যকর্মটি দেখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ!

তাহলে মানবসমাজে চুম্বনের শুরুটা কোথায়, আর কীভাবে? বলা আসলেই মুশকিল। তবে, ১৯৬০ সালে ইংরেজ প্রাণিবিজ্ঞানী ডেসমণ্ড মরিস প্রথম প্রস্তাব করেন যে, চুম্বন সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রাইমেট মায়েদের খাবার চিবানো আর সেই খাবার অপরিণত সন্তানকে খাওয়ানোর মাধ্যমে। শিম্পাঞ্জি মায়েরা এখনও এভাবে সন্তানদের খাওয়ায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ব্যাপারটা ঠিক এভাবেই এবং এ কারণেই তৈরি হয়েছিল। মনে করা হয় খাদ্যস্বল্পতার সময়গুলোতে যখন সন্তানকে খাবার যোগাতে পারত না, তখন অসহায় সন্তানকে প্রবোধ দিতে এভাবে মুখ দিয়ে খাবার খাওয়ানোর ভান করে সান্ত্বনা দিত স্নেহবৎসল মায়েরা। এভাবেই একটা সময় চুম্বন মানব বিবর্তনের একটি অংশ হয়ে উঠে, এর পরিধি বৃদ্ধি পায় সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকে প্রেমিক প্রেমিকার রোমান্টিকতায়, যার বহুবিধ অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি মানবসমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আনাচে-কানাচে, নানাভাবে।

তবে আজকের দিনের চিরচেনা তীব্র রোমান্টিক প্রেমের সাথে চুম্বনের জৈববৈজ্ঞানিক তথা বিবর্তনীয় উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের বের করতে হবে চুমু খাওয়ার এই মাধ্যমটি সম্পর্ক তৈরি এবং টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কোনো ধরনের বাড়তি উপযোগিতা কখনো দিয়েছিল কি না, এবং এখনও দেয় কি না। এ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন। যেমন, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী গর্ডন জি গ্যালোপের (Gordon G. Gallup) গবেষণা থেকে জানা গেছে, চুম্বন মানবসমাজে মেটিং সিলেকশন বা যৌনসঙ্গী নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[99]। বিশেষ করে ‘প্রথম চুম্বন’ ব্যাপারটা রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ হিসেবে অনেকের জীবনেই উঠে আসে বলে মনে করা হয়। সাধারণত প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম যৌনসঙ্গমের মতো প্রথম চুম্বনের ঘটনাও প্রায় সবাই হাজারো ঘটনার ভিড়ে মনের স্মৃতিকোঠায় সযত্নে জমিয়ে রাখে স্থায়ীভাবে। মহাকবি কায়কোবাদের একটা চমৎকার কবিতা আছে প্রথম চুম্বন নিয়ে—

> মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন!
> যবে তুমি মুক্ত কেশে
> ফুলরানি বেশে এসে,
> করেছিলে মোরে প্রিয় স্নেহ-আলিঙ্গন!
> মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন?
>
> প্রথম চুম্বন!
> মানব জীবনে আহা শান্তি-প্রস্রবণ!
> কত প্রেম কত আশা,
> কত স্নেহ ভালোবাসা,
> বিরাজে তাহায়, সে যে অপার্থিব ধন!
> মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন!

---

99 Susan M. Hughes, Marissa A. Harrison and Gordon G. Gallup, Sex Differences in Romantic Kissing Among College Students: An Evolutionary Perspective, Evolutionary Psychology, 2007. 5(3): 612-631

হায় সে চুম্বনে
কত সুখ দুঃখে কত অশ্রু বরিষণ!
কত হাসি, কত ব্যথা,
আকুলতা, ব্যাকুলতা,
প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ!
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন!

সে চুম্বন, আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ,
অতৃপ্ত হৃদয় মূলে
ভীষণ ঝটিকা তুলে,
উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ,
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন!

তবে কায়কোবাদ প্রথম প্রেমের মাহাত্ম্য নিয়ে যতই কাব্য করুক না কেন, প্রকৃত বাস্তবতা একটু অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাড ছাত্রদের উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে গবেষকেরা দেখেন, অন্তত ৫৯ ভাগ ছাত্র এবং প্রায় ৬৬ ভাগ ছাত্রীরা স্বীকার করেছে যে তাদের জীবনে 'প্রথম চুম্বন'-এর পর পরেই সঙ্গীর প্রতি আগ্রহ রাতারাতি উবে গেছে। এমন নয় যে সেই সব খারাপ চুমু আসলেই খুব খারাপ ছিল। কিন্তু প্রথমবার চুম্বনের পরেই তাদের সবারই মনে হয়েছিল কোথায় যেন মিলছে না—সামথিং ইজ নট রাইট! গর্ডন জি গ্যালোপের অভিমত এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য[100] —

> While many forces lead two people contact romantically, the kiss, particularly the first kiss, can be a deal breaker.

কিন্তু কেন এমন হয়? সেটাই ব্যাখ্যা করছেন বিজ্ঞানীরা। আমরা যে আগের অংশে

[100] University at Albany (2007, August 31). A Kiss Is Still A Kiss -- Or Is It?. ScienceDaily, Retrieved April 2, 2011, from http://www.sciencedaily.com- /releases/2007/08/070830121629.htm

ফেরোমোন এবং MHC জিনের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, দেহজ গন্ধের মাধ্যমে সেখানকার ভালোবাসার সংকেতগুলো পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। ঠিক এমনটাই ঘটে চুম্বনের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ চুমুর মাধ্যমে সঙ্গীর বংশগতীয় কম্প্যাটিবিলিটির খোঁজ পায় মানব মস্তিষ্ক। অর্থাৎ সোজা বাংলায়, সঠিক চুমু মানসিকভাবে সঠিক যৌনসঙ্গীকে খুঁজে নিতে সহায়তা করে । চুম্বনের পর যদি কায়কোবাদের মতো সেই 'আহা শান্তি-প্রস্রবণ' কিংবা 'ভীষণ ঝটিকা তুলে, উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ' আসে আপনার কাছে তাহলে বুঝতে হবে, আপনার মস্তিষ্ক ইঙ্গিত করছে আপনার সঙ্গী বংশগতীয় ভাবে আপনার জন্য সঠিক। আপনার জৈবিক দেহ আপনার সঙ্গীর দ্বারা নিরুপদ্রুপভাবে গর্ভধারণ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে! আর যদি চুম্বনের পর মনে হয় 'কোথায় যেন মিলছে না' তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনার সঙ্গীর MHC জিনের বিন্যাস আপনার জন্য কম্পিটেবল নয়।

তবে চুম্বনের রসায়নে নারী পুরুষে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক গ্যালোপ এবং তার সহকর্মীরা ১০৪১ জন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীর উপর গবেষণা চালান। তাদের গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে, তীব্র চুম্বন পুরুষদের জন্য আবির্ভূত হয় যৌনসম্পর্ক সূচিত করার পরবর্তী ধাপ হিসেবে। কিন্তু অন্য দিকে মেয়েরা চুম্বনকে গ্রহণ করে সম্পর্কের মানসিক উন্নয়নের একটি সুস্থিত পর্যায় হিসেবে[101]।

গ্যালপের গবেষণায় আরও দেখা গেছে চুম্বনের ব্যাপারটা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। মেয়েদের কাছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়, অধিকাংশ মেয়েরা চুম্বন ছাড়া এমনকি সঙ্গীর সাথে যৌনসম্ভোগে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এতখানি প্রকট নয়। ছেলেদের কাছে একটা সময় পর চুমু খাওয়া না খাওয়া তেমন বড় হয়ে উঠে না— চুমুটুমু না খেয়ে

---

[101] Chip Walter, Affairs of the Lips: Why We Kiss, Scientific American Mind, February 2008

হলেও কোনো ‘আকর্ষণীয়’ মেয়ের সাথে যৌনসম্ভোগ করতে পারলে—ছেলেদের জন্য তাতেই সই! সমীক্ষায় দেখা গেছে কেউ ‘গুড কিসার’ না হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের চেয়ে অধিক সংখ্যক ছেলেরা তার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়।

মেয়েদের জন্য চুম্বন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠার পেছনে কিছু বিবর্তনীয় কারণ রয়েছে বলে মনে করা হয়। বিবর্তনের পথিকৃত চার্লস ডারউইন যৌনতার নির্বাচন তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খেয়াল করেছিলেন যে, প্রকৃতিতে প্রায় সর্বত্রই মেয়েরা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে খুব বেশি হিসেবি, সাবধানী আর খুঁতখুঁতে হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানে পরিচিত ‘নারী অভিরুচি’ (female choice) হিসেবে। ডারউইনের সময়ে ডারউইন ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করলেও এই নারী অভিরুচির পেছনের কারণ সম্পর্কে তিনি কিংবা তার সমসাময়িক কেউ ভালোভাবে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালের জীববিজ্ঞানী এবং বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এর পেছনের কারণটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে শুরু করে। বিশেষত বিখ্যাত সামাজিক জীববিজ্ঞানী রবার্ট ট্রাইভার্সের ১৯৭২ সালের গবেষণা এ ব্যাপারে একটি মাইলফলক[102]। ট্রাইভার্স তার গবেষণায় দেখান যে, প্রকৃতিতে (বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে) সন্তানের জন্ম এবং লালন পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি শক্তি বিনিয়োগ করে। গর্ভধারণ, সন্তানের জন্ম দেয়া, স্তন্যপান করানো সহ বহু কিছুতে মেয়েদেরকেই সার্বিকভাবে জড়িত হতে হয় বলে মেয়েদের তুলনামূলকভাবে অধিকতর বেশি শক্তি খরচ করতে হয়। ভবিষ্যৎ জিন বা পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষায় মেয়েদের এই অতিরিক্ত বেশি শক্তি খরচের ব্যাপারটা স্তন্যপায়ী সকল জীবদের জন্যই কমবেশি প্রযোজ্য। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে ‘অভিভাবকীয় বিনিয়োগ’ (parental investment)। মানুষও একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবার পরেও নির্দ্বিধায় বলা যায়

[102] R.L. Trivers, Parental investment and sexual selection, In B. Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man: 1871–1971 (pp. 136–179). Chicago: Aldine, 1972

মেয়েরাই অভিভাবকীয় বিনিয়োগের সিংহভাগে জড়িত থাকে। যেহেতু পুরুষদের তুলনায় নারীদের অভিভাবকীয় বিনিয়োগের সিংহভাগে জড়িত থাকতে হয়, তারা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে হয়ে উঠে অধিকতর হিসেবি এবং সাবধানী। বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায় মেয়েরা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকতর সাবধানী হতে বাধ্য হয়েছে, কারণ অসতর্কভাবে দুষ্ট-সঙ্গী নির্বাচন করলে অযাচিত গর্ভধারণ সংক্রান্ত ঝুট-ঝামেলা পোহাতে হয় নারীকেই। ডেভিড বাস তার 'Human Mating Strategies' শীর্ষক গবেষণাপত্রে সেজন্যই লিখেছেন[103] —

> বিবর্তনীয় যাত্রাপথে যে সকল মেয়েরা হিসেবি কিংবা সাবধানী ছিল না, তারা খুব কমই প্রজননগত সফলতা (reproductive success) অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু যারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শয্যাসঙ্গী নির্বাচন করতে পেরেছে, যেমন—যৌনসঙ্গী নির্বাচনের সময় গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেছে তার সঙ্গী সঙ্গমের পরই পালিয়ে না গিয়ে তার সাথেই থাকবে কিনা, বাবা হিসেবে তার ভবিষ্যৎ সন্তানের দেখভাল করবে কিনা, সন্তান এবং পরিবারের পরিচর্যায় বাড়তি বিনিয়োগ করবে কি না ইত্যাদি—সে সমস্ত সতর্ক মেয়েরাই সফলভাবে প্রজননগত উপযোগিতা উপভোগ করতে পেরেছে। কাজেই ট্রাইভার্সের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবজগতে প্রজাতির প্রজননগত সাফল্য এবং সফলভাবে প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার মূলে রয়েছে সেই প্রজাতির নারীদের সতর্ক সঙ্গী নির্বাচনী অভিরুচি (careful mate choice)'।

কাজেই যৌনসঙ্গীর ব্যাপারে নারীদের সতর্ক থাকতে হয়, কারণ ভুল সঙ্গীকে নির্বাচনের মাশুল হতে পারে ভয়াবহ। অন্তত একজন নারীর জন্য চুম্বন হয়ে উঠে সঙ্গী বাছাইয়ের একটি অবচেতন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সে নির্ণয় করতে চেষ্টা করে তার সঙ্গী তার ভবিষ্যৎ সন্তানের অভিভাবকীয় বিনিয়োগে অবদান রাখবে কি না কিংবা তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ (committed) কি না ইত্যাদি[104]।

---

[103] David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.

[104] Chip Walter, Affairs of the Lips: Why We Kiss, Scientific American Mind, February 2008

আর আগেই বলা হয়েছে, চুমুর মাধ্যমে MHC জিনের মধ্যকার ভালোবাসার সংকেতগুলো পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। পুরুষের লালাগ্রন্থিতে যে সমস্ত যৌন হরমোনের উপস্থিতি থাকে, সেটার উপাত্তই চুমু বিশ্লেষণের জন্য বয়ে নিয়ে যায় মস্তিষ্কে।

চুম্বনের রসায়নে নারী পুরুষে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে মিল পাওয়া গেছে। চুম্বন মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে—নারী পুরুষ উভয়েরই। মনোবিজ্ঞানী উইন্ডি হিল এবং তার ছাত্রী কেরি উইলসনের গবেষণা থেকে জানা গেছে চুম্বনের পরে দেহের কর্টিসল (cortisol) হরমোন, যার পরিমাণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়, তার স্তর লক্ষণীয়ভাবে কমে আসে। এর থেকে বোঝা যায় যে, রোমান্টিক চুম্বন আমাদের মানসিকভাবে চাপমুক্ত থাকতে সহায়তা করে।

কেন হীরার আংটি কিংবা সোনার গয়না হয়ে উঠে ভালোবাসার উপঢৌকন ?



আমি যখন এই অংশটি বইয়ের জন্য লিখছিলাম তখন প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট সবে বিয়ে করেছেন। মিডিয়ার গরম খবর এটি তখন। এই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক

এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের নাগরিক হিসেবে আমার অবশ্য এই সব অথর্ব রাজা রানি আর তাদের সুপুত্র কিংবা কুপুত্রদের বিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না কখনই। কেবল বিনোদন হিসেবে মাঝে মধ্যে এ ধরনের খবরে চোখ বোলানোই সার হতো। কিন্তু সেসময় গত কয়েক দিন ধরে এই কেট উইলিয়ামের বিয়ে নিয়ে মিডিয়া যা শুরু করেছিল তাতে আমি রীতিমতো হতভম্ব। সে সময় এই মিডিয়া কাঁপানো বিয়ের একদিন আগে আমেরিকার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে সময়কালের ভয়ঙ্করী প্রলঙ্করী এক ঘূর্ণিঝড়। চারশ'র মতো লোক মারা গিয়েছিল। আলাবামার অবস্থা তো যাচ্ছেতাই, এমনকি আমি যে জর্জিয়া স্টেটে থাকি সেখানকার আশেপাশের বেশ কিছু বাড়িঘড় ভেঙেছে, মানুষও মারা গেছে কম বেশি। অথচ সিএনএন-এর মতো সংবাদমাধ্যম সে সময় সেসব কিছু বাদ দিয়ে কেবল কেট আর উইলিয়ামের বিয়ের আয়োজন প্রচার করে চলছিল সারা দিন ধরে যেন পৃথিবীতে এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু! কেট কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছেন, কীরকম পোশাক পড়েছেন, বিয়ের পরে কীভাবে ব্যালকনিতে পরস্পরকে চুম্বন করলেন, আটটি স্তরের কত বড় আয়তনের কেক ছিল বিয়েতে, কীভাবে তারা জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন—এগুলো নিয়ে বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ চলছে। অবশ্য মিডিয়ার আর কী দোষ। আমার মতো আদার ব্যাপারীর এই রাজকীয় বিয়ে নিয়ে আগ্রহ না থাকলেও সাড়া বিশ্বের মানুষের আগ্রহের কমতি দেখছি না! ৫০০০ পুলিশ অফিসারসহ আর্মি নেভি আর এয়ারফোর্সের নিয়োগদান সহ কেবল নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই নাকি খরচ হয়েছে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার। কাজেই পুরো বিয়ের আয়োজনের খরচ কত হতে পারে সহজেই অনুমেয়! নিঃসন্দেহে এই বিশাল খরচের বড় একটা অংশের ব্যয়ভার বহন করতে হয় সেই জনগণকেই। তাতেও যে কারো কোনো আপত্তি আছে তা মনে হচ্ছে না। খোদ বাকিংহাম প্যালেসের বাইরেই নাকি প্রায় ৫০০,০০০ মানুষ জমায়েত হয়েছিল বর-বধূকে এক-নজর দেখার জন্য। কাজেই এই অপব্যয়িতাকে সাদরে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরাসক্ত হলে আপনিও আমার মতো বিবর্তনীয়ভাবে 'মিসফিট' বলে বিবেচিত হয়ে যাবেন!



চিত্র: প্রায় ৮ ক্যারট হীরার আংটিটি উইলিয়াম কেট কে বাগদানের সময় উপহার দিয়েছেন, তার মূল্যমান খোলাবাজারে প্রায় আকাশ ছোঁয়া

তাই আমার মতো বিবর্তনীয়ভাবে মিসফিট হবার হাত থেকে বাঁচতে হলে দুচারটি কথা জেনে রাখতে পারেন। প্রিন্স উইলিয়াম তার হবু বধূ কেট মিডেলটনকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আট বছর ধরে প্রেম করার পর ২০১০ সালের নভেম্বরের ১৬ তারিখ। প্রায় ৮ ক্যারট হীরার আংটিটি উইলিয়াম কেট কে সে সময় উপহার দিয়েছেন, সেটি একসময় তার মা প্রিন্স ডায়না পরতেন। কাজেই আংটিটি নিয়ে উইলিয়ামের আবেগ সহজেই অনুমেয়। তিনি সেটা মিডিয়ায় বলেছেনও—'এটা আমার মায়ের বিয়ের অঙ্গুরি। কাজেই এটা আমার কাছে অবশ্যই বিশেষ কিছু। আমি চাই যে আমার মার স্মৃতি আমার বিয়ের সময় অক্ষুণ্ণ থাকুক'। কাজেই এই আংটির পেছনে এত আবেগময় স্মৃতি জড়িত যে, কখনো যদি এই আংটি নিলামে উঠে, তবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরাও এই আংটিটি কেনার জন্য দরদাম করতে ভয় পাবেন। এমনকি যদি শুধু হীরার মূল্যমান হিসেবেও বিচার করি, তাহলেও খোলাবাজারে এ ধরনের আংটি ২০০, ০০০ থেকে ২৫০, ০০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

কিন্তু কেন এত ব্যয়বহুল বিনিয়োগ? হয়তো ভাবছেন রাজারাজড়াদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা। তারা যদি হীরার আংটি নিয়ে লালায়িত না হন, তো হবে

কে? কিন্তু আপনি খুঁজলেই দেখতে পাবেন, সাধারণদের মধ্যেও হিরের আংটি নিয়ে বিহ্বলতা কম নয়।

আমার অফিসের এক বান্ধবী প্রায় ৩/৪ ক্যারেটের এক ডায়মন্ডের রিং পরে অফিসে আসে (যদিও ওটা সত্যিকারের হীরা কি না আমার কিছুটা সন্দেহ আছে)। হীরকখচিত আঙুল দুলিয়ে দুলিয়ে এমনভাবে কথা বলে যে, হীরার আংটিটার দিকে যে কারো নজর যেতে বাধ্য। আর সুযোগ পেলেই সে সবাইকে শুনিয়ে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে গল্প শোনায়—কোন সাত সাগর পাড়ি দিয়ে কোন হীরক রাজার দেশ থেকে তার প্রেমিক এই বিশাল এই হীরার আংটি বানিয়ে নিয়ে এসেছিল, আর কত রোমান্টিকভাবে তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল!

আমার অফিসের আরেক কলিগ গ্রাজুয়েশন করে নতুন চাকরি শুরু করেছে। কিন্তু বেচারা গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে পারছে না, কারণ গার্লফ্রেন্ডকে তুষ্ট করার মতো হীরের আংটি কেনার সামর্থ নাকি এখনও অর্জন করতে পারেনি। তার গার্লফ্রেন্ড নাকি এমনিতে খুব ভালো, কোনো কিছুই চায় না তার কাছে, কিন্তু একটি কথা নাকি সম্পর্কের প্রথমেই তাকে বলে দিয়েছে—বাগদানের সময় যেনতেন হীরের আংটি হলে কিন্তু তার চলবে না। এমন আংটি দিয়ে তাকে প্রপোজ করতে হবে—যেন সেটা সবাইকে দেখিয়ে বাহবা কুড়াতে পারে। বেচারা বয়ফ্রেন্ডটি এখন চোখ কান বুজে চাকরি করছে, টাকা জমাচ্ছে। ওভারটাইম করে টু-পাইস একটু বেশি কামানো যায় কি না—তার নানা ফন্দি ফিকির খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। হীরের আংটি দিয়ে প্রেমিকার মন তুষ্ট করতে হবে না!

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও মেয়েদের মধ্যে গয়নাগাটি পছন্দ করার চল আছে। শুধু চল বললে ভুল হবে, বিয়ের সময় কতভরি সোনার গয়না দিয়ে বৌকে কেমনভাবে সাজানো হলো—সেটা সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। একটা সুযোগ পেলে অনেক মেয়েই বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া গয়নাগাটি

বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের দেখিয়ে কিংবা কোনো বিয়ে বাড়িতে বা বড় কোনো পার্টিতে গলা কিংবা কানে স্বর্ণালঙ্কারের ঝলক দেখিয়ে সবার মাঝে বাহবা কুড়াতে পছন্দ করে—এগুলো আমরা হর-হামেশাই দেখি। কেন পাশ্চাত্যে হীরের আংটি কিংবা আমাদের দেশে সোনার গয়না মেয়েদের এত পছন্দের? এই প্রশ্নটা আমার বরাবরই মনে খচখচ করত। হীরার অঙ্গুরি সোনার গয়নার কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। ভাত, মাংস, পোলাও-কোরমা খেয়ে যেমন উদরপূর্তি করা যায়, বিলাসবহুল বাড়িতে থেকে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম-আয়েশ করা যায়, মার্সিডিস কিংবা রোলস রয়েসে বসে রাজার হালে ঘুরে বেড়ানো যায়, আই ফোনে যেমন সেকেন্ডে সেকেন্ডে কথা বলা যায়, আই প্যাডে যেমন রেস্তোরায় বসে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ব্রাউস করা যায়—হীরা কিংবা সোনার সেরকম কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা কেউ কখনোই খুঁজে পায়নি। অথচ তারপরেও হীরা বা সোনার গয়নার জন্য সুযোগ পেলেই হামলে পড়ে মেয়েরা। আর ছেলেরাও ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবে রাজ-রাজ্য চষে হাজির করে প্রায়োগিকভাবে মূল্যহীন কিন্তু নারীর কাছে অমূল্য সেই সব রত্ন পাথর আর সোনা দানা। কিন্তু কেন?

উত্তরটা খুঁজে পেয়েছিলাম অনেক পরে। ডারউইনের সেক্সুয়াল সিলেকশন তথা যৌনতার নির্বাচনের মধ্যেই যে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে ছিল সেটা কি আর আমি তখন জানতাম?

প্রাণিজগৎ থেকেই শুরু করি। যৌনতার নির্বাচনের বহুল প্রচলিত ময়ূরের পেখমের উদাহরণটি আবারো এখানে চলে আসবে। আমরা জানি, ময়ূরের দীর্ঘ পেখম টিকে আছে মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছন্দ তথা যৌনতার নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে। কীভাবে? ১৯৭৫ সালে ইসরাইলি জীববিজ্ঞানী অ্যামতোজ জাহাভি (Amtoz Zahavi) প্রস্তাব করলেন যে, ময়ূরীর এই দীর্ঘ পেখম ময়ূরের কাছে প্রতিভাত হয় এক ধরনের 'ফিটনেস ইন্ডিকেটর' বা সুস্বাস্থ্যের মাপকাঠি হিসেবে। জাহাবির মতে, সততার সাথে সুস্বাস্থ্যের বিজ্ঞাপন দিতে গেলে এমন একটা কিছুর মাধ্যমে সেটা

প্রকাশ করতে হবে যাতে খরচের প্রাচুর্যটা এমনকি সাদা চোখেও ধরা পড়ে। সোজা ভাষায় সেই বিজ্ঞপ্তি অঙ্গটিকে নিঃসন্দেহে হতে হবে 'কস্টলি অর্নামেন্ট'। ঠিক এজন্যই যৌনতার অলংকারগুলো প্রায় সবসময়ই হয় বেঢপ আকারে বিবর্ধিত, ব্যয়বহুল, অপব্যয়ী কিংবা জবরজং ধরনের জটিল কিছু।

ময়ূরের পেখম কেবল ময়ূরীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সস্তা প্রচারণা নয়। ময়ূরের পেখম দীর্ঘ, ভারী আর ভয়ানক বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পেখম এত অনায়াসে তৈরি করা যায় না, আর এমনকি এই বেয়াক্কেল পেখমের কারণে তার শিকারিদের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায় অনেক। বেচারা ময়ূরকে কেবল নিজের দেহটিকেই বয়ে বেড়াতে হয় না, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতে হয় তার পশ্চাৎদেশের সাথে জুড়ে থাকা এই অবিশ্বাস্য বড় ধরনের বাড়তি একটা পেখমের ঝাঁপি (জাহাভির মতে এই বিলাসিতা এমনই দৃষ্টিকটু যে এটা প্রায় পঙ্গুত্বের সামিল, তার তত্ত্বের নামই এজন্য Handicap principle)। এজন্য ময়ূরকে হতে হয় স্বাস্থ্যবান এবং নীরোগ। কখনোসখনো কোনো স্বাস্থ্যহীন ময়ূরের দীর্ঘ পেখম গজাতে পারে বটে, কিন্তু সেটা বয়ে নিয়ে বেড়িয়ে খাবার খোঁজা, কিংবা শিকারিরা তাড়া করলে দ্রুত দৌঁড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই স্বাস্থ্যহীন ময়ূরের পক্ষে দুঃসাধ্যই হবে। কেবল মাত্র প্রচণ্ড শক্তিশালী কিংবা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ময়ূরের পক্ষেই এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে এ ধরনের পেখমের বিলাসিতা ধারণ করা সম্ভব হয় ।

তাই পেখমওয়ালা বিলাসী ময়ূর ময়ূরীর পালের কাছে গিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারে –

> এই যে মহীয়সী ময়ূরী, আমার ন্যাজের দিকে তাকাও; দেখো—আমি সুস্থ, আমি সুন্দর! আমি এমনই স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী যে, আমি আমার ষাট ইঞ্চি ব্যাসার্ধের পেখম বয়ে বেড়াতে পারি অবলীলায়। আমি আমার খাদ্য আর দৈহিক পুষ্টিকে সাইফন করে আমার পেখমের আকার-আকৃতিকে তোমারই জন্য বর্ণাঢ্য করে

রেখেছি। কোনো শিকারি আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে পরাস্ত করতে পারে না। ভারী লেজ থাকা সত্ত্বেও আমি উসেইন বোল্টের মতো এক দৌড়ে শিকারিকে পেছনে ফেলে দিতে পারি, আমার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্দান্ত, আমার দেহ কোনো রোগ জীবাণুর আবাসস্থল নয়। তুমি দেখলেই বুঝবে— উজ্জ্বল পেখম আর অন্য সব কিছু মিলিয়ে আমার সঞ্চিত সম্পদ অঢেল; ধন সম্পদ আর প্রাচুর্যে আমি ভরপুর। আমাকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচণ করলে তুমি সুখে থাকবে হে নারী..."।

তাই ময়ূরীকে আকর্ষণের জন্য স্বভাবগতভাবেই ময়ূরকে বিলাসী হতে হয়। আমরা যতই অপচয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে গালমন্দ করি না কেন, অপচয় এবং ব্যয়বাহুল্য জৈবজগতে যৌনসম্পর্ক গঠনের (sexual courtship) এক অত্যাবশকীয় নিয়ামক। একটা পুরুষ কোকিলকে তার অতিরিক্ত বিশ ভাগ শক্তি ব্যয় করতে নিজের গলাকে সুরেলা করে তুলতে। কারণ এই সুরেলা গলাই তার আকর্ষণের হাতিয়ার। ঠিক একই কারণে হরিণের শিংকে হতে হয় বর্ণাঢ্য, তার প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি। তার মানে, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির বিবর্তন হতে গেলে অপচয়প্রবণতার প্রকাশ হতে হবে একরকম অবশ্যম্ভাবী। এটা যে কেউই বুঝবে যে, একটা ময়ূর তার পেখম না থাকলে বরং আরও ভালোভাবে চলে ফিরে বেড়াতে পারত। তার এই বেঢপ পেখমের পেছনে এত শক্তি অপচয় না করে খেয়ে দেয়ে আমোদ-ফুর্তি করে বেড়াতে পারত। পেখমের পিছনে শক্তি খরচ না করে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করতে পারত। কিন্তু যৌনতার নির্বাচনী চাপ তাদের মানসজগতে অবিরতভাবে কাজ করে যায় বলেই, সে পেখম গঠনের ব্যাপারে নির্লিপ্তভাবে অপব্যয়ী হয়ে ওঠে; উঠতে তাকে হবেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃতিতে দৃষ্টিকটু রকমের অপব্যয়িতাই হচ্ছে সততার সাথে নিজের সম্পদকে অন্যের সামনে তুলে ধরার একমাত্র সহজ মাধ্যম।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তনের যাত্রাপথে নারী অভিরুচির ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। নারী অভিরুচির কারণেই পুরুষ ময়ূরের পেখম দীর্ঘ হয়েছে। পুরুষ কোকিলের গলা সুরেলা হয়েছে। পুরুষ বাবুই পাখি শিখেছে মনোরম বাসা বানাতে। নীচে একটি

টেবিলের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করা হলো, কীভাবে নারী অভিরুচিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিভিন্ন প্রজাতিতে ব্যয়বহুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা নানা অপব্যয়ী বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে[105] —

What Females Want

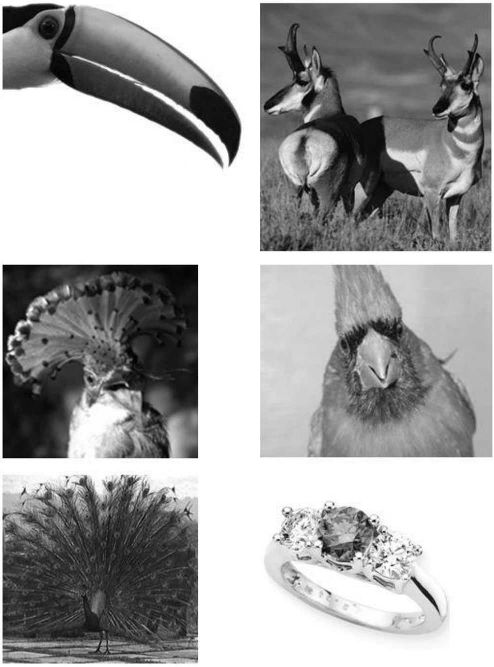
MALE TRAIT	FEMALE PREFERENCE	SPECIES
Call (song)	Greater intensity Greater frequency Longer duration Greater complexity Larger repertoire	Meadow katydid American toad Green tree frog Tungara frog Song sparrow
Courtship display	Greater frequency	Sage grouse
Body size	Larger size	Convict-cichlid fish
Tail	Longer tail Greater tail height Greater number of "eyespots"	Barn swallow Crested newt Peacock
Comb	Larger comb	Red jungle fowl
Bower	More decorated bowers	Satin bowerbird
Breast stripe	Larger stripe size	Great titmouse
Body color	Greater brightness Greater area of orange	House finch Guppy

মানবসমাজেও কি আমরা এরকমের অপব্যয়িতার হাজারো প্রমাণ পাই না? যাদের বেশি টাকা পয়সা আছে, তারা দামি অট্টালিকা বানায়, বনেদি এলাকায় থাকে, রোলস রয়েস কিংবা পাজেরো গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়, সৌখিন এবং দামি ডিজাইনার ব্র্যান্ডের পোশাক-আশাক কিংবা জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়। বৈষয়িক দিক থেকে চিন্তা করলে এগুলোর কোনোটারই কিন্তু দরকার ছিল না। বরং দামি গাড়ি কিংবা পোশাক-আশাকের পেছনে নিয়মিত অর্থ ব্যয় না করে টাকাগুলো ব্যাংকে তুলে রাখলে অপব্যয়িতার হাত থেকে মুক্ত থাকা যেত, পয়সা কড়িও একটু বেশি জমতো। কিন্তু

[105] Lee Alan Dugatkin and Jean-Guy J. Godin, How Females Choose Their Mates, Scientific American, March, 2002.

তাই কি হয়? কোনো পয়সাওয়ালাই কেবল সুইস ব্যাংকে তার সব টাকা-পয়সা তুলে রেখে ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়জামা আর ছেড়া স্যান্ডেল পরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় না। বরং উলটো—নিজের অর্জিত সম্পদের সংকেতকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরতে চায়—আর রাজপ্রাসাদোপম বাড়ি কিংবা দামি গাড়ি, জুতো জামাকেন্দ্রিক অপব্যয়িতাগুলোই হচ্ছে তাদের জন্য সর্বসাধারণের কাছে সম্পদ প্রকাশের 'ফিটনেস মার্কার'।

নিজের সম্পদকে তথা ব্যয়বহুল অলংকারগুলোকে সততার সাথে প্রকাশ করে নিজের 'ফিটনেস'কে বিজ্ঞাপিত করতে চায় সকলেই। সম্পদ বলতে কেবল শুধু বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, জুতো-জামার কথাই আমি বোঝাচ্ছি না, সেই সাথে আমাদের বিজ্ঞাপিত সম্পদের তালিকায় চলে আসবে শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, সাহস, দৈহিক-শক্তি, সংগীতপ্রতিভা, বাকচাতুর্য, সুদর্শন চেহারা, কৃষ্টি, নৃত্যপটুতা, প্রগতিশীলতা, অধিকার সচেতনতা, উদ্ভাবনী শক্তি, দৈহিক সৌন্দর্য, সততা, নৈতিকতা, দয়াপরবশতা, রসিকতা, হাস্যরসপ্রিয়তাসহ অনেক কিছুই। কারণ দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় যাত্রাপথে মানুষ শিখেছে যে এই দৃষ্টিনন্দন গুণাবলিগুলোর প্রতিটিই বিপরীত লিঙ্গের কাছে হয়ে উঠে আকর্ষণের বস্তু, আর সম্ভবত যৌনতার নির্বাচনের পথ ধরেই সেগুলো মানবসমাজে বিকশিত হয়েছে বিপরীত লিঙ্গের বিভিন্ন চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে। কিন্তু তার পরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি এর কোনোটিই বিয়ের সময় হীরার আংটির মতো গুরুত্বপূর্ণ 'ভালোবাসার উপঢৌকন' হিসেবে উঠে আসে না। কিন্তু কেন?



চিত্র: যৌনতার নির্বাচন যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে, প্রকৃতিতে দৃষ্টিকটু রকমের অপব্যয়িতাই হচ্ছে সততার সাথে নিজের সম্পদকে অন্যের সামনে তুলে ধরার একমাত্র সহজ মাধ্যম। সেজন্যই কি হীরার আংটি মানবসমাজে এত পছন্দনীয় 'নাপশাল গিফট'?

হীরার আংটি দিয়ে প্রস্তাব না করে আপনি আপনার প্রেমিকাকে বাজার থেকে একটা আইদাহ আলু কিনে কিংবা সিলেটি কমলালেবু নিয়ে এসে প্রস্তাব করতে পারতেন। যত হাস্যকরই শোনাক না কেন, আলু কিংবা কমলালেবুর ব্যবহারিক উপযোগিতা কিন্তু হীরা কিংবা সোনাদানার চেয়ে অনেক বেশি। ক্ষুধার সময় আলু খেয়ে কিংবা মনের আনন্দে কমলা চিবিয়ে আপনি খিদে দূর করতে পারেন। কিন্তু হীরার আংটি দিয়ে সেসব কিছুই আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু তারপরেও বাগদানের রোমান্টিক সময়ে হীরার বদলে আলু নিয়ে হাজির হলে, আপনার কপালে কী দুর্গতি হবে সেটা বোধ হয় না বলে দিলেও চলবে! আলু পটল তো কোনো ছার, এমনকি দামি গাড়ি-বাড়ি, কম্পিউটার, আইফোন কোনোকিছু দিয়েই আপনি বিয়ের সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন না, যদিও এগুলোর সবগুলোরই কিছু না কিছু ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। রহস্যটি হলো, জাহাভির হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপল অনুযায়ী,

বিয়ের প্রস্তাবের (প্রাণিজগতে অবশ্য যৌনসম্পর্কের) উপহার এমন হতে হবে যার কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই (এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তা হতে পারে ময়ুরের পেখমের অপকারী), কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের চোখে তা হতে হবে অমূল্য। জৈববিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে 'কোর্টশিপ গিফট' (courtship gift) বা 'নাপশাল গিফট' (nuptial gift)[106], [107]। গাড়ি-বাড়ি, আইদাহ আলু কিংবা আইফোন সবকিছুরই ব্যবহারিক কিছু না কিছু উপযোগিতা আছে পুরুষের কাছে। তাই সেগুলো কখনোই 'কোর্টশিপ গিফট' হয়ে উঠার যোগ্য নয়। কোর্টশিপ গিফট হতে পারে কেবল হীরা কিংবা স্বর্ণালঙ্কারের মতো অপদ্রব্যগুলোই, যেগুলোর কোনোই ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই পুরুষের কাছে, অথচ নারীর মানসপটে সেটি অমূল্য এক 'ফিটনেস মার্কার'[108]।

গবেষক পিটার সজু এবং রবার্ট সেইমোর ২০০৫ সালের 'Costly but worthless gifts facilitate courtship' নামের একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন

---

[106] Randy Thornhill, Sexual Selection and Nuptial Feeding Behavior, in *bittacus apicalis* (insecta: mecoptera), The American Naturalist, 1976.

[107] K Vahed, The function of nuptial feeding in insects: a review of empirical studies. Biol. Rev. 73, 43–78, 1998

[108] এখানে 'ফিটনেস মার্কার' বলতে কেবল শারীরিক ফিটনেসকে বোঝানো হচ্ছে না। এখানে বলে রাখা ভাল, সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌনতার নির্বাচন এক এক প্রজাতিতে একেক রকমভাবে কাজ করে। যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করে ময়ুরের বিবর্ধিত পেখম গজিয়েছে, কোকিলের তো তা হয়নি। কিন্তু কোকিলের সুরেলো গলা তৈরি হয়েছে। বাবুই পাখির ক্ষেত্রে সুরেলো গলা বা পেখম কোনটিই তৈরি হয়নি। বাবুই পাখির ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত বাসা বানানোর ক্ষমতা। গাপ্পি মাছের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল গায়ের রঙ। এগুলো সবই 'কস্টলি অর্নামেন্ট' বা ব্যয়বহুল অলঙ্কার।

মানুষের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল সিলেকশনের অপদ্রব্যগুলো শরীরে নয়, সংস্কৃতিতে নিহিত। সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান মানুষের মেটিং স্ট্র্যাটিজিতে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা দীক্ষা, সুস্বাস্থ্য, ধন সম্পদ সহ অনেক কিছুই এখানে অর্নামেন্ট। হীরার আংটি বা সোনাদানা কোন পুরুষের ' শরীরের ফিটনেস ইন্ডিকেটর' বা সুস্বাস্থ্যের সরাসরি প্রমাণ হয়তো নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত ধন সম্পদের প্রমাণ। এজন্যই ধনী শিল্পপতিরা (অনেক সময় নিজেরা কুৎসিৎ দেখতে হওয়া সত্ত্বেও) সহজেই সুন্দরী এবং আকাংক্ষিত নারীকে ঘরে তুলতে পারেন। সবার পক্ষে সম্ভব হয় না পৃথিবী কাঁপানো কাংক্ষিত নারী যেমন - কেট উইন্সলেট, রানী মুখার্জি, ঐশ্বরিয়া রাইকে ডেট করার। ধন সম্পদ, স্ট্যাটাস এগুলো অবশ্যই বড় ধরনের ইন্ডিকেটর। সেগুলোই বিভিন্নভাবে মানুষের মেটিং স্ট্র্যাটিজি রচনায় কাজ করে। এর পাশাপাশি আছে নিরাপত্তার ব্যাপার। মানুষের মেটিং স্ট্র্যাটিজিতে সুস্বাস্থের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ফ্যাক্টরগুলোর অন্যতম হচ্ছে নিজ এবং সন্তান সন্ততির নিরাপত্তা। স্বাধীন পরিবেশে একজন নারী সেই পুরুষকেই তার প্রকৃত সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় যে এই সার্বিক নিরাপত্তাটুকু দিতে পারে। এটি প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে লোকের ৯ ক্যরটের হীরার আংটি নারীকে কিনে দেয়ার ক্ষমতা আছে , তিনি আর যাই হোক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না এবং ক্ষমতা, জৌলুষ এবং প্রভাবের মাধ্যমে নিরাপত্তার গ্যারান্টি তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরও দিতে পারবেন বলে সাধারণ ভাবে ধরে নেয়া হয়।

যে, সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের ‘কোর্টশিপ গিফট’-ই কার্যকরী যা হবে দৃষ্টিকটুভাবে অপব্যয়ী এবং ব্যবহারিকভাবে মূল্যহীন[109]। মানবসমাজের বিবর্তনীয় যাত্রাপথে সেজন্যই হীরার আংটি কিংবা স্বর্ণালঙ্কার খুব চমৎকার একটি ‘কোর্টশিপ গিফট’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একটি কারণ, এর কোনো ব্যবহারিক মূল্য পুরুষের কাছে নেই। কোনো পুরুষই হীরা কিংবা সোনার জন্য লালায়িত থাকে না। হীরা বা সোনা দোকানে নিয়ে বেচে দেয়া ছাড়া একজন পুরুষ কিছুই করতে পারে না। সেটা নিয়ে সে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়ে উদরপূর্তি করতে পারে না, পারে না আমোদিত হতে। কেবল একটি কাজই সে হীরা দিয়ে করতে পারে—নারীকে উপহার দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, আর ভালোবাসার সম্পর্কের সূচনা করতে—হতে পারে সেই সম্পর্ক স্বল্পমেয়াদি কিংবা দীর্ঘমেয়াদি। শোনা যায়, কেউ কেউ নাকি স্বল্পমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে হীরার অলংকারের উপর নির্ভর করতেন। চলচ্চিত্রের নায়িকা, গায়িকা, অভিনেত্রী, মডেল থেকে শুরু করে খবর পাঠিকাসহ শোবিজের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সুন্দরী ললনাদের শয্যাসঙ্গী করার অভিপ্রায়ে তাদের পৃথিবীর আধুনিক নামিদামি কোম্পানির জুয়েলারি পাঠাতেন। তাদের স্বল্পমেয়াদি সম্পর্ক বা শর্ট-টার্ম স্ট্র্যাটিজির জন্য যে ধরনের বিনিয়োগ করতেন দেখা গেছে, সে ধরনের বিনিয়োগ একই রকম কার্যকরী লং-টার্ম স্ট্র্যাটিজির ক্ষেত্রেও। সেজন্যই বাংলাদেশের বিয়েতে সোনাদানা কিংবা পাশ্চাত্যে হীরার আংটি বৈবাহিক সম্পর্কের সূচনায় এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

মেরেলিন মনোরোর কথা আমরা সবাই জানি। পঞ্চাশ ষাটের দশকের সুদর্শনা অভিনেত্রী ছিলেন তিনি, এবং মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছিলেন বহু পুরুষের হার্টথ্রব। অভিনয়ের পাশাপাশি গানও গাইতেন মনোরো। মনোরোর গাওয়া চমৎকার গান আছে ‘Diamonds are a Girl's Best Friend’ নামে।

[109] Peter D Sozou and Robert M Seymour, Costly but worthless gifts facilitate courtship, Proceedings of the royal society of london, 272 (1575), pp. 1877-1884, 2005.

মেরোলিন মনোরো গানটি গেয়েছিলেন ১৯৫৩ সালে ‘Gentlemen Prefer Blondes’ নামের একটি ছবির জন্য । গানের কথাগুলো এরকমের[110] -

The French were bred to die for love
They delight in fighting duels
But I prefer a man who lives
And gives expensive jewels
A kiss on the hand may be quite continental
But diamonds are a girl's best friend
A kiss may be grand but it won't pay the rental
On your humble flat, or help you at the automat
Men grow cold as girls grow old
And we all lose our charms in the end
But square cut or pear shaped
These rocks don't lose their shape
Diamonds are a girl's best friend...

আরেকটা বিখ্যাত গান আছে ‘ডায়মন্ডস আর ফরএভার’ নামে। গানটি ১৯৭১ সালের শন কনরি অভিনিত জেমস বন্ডের একটি সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছিল। গায়িকা ছিলেন শার্লি ব্যাসি, পঞ্চাশের দশকের আরেকজন জনপ্রিয় শিল্পী (এবং আমার এখনও প্রিয় গায়িকা)। গানের কথাগুলো এরকমের[111] -

Diamonds are forever,
They are all I need to please me,
They can stimulate and tease me,

---

[110] গানটি ইউটিউব থেকে শোনা যেতে পারে এখান থেকে - httpv://www.youtube.com/watch?v=0L8sHIU8YAg

[111] গানটি শোনা যাবে ইউটিউবে এখান থেকে - httpv://www.youtube.com/watch?v=D7_u_46e3Dc

They won't leave in the night,
I've no fear that they might desert me.

Diamonds are forever,
Hold one up and then caress it,
Touch it, stroke it and undress it,
I can see every part,
Nothing hides in the heart to hurt me.

I don't need love,
For what good will love do me?
Diamonds never lie to me,
For when love's gone,
They'll luster on....

আমাদের দেশ সহ ভারতবর্ষে হীরার মতো সোনাকেও ভালোবাসার খুব মূল্যবান উপঢৌকন হিসেবে ধরা হয়, এবং সেটাও একই কারণে।



চিত্র: ভারতবর্ষে হীরার মতো সোনাকেও ভালোবাসার খুব মূল্যবান উপঢৌকন বা 'নাপশাল গিফট' হিসেবে দেখা হয়।

সোনা দানার কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা পুরুষদের কাছে নেই, কিন্তু নারীর কাছে তা অমূল্য। কেন ভারতবর্ষের নারীরা স্বর্ণালঙ্কার ভালোবাসে? এর ব্যাখ্যা হিসেবে জনপ্রিয় rediff.com একটি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে[112] —

> স্বর্ণালঙ্কার নারীর জন্য কেবল কেবল শক্তিশালী আবেগই তৈরি করে না, পাশাপাশি নারীর অবয়বকে সার্বিক পূর্ণতা দেয়। নারী স্বর্ণালঙ্কার পরে নিজেকে মনে করে লাস্যময়ী, সুন্দরী, সফল, আত্মপ্রত্যয়ী, এবং যৌনাবেদনময়ী।

রোমান কবি অভিড প্রায় একহাজার বছর আগে তার একটি লেখায় বলে গিয়েছিলেন—

> নারীরা কবিতা ভালোবাসে। কিন্তু তার জন্য মূল্যবান কিছু উপহার দাও। ...
> Gold buys honor; gold procures love।

অভিডের মৃত্যুর পর সহস্র বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও আমরা সেই স্বর্ণযুগেই পড়ে রয়েছি!

আছে ভালোবাসা, আছে ঈর্ষা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরও দূরে

[112] "Wearing gold not only enhances strong emotional feelings for its wearer but also completes a woman's appearance - it makes women feel indulgent, beautiful, successful, confident and sexy. Women who wear gold jewellery consider it to be an integral part of their appearance, and consider it as a necessary item rather than just an accessory."; Why do people wear gold jewellery?, http://www.rediff.com/money/2007/may/23gold1.htm;

যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।
কী কথা তাহার সাথে? —তার সাথে! ...

‘আকাশলীনা’ নামের কবিতায় ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্রের এক অসাধারণ চিত্রায়ণ করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ, যে কবিতায় ঈর্ষাকাতর প্রেমিক অন্য যুবকের সাথে সুরঞ্জনার কথা বলা নিয়ে চিন্তিত, ঈর্ষান্বিত। হ্যাঁ—প্রেম যেমন আছে, তেমনি আছে ঈর্ষাপরায়ণতা। প্রেমের মতো ঈর্ষাপরায়ণতার ব্যাপারটাও বোধ হয় মানুষের মজ্জাগত। একতরফাভাবে প্রেম কখনোই কোথাওই হয় না, প্রেমে ছলনা আছে, আছে প্রতারণা। আর ছলনা বা প্রতারণা থাকলে থাকবে ঈর্ষা, থাকবে ঘৃণা, এবং ক্ষেত্রবিশেষে জিঘাংসাও। শুনতে যতই খারাপ লাগুক না কেন—ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈর্ষা বা জিঘাংসার মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্মও হয়েছে প্রেমের মতোই একই বিবর্তনীয় যাত্রাপথে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের এগুলো নিয়েও সঙ্গত কারণেই গবেষণা করতে হয়। ডেভিড বাস তাঁর বই *ভয়ঙ্কর আবেগ : প্রেম এবং যৌনতার মধ্যে ঈর্ষাও জড়িত থাকে কেন?* নামের বইয়ে দেখিয়েছেন, কেউ প্রেমে প্রতারণা করলে আমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠি। ঈর্ষা আসলে একটি সারভাইভাল স্ট্র্যাটিজি— বেঁচে থাকার এক সুচতুর পরিকল্পনা। আসলে বিবর্তনের ধারাবাহিকতাতেই ভালোবাসার মতো ঈর্ষার বীজও মানুষের মনে তৈরি হয়েছে, এর পরিস্ফুটন ঘটেছে। আমাদের বর্তমান মানসিকতার মধ্যে ঈর্ষার বীজ দেখে বোঝা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যাদের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না তাঁরা প্রজননগতভাবে সফল ছিল না, তারা কোনো উত্তরসূরী রেখে যান নি[113]। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সবাইকে ঈর্ষাপরায়ণ হিসেবে বড় হতে হবে, আর কাউকে দেখলেই ঈর্ষান্বিত হতে হবে। ঈর্ষার ব্যাপারটা বহুলাংশেই সময় এবং পরিস্থিতি নির্ভর। বিবর্তনের কৌশল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, এছাড়া বিবর্তনের কৌশলজনিত যে কোনো মানবিক বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে পারিসাংখ্যিক সীমায় বিস্তৃত, কারও ক্ষেত্রে কম, কারও ক্ষেত্রে বেশি।

[113] David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press, 2000



চিত্র: আমাদের পূর্বপুরুষেদের মধ্যেও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যাদের মধ্যে ঈর্ষা ছিল না তাঁরা প্রজননগতভাবে সফল ছিল না, তারা কোনো উত্তরসূরী রেখে যান নি।

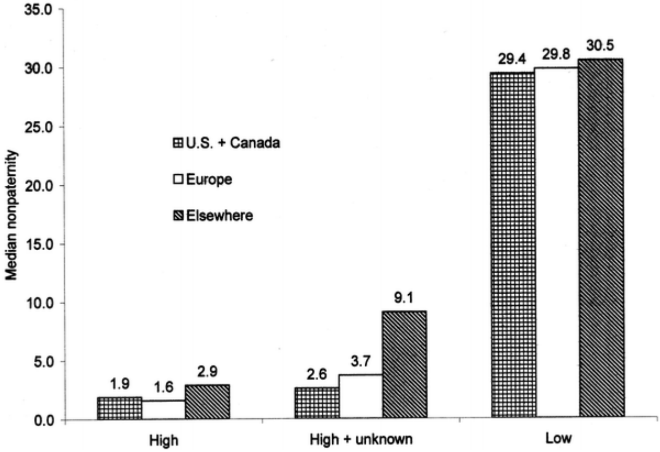
তবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ঈর্ষা এবং প্রতারণার রকমফের নারী-পুরুষে ভিন্ন হয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অনুকল্প অনুযায়ী যৌনতা সংক্রান্ত হিংসা কিংবা ঈর্ষার ব্যাপারটি আসলে জৈবিকভাবে অনেকটাই পুরুষদের একচেটিয়া, যাকে বলে—'সেক্সুয়াল জেলাসি'বা যৌন-ঈর্ষা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে - কেবল পুরুষদেরই যৌন-ঈর্ষা থাকবে কেন? কারণ হচ্ছে, সঙ্গমের পর গর্ভধারণ এবং বাচ্চা প্রসবের পুরো প্রক্রিয়াটা নারীরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে, পুরুষদের আর কোনো ভূমিকা থাকে না। ফলে পুরুষরা নিজেদের পিতৃত্ব নিয়ে কখনোই 'পুরোপুরি' নিশ্চিত হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কী—আধুনিক 'ডিএনএ'টেস্ট আসার আগ পর্যন্ত আসলে কোনো পুরুষের পক্ষে একশত ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা সম্ভব ছিল না যে সেই তার সন্তানের পিতা। কিন্তু মাতৃত্বের ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মাকে যেহেতু গর্ভধারণ করতে হয়, প্রত্যেক মাই জানে যে সেই তার সন্তানের মা। অর্থাৎ, পিতৃত্বের ব্যাপারটা শতভাগ নিশ্চিত না হলেও মাতৃত্বের ব্যাপারটা নিশ্চিত। এখন চিন্তা করে দেখি—আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন বনে জঙ্গলে ছিল অর্থাৎ শিকারি-সংগ্রাহক

হিসেবে জীবন চালাতো, তখন কোনো সুনিয়ন্ত্রিত একগামী পরিবার ছিল না। ফলে পুরুষদের আরও সমস্যা হতো নিজেদের 'পিতৃত্ব' নিয়ে। পিতৃত্বের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ বিবর্তনের স্বার্থপর জিনের (selfish gene) ধারকেরা স্বার্থপরভাবেই চাইবে কেবল তার দেহেরই প্রতিলিপি তৈরি হোক। কিন্তু চাইলেই যে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে তা তো নয়। সম্পর্কে প্রতারণা হয়। তার স্ত্রী যে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি করে গর্ভধারণ করবে না, তা সে কীভাবে নিশ্চিত করবে? আদিম বন-জঙ্গলের কথা বাদ দেই, আধুনিক জীবনেও কিন্তু প্রতারণার ব্যাপারটা অজানা নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকায় শতকরা প্রায় ১৩ থেকে ২০ ভাগ পুরুষ অন্যের সন্তানকে 'নিজ সন্তান' ভেবে পরিবারে বড় করে। জার্মানিতে সেই সংখ্যা ৯ থেকে ১৭ ভাগ। সারা বিশ্বেই মোটামুটিভাবে নন-জেনেটিক সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে বড় করার হার শতকরা ৯ থেকে ১৫ ভাগ বলে মনে করা হয়[114]। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অন্যের (অর্থাৎ নন- জেনেটিক) সন্তানকে নিজ সন্তান ভেবে বড় করার এই প্রতারণাকে বলা হয় কাকোল্ড্রি (cuckoldry), যার বাংলা আমরা করতে পারি—কোকিলাচরণ[115]।

---

[114] Who's your Daddy? Is it true 10-15% of children in modern society were not sired by their putative fathers? http://www.straightdope.com/columns/read/2730/whos-your-daddy; Also see - MacIntyre S., A. Sooman., Non-paternity and prenatal genetic screening. Lancet 338:869-871, 1991; R.R. Baker & M.A. Bellis, Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity, Springer,1999

[115] কাকোল্ড্রি বা কোকিলাচরণ শব্দটি এসেছে কোকিলের অন্য পাখির বাসায় ডিম পেড়ে ন্য পাখিদের সাথে প্রতারণা করার উপমা থেকে। কোকিলেরা এভাবে অন্য পাখির সাথে প্রতারণা করে ডিমে তা দেয়া কিংবা সন্তান লালন পালনের হাত থেকে অব্যহতি পায়। মানুষের ক্ষেত্রে কোকিলাচরণের মাধ্যমে অন্য পুরুষের প্রণয়াসক্ত স্ত্রীটি স্বামীর নিজের সন্তান হিসবে প্রতারিত করে সন্তান লালন পালনে প্রলুব্ধ করে।



চিত্র: সারা বিশ্বেই মোটামুটিভাবে নন-জেনেটিক সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে বড় করার হার (কোকিলাচরণ) শতকরা ৪ থেকে ১৫ ভাগ বলে মনে করা হয়। যে সমস্ত পুরুষেরা নিজেদের পিতৃত্ব নিয়ে সন্দিহান (উপরের গ্রাফে লো কনফিডেন্স গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত) , তাদের পরিবারে নন-জেনেটিক সন্তান বেশি পাওয়া গেছে, প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ[116]।

এখন কথা হচ্ছে, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রভাব কী? প্রভাব হচ্ছে, কাকোল্ড্রি বা কোকিলাচরণ ঘটলে সেটা পুরুষের জন্য এক ধরনের অপচয়। কারণ সে ভুল ভাবে অন্যের জিনের প্রতিলিপি নিজের প্রতিলিপি হিসেবে পালন করে শক্তি বিনষ্ট করবে। এর ফলে নিজের জিন জনপুঞ্জে না ছড়িয়ে সুবিধা করে দেয় অন্যের জিন সঞ্চালনের, যেটা 'সেলফিশ জিন'পারতপক্ষে চাইবে না ঘটতে দিতে। ফলাফল? ফলাফল হচ্ছে, পুরুষেরা মূলত 'সেক্সুয়ালি জেলাস' হিসেবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠে। তারা নিশ্চিত করতে চায় যে, তার যৌনসঙ্গী বা স্ত্রী, কেবল তার সাথেই সম্পর্ক রাখুক, অন্য পুরুষের সম্পর্ক এড়িয়ে কেবল তার সাথেই চলুক। এইটা বজায় রাখতে পারলেই সে শতভাগ না হোক, অন্তত কিছুটা হলেও নিশ্চয়তা পাবে যে, তার এই সম্পর্কের মধ্যে কোকিলাচরণ ঘটার সম্ভাবনা কম। এজন্যই ইসলামিক

---

[116] Kermyt G. Anderson, Reports: How Well Does Paternity Confidence Match Actual Paternity? Evidence from Worldwide Nonpaternity Rates, Current Anthropology 48(3):511-518.

দেশগুলোতে কিংবা অনুরূপ ট্রেডিশনাল সমাজগুলোতে মেয়েদের হিজাব পরানো হয়, বোরখা পরানো হয়, কিংবা গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হয়, কিংবা বাইরে কাজ করতে দেয়া হয় না - এগুলো আসলে প্রকারান্তরে পুরুষতান্ত্রিক ‘সেক্সুয়াল জেলাসি’-রই বহিঃপ্রকাশ।

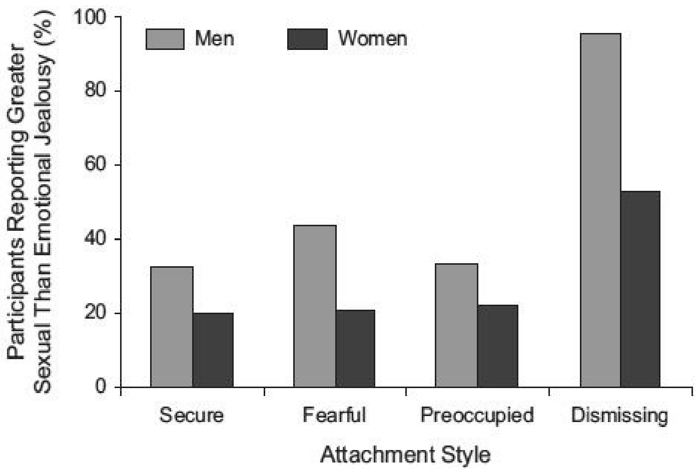


চিত্র: ইসলামিক দেশগুলোতে কিংবা অনুরূপ সনাতন সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের যে হিজাব পরানো হয়, বোরখা পরানো হয়, কিংবা গৃহে অবরুদ্ধ রাখা হয়—এগুলো আসলে প্রকারন্তরে পুরুষতান্ত্রিক ‘সেক্সুয়াল জেলাসি'-রই বহিঃপ্রকাশ।

আসলে নারীকে অন্তরীণ করে, তাদের অধিকার এবং মেলামেশা সীমিত করার মাধ্যমে সে সব দেশে পুরুষেরা নিশ্চিত করতে চায় যে, কেবল তার জিনের প্রতিলিপিই তার স্ত্রীর শরীরে তৈরি হোক, অন্য কারো নয়। কারণ স্ত্রীর কোকিলাচরণ ঘটলে সেটা তার জন্য হয়ে উঠে 'সময় এবং অর্থের অপচয়'। পুরুষালি ঈর্ষার মূল উৎস এখানেই। ডেভিড বাস তার ‘Human Mating Strategies’ শীর্ষক

গবেষণাপত্রে সেজন্যই লিখেছেন[117] —

> যেহেতু মানব শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বাণুর নিষেকের পুরো প্রক্রিয়াটিই নারীর দেহাভ্যন্তরে ঘটে, পুরুষের মধ্যে নিজের সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অপর পক্ষে মাতৃত্ব নিয়ে একটি নারীর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, এখানে নিশ্চয়তা শতভাগ, তা সেটা যে শুক্রাণু দিয়েই নিষিক্ত হোক না কেন! কাজেই যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততা কেবল একটি পুরুষের (জেনেটিক) পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে, নারীর মাতৃত্ব থেকে নয়। ... এ সকল কারণে, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, যৌনতার অবিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কোনো আলামত পাওয়া গেলে নারীদের চেয়ে পুরুষেরাই অধিকতর বেশি মনক্ষুণ্ণ হবে।



চিত্র: অধ্যাপক ডেভিড বাস সহ অন্যান্য গবেষকেরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অনেক বেশি 'সেক্সুয়াল জেলাসি'তে ভোগে। যৌনতার অবিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কোনো আলামত পাওয়া গেলে নারীদের চেয়ে পুরুষেরাই অধিকতর বেশি মণক্ষুণ্ণ হয়।

পুরুষেরা বেশি মনক্ষুণ্ণ হবে কারণ, বিবর্তনীয় পরিভাষায় প্রতারিত পুরুষের সঙ্গী গর্ভধারণ করলে তাকে অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে অন্যের সন্তানের পেছনে

---

[117] David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.

অভিভাবকত্বীয় বিনিয়োগ করতে হবে, যার মুল্যমান জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বলে মনে করা হয়। মূলত তার অভিভাবকত্বের পুরোটুকুই বিনিয়োগ করতে হবে এমন সন্তানের পেছনে যার মধ্যে নিজের কোনো বংশাণুর ধারা বহমান নেই। স্বার্থপর জিনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক ধরনের অপচয়ই বটে। নিজের পিতৃত্বের ব্যাপারে সংশয়ী থাকতে হওয়ায় বিবর্তনীয় যাত্রাপথে পুরুষের মানসপট যৌনতার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু নারীরা মাতৃত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকায়, তা হয়নি[118]।

অবশ্য স্বার্থপরভাবে নিজের জেনেটিক ধারা তার সঙ্গীর মাধ্যমে যেন বাহিত হয়, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, পুরুষ ভেলিড মাকড়শা (veliidae water spider) তার সঙ্গীকে কব্জা করার পর কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত শুয়ে থাকে, যাতে সঙ্গম করুক আর নাই করুক, অন্তত অন্য পুরুষ মাকড়শা যেন তার সঙ্গীর দখল নিতে চেষ্টা না পারে। Plecia nearcticas নামের এক ধরনের পতঙ্গের (জনপ্রিয়ভাবে 'লাভ বাগ' হিসেবে পরিচিত) নিষেকের ক্ষেত্রেও পুরুষ পতঙ্গটি বেশ কয়েকদিন ধরে স্ত্রী পতঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে রাখে, যাতে অন্য কোনো পতঙ্গ এসে এর নিষেক ঘটাতে না পারে। আবার, এক ধরনের ফলের মাছি আছে যাদের শুক্ররসের মধ্যে একধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা স্ত্রী-যোনিতে গিয়ে পূর্বাপর সকল শুক্রাণুকে ধ্বংস করে দেয়, এবং প্রকারান্তরে নিশ্চিত করতে চায় যে, কেবল তার শুক্রাণু দিয়েই নিষেক ঘটুক[119]। কিছু মথ এবং প্রজাপতির ক্ষেত্রে শুক্ররসের মধ্যে বিদ্যমান কিছু রাসায়নিক পদার্থ 'সঙ্গম রোধনী' (copulatory plug) হিসেবে কাজ করে। এর ফলে যোনির মধ্যে শুক্রাণু ঢুকে ডিম্বাণুর প্রবেশপথে অনেকটা আঁঠার মতো আটকে থাকে যেন

[118] Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008

[119] T.R. Birkhead, and F.M. Hunter, Mechanisms of sperm competition. Trends in Ecology and Evolution. 5:48-52, 1990.

পরে অন্য কোনো কোনো পুরুষের শুক্রাণু সেঁধিয়ে গিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে না পারে! তবে সবচেয়ে চরম উদাহরণ আমি পেয়েছি Johannseniella nitida নামের এক ধরনের মাছির ক্ষেত্রে , সঙ্গম শেষে যাদের পুরুষের লিঙ্গ ভেঙে ভিতরে রয়ে যায়। এ যেন অনেকটা সঙ্গমান্তে নারীর যোনি ছিপি দিয়ে আটকে দেয়া—যেন অন্য প্রতিযোগীরা এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে না পারে। যদিও কীট পতঙ্গের সাথে মানুষের পার্থক্য উল্লেখ করার মতোই বিশাল, কিন্তু তারপরেও সঙ্গীকে নিজের অধিকারে রাখার ব্যাপারে স্ট্র্যাটিজিগতভাবে মিল লক্ষণীয়[120]। দুর্ভাগ্যবশত অন্য পতঙ্গের মতো মানুষের শুক্রাণুতে সঙ্গমরোধনী আঁঠাও নেই, কিংবা পুরুষাঙ্গ ভেঙে যোনিতেও থেকে যায় না, তবে বিভিন্ন সমাজে পর্দা, বোরখা আর হিজাবের বেপরোয়া প্রয়োগ দেখা যায় বৈকি। এগুলো তো এক ধরনের ছিপিই বলা চলে, কারণ এর মাধ্যমে পুরুষেরা নিশ্চিত করতে চায় যে, এ নারী অন্যের কামুক দৃষ্টি এড়িয়ে কেবল তারই অধিকারভুক্ত হয়ে থাকুক।

পুরুষদের ঈর্ষার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মেয়েদেরটা? মেয়েদেরও ঈর্ষা হয়, প্রবলভাবেই হয়—তবে, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো—সেটা ঠিক 'সেক্সুয়াল জেলাসি' নয়। মেয়েরা বিবর্তনীয় পটভূমিকায় একজন পুরুষকে রিসোর্স বা সম্পদ হিসেবে দেখে এসেছে। কাজেই একজন পুরুষ একজন দেহাপসারিণীর সাথে যৌনসম্পর্ক করলে মেয়েরা যত না ঈর্ষান্বিত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় তার স্বামী বা পার্টনার কারো সাথে রোমান্টিক কিংবা 'ইমোশনাল' সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে। ডেভিড বাস, ওয়েসেন এবং লারসেনের নানা গবেষণায় এর সত্যতা মিলেছে [121]। এখানে আমি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার উল্লেখ করব। প্রাথমিক একটি গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালের একটি গবেষণাপত্রে[122]।

---

[120] David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003

[121] Buss, D.M., Larsen, R.J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science , 3:251-5 দ্রষ্টব্য।

[122] M W Teismann, D L Mosher, Jealous conflict in dating couples, Psychol Rep. 1978 Jun;42(3 Pt 2):1211-6

২০ জন পুরুষ এবং ২০ জন নারীকে নিয়ে পরিচালিত সেই গবেষণায় ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার বিভিন্ন উপলক্ষ্য থেকে যে কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়। অপশনগুলোর মধ্যে তার সঙ্গীর অন্য কারো সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন থেকে শুরু করে সঙ্গীর সময় এবং সম্পদ অন্য কারো জন্য বরাদ্দ করার মতো সব পথই খোলা ছিল। দেখা গেল বিশ জন নারীর মধ্যে সতের জনই সেই অপশন বাছাই করেছে—যেখানে তার সঙ্গী অন্য কারো জন্য নিজের সময় এবং সম্পদ ব্যয় করছে। কিন্তু অন্য দিকে বিশ জন পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ষোল জনই অভিমত দিয়েছে তার সঙ্গী অন্য কারো সাথে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে সবচেয়ে বেশি ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলবে। এধরনের আরেকটি গবেষণা সত্তুরের দশকে চালানো হয়েছিল পনেরোটি দম্পতির মধ্যে[123]। সে গবেষণা থেকেও একইভাবে উঠে এসেছিল যে, পুরুষেরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে যদি তার সঙ্গীর সাথে কোনো তৃতীয়পক্ষের যৌনসম্পর্কের কোনো আলামত পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, তারা বেশি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে যদি তার সঙ্গী অন্য কোনো মেয়ের সাথে আবেগী কিছু করলে—যেমন টাংকি মারা, রোমান্টিক সম্পর্কে জড়ানো, চুমু খাওয়া, এমনকি এগুলো কিছু না করে তার সঙ্গী পুরুষটি অন্য নারীর সাথে কেবল দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেও সে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। এ গবেষণাগুলো থেকে বোঝা যায়, ছেলেরা তার সঙ্গী কার সাথে কতটুকু কথা বলল না বলল তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে না, যতটা থাকে সঙ্গীর যৌনতার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে। কিন্তু অন্যদিকে মেয়েদেরটা একটু ভিন্ন। তাদের সঙ্গী অন্য কোনো মেয়ের জন্য কতটুকু সময় এবং সম্পদ ব্যয় করল, তা তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলে।

এ ব্যাপারে বড়সড় গবেষণা করেছেন অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড বাস। ৫১১ জন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চালানো এ গবেষণায় তাদের কল্পনা করতে বলা হয় যে, তার সঙ্গী কারো সাথে যৌনসঙ্গমে

[123] J. L. Francis, Toward the management of hetosexual jealousy, Journal of Marriage and Family, 10, 61-69, 1977

প্রবৃত্ত হয়েছে কিংবা কারো সাথে মানসিক আবেগময় এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করেছে। কোন ব্যাপারটা তাকে বেশি ঈর্ষাকাতর করে তুলবে? প্রায় ৮৩ শতাংশ নারী মনে করেছে তার সঙ্গী তাকে না জানিয়ে অন্য কোনো মেয়ের সাথে আবেগময় সম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলবে, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটি মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ। অন্যদিকে শতকরা ৬০ ভাগ ছেলে মত দিয়েছে তার সঙ্গী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে সেটা তাকে চরম ঈর্ষাকাতর করে ফেলবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা পাওয়া গেছে মাত্র ১৭ ভাগ[124]। বাসের এই ফলাফল কেবল আমেরিকার গবেষণা থেকে পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে কোরিয়া, জাপান, চীন, সুইডেনসহ অনেকে দেশেই একই ফলাফল পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে[125]। একই ধরনের ফলাফলের দাবি এসেছে হাঙ্গেরি, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, সোভিয়েত রাশিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াতে চালানো সমীক্ষা থেকেও[126]। তাই বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন নারী-পুরুষে এই ঈর্ষাগত পার্থক্য সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই পারিসাংখ্যিক পরিসীমায় বিস্তৃত। ধারণা করা হয় বিবর্তনের দীর্ঘদিনের যাত্রাপথে নিজের সঙ্গীকে ধরে রাখার অভিপ্রায়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে ঈর্ষা প্রদর্শন করে প্রজননগত সফলতা পেয়েছিল, তার বিবিধ ছাপই দেখা যায় আজকের নারী-পুরুষদের মানসপটে। বলাবাহুল্য, নারী এবং পুরুষেরা ভিন্নভাবে সঙ্গী নিজেদের আয়ত্বে রাখার কৌশল করায়ত্ব করেছিল, সেই পার্থক্যসূচক অভিব্যক্তিগুলোই স্পষ্ট হয় নারী পুরুষের ঈর্ষাকেন্দ্রিক মনোভাব ঠিকমতো বিশ্লেষণ করলে।

---

124 David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press, 2000

125 উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য নীচের গবেষণাপত্রগুলো -

D.C. Geary, M. Rumsey, C.C. Bow-Thomas, & Hoard, M.K. Sexual jealousy as a facultative trait:

Evidence from the pattern of sex differences in adults from China and the United States. Ethology and Sociobiology, 16, 355-383, 1995

M.W Wiederman,., & E. Kendall, Evolution, gender, and sexual jealousy: Investigation with a sample from Sweden. Evolution and Human Behavior, 20, 121-128, 1999.

126 David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003

তবে সবাই যে অধ্যাপক বাসের এ উপসংহারগুলোর সাথে একমত পোষণ করেছেন তা নয়। যেমন করেননি নর্দার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডেভিড বুলার। তিনি তার বই 'অভিযোজনরত মনন' (Adapting Minds) বইয়ে[127] এবং বেশ কিছু প্রবন্ধে অধ্যাপক বাসের ঈর্ষা সংক্রান্ত গবেষণাগুলোর পদ্ধতিগত সমালোচনা হাজির করেছেন[128]। পুরুষেরা কেবল সঙ্গীর যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার সন্ধান পেলেই কেবল ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন, অন্য কিছুতে তেমন নয় বলে বাস যে অভিমত দিয়েছেন, তা সঠিক নয় বলে বুলার মনে করেন। আমরা জীবনানন্দ দাশের আকাশলীনা কবিতায় যুবককে দেখেছি সুরঞ্জনা এক অচেনা যুবকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নয়, কেবল কথা বলাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এ ধরনের অনেক পুরুষই আমাদের চারপাশে আছে। আবার যৌনতার ব্যাপারেও উদার পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। যেমন, অধ্যাপক বাসের গবেষণা থেকেই উঠে এসেছে যে, জার্মানি কিংবা নেদারল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে যৌনতার ব্যাপারগুলো অনেক শিথিল, সেখানে পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অনেক কম ঈর্ষাপরায়ণ থাকেন। কোরিয়া এবং চীনের মানুষদের উপর গবেষণা করেও দেখা গেছে সেখানকার পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার আলামত পেলে অন্য অনেক দেশের পুরুষদের মতো খুব বেশি মনক্ষুণ্ণ হন না। আবার নারীদের ক্ষেত্রেও তারা কেবল সঙ্গীর রোমান্টিক কিংবা 'ইমোশনাল' সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়, সঙ্গীর রোমান্সবিহীন যৌন সম্পর্ককে নয় বলে ঢালাওভাবে উপসংহার টানা হয়েছে—সেটাও কতটুকু নিশ্চিত সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতপূর্ব গভর্নর এবং খ্যাতিমান অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার এবং তার স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যেতে। আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে তার বাসার গৃহপরিচারিকার সাথে যৌনসম্পর্ক

[127] David J. Buller, Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature, The MIT Press; 2005.

[128] David J. Buller, Sex, Jealousy & Violence: A Skeptical Look at Evolutionary Psychology, Skeptic, volume 12 number 1, On line: http://www.skeptic.com/reading_room/sex-jealousy-and-violence/

রেখেছিলেন। এমন নয় যে, শোয়ার্সনেগার পরিচারিকার সাথে কোনো 'রোমান্টিক সম্পর্কে' জড়িয়েছিলেন। যৌনতার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার আলামত পাওয়াতেই মারিয়া শ্রাইভার শোয়ার্সনেগারকে ছেড়ে চলে গেছেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা সঙ্গীর যৌন-অবিশ্বস্ততাকে খুব গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করে, অধিকাংশ পুরুষের মতোই। তাই অধ্যাপক বুলারের মতে বিবর্তন পুরুষ নারীতে ঈর্ষার কোনো 'আলাদা মেকানিজম' তৈরি করেনি, বরং নারী পুরুষ উভয়ই ঈর্ষাকেন্দ্রিক একই মেকানিজমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কেবল এর পরিস্ফুটন পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হয়।

ঈর্ষার পরিণাম

এখন কথা হচ্ছে ঈর্ষার পরিণাম কীরকম হতে পারে? ছোটখাটো সন্দেহ, ঝগড়াঝাটি, দাম্পত্য কলহ, ডিভোর্স থেকে শুরু করে গায়ে হাত তোলা, মারধোর থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা সবাই মোটামুটি জানেন। যেহেতু অধিকাংশ বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, 'সেক্সুয়াল জেলাসি' জৈবিক কারণে পুরুষদেরই বেশি, তারাই পরকীয়া কিংবা কোকিলাচরণের কোনো আলামত সঙ্গীর মধ্যে পেলে গড়পড়তা বেশি সহিংস আচরণ করে।

সঙ্গী 'অযাচিত' সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে এই সন্দেহ একজন ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের মনে দানা বাঁধলে তিনি কী করবেন? অনেক কিছুই করতে পারেন। হয়তো স্ত্রী বা সঙ্গী একা বাড়ি থেকে বেরুলে গোপনে তার পিছু নেবেন, হয়তো অফিসে গিয়ে হঠাৎ করেই ফোন করে বসবেন জানতে তার স্ত্রী বা সঙ্গী এখন ঠিক কী করছেন, খোঁজ-খবর নেবেন মার্কেটে যাওয়ার কথা বলে স্ত্রী আসলেই মার্কেটে গিয়েছে নাকি ঢুকে গিয়েছে তার গোপন প্রেমিকের ঘরে। তিনি চোখে চোখে রাখবেন তার সঙ্গী কোনো পার্টিতে, বিয়ে বাড়িতে কিংবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গেলে কী করেন, কোথায় কার সাথে আড্ডা মারেন। সঙ্গীর অবর্তমানে গোপনে তার ইমেইল পড়বেন, কিংবা সেলফোনের টেক্সটে নজর বুলাবেন, ইত্যাদি। এই আচরণগুলোর সমন্বিত একটি নাম

আছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অভিধানে— ভিজিলেন্স (vigilance); এর বাংলা আমরা করতে পারি ‘শকুনাচরণ’। শকুন যেমন উপর থেকে নজর রাখে তার শিকারের প্রতি, ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের আচরণও হয়ে দাঁড়ায় তার সঙ্গীর প্রতি অনেকটা সেরকমের।

ভিজিলেন্সের পরবর্তী কিংবা ভিন্ন একটি ধাপ হতে পারে ভায়োলেন্স (violence) বা সহিংসতা। সহিংসতার প্রকোপ অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন হয়। কখনো সঙ্গীর গায়ে হাত তোলা, কখনো বা সন্দেহের তালিকাভুক্ত গোপন প্রেমিককে খুঁজে বের করে করে থ্রেট করা, বাড়ি আক্রমণ করা, বেনামে ফোনে হুমকি-ধমকি দেয়া, কিংবা নিজে গিয়ে কিংবা গুন্ডা লেলিয়ে পিটানো, প্রকাশ্যে হত্যা, গুম, খুন ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় আইনে ভিজিলেন্স বা শকুনাচরণ অপরাধ না হলেও ভায়োলেন্স বা সহিংসতা অবশ্যই অপরাধ। কিন্তু অপরাধ হলেও এটা কিন্তু অনেক পুরুষেরই মনোসঞ্জাত স্ট্র্যাটিজি, যা তারা সুযোগ পেলেই ব্যবহার করেছে ইতিহাসের যাত্রাপথে সে কথা কারো অজানা নয়।

এ ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের দিকে পত্রপত্রিকায় সাড়া জাগানো ক্যানাডিয়ান মডেল এবং অভিনেত্রী ডরোথি স্ট্র্যাটেন হত্যার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনিন্দ্য সুন্দরী ডরোথি স্ট্র্যাটেন তখন কানাডার সেন্টিনিয়াল হাইস্কুলে পড়ছিলেন, আর বাড়ির পাশে ‘ডেইরি কুইন’ নামের ফাস্ট ফুড রেস্তরাঁয় কাজ করতেন। রেস্তরাঁয় কাজ করতে গিয়েই পল স্নাইডার নামে এক লোকের সাথে পরিচয় হয় তার। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ভাবের আদানপ্রদান—পরিচয় থেকে পরিণয়। ডরোথি স্ট্র্যাটেনের বয়স তখন ১৭। আর স্নাইডারের ২৬। পরিচয়ের পর থেকেই স্নাইডার ডরোথিকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, ডরোথির একটি চমৎকার সুন্দর মুখশ্রী আর আকর্ষণীয় দেহবল্লরী আছে, যা মডেল হবার জন্য একেবারে নিঁখুত। ডরোথি প্রথমে রাজি না হলেও স্নাইডারের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে কিছু ছবি তুলেন। স্নাইডারই তোলেন সে ছবিগুলো তার নিজস্ব ক্যামেরায়। তারপর তা পাঠিয়ে দেন হিউ হেফনারের কাছে।

হিউ হেফনার প্লেবয় ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা। স্নাইডার হেফনারের কাছ থেকে উত্তর পেলেন দুই দিনের মধ্যেই।

এরপরের সময়গুলো ডরোথি স্ট্র্যাটেনের জন্য খুবই পয়মন্ত। তিনি হিউ হেফনারের বিখ্যাত 'প্লেবয় প্রাসাদে' গিয়ে উঠলেন স্নাইডারকে সাথে নিয়ে। শুরু হলো ডরোথির প্লেবয় মিশন। তিনি ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত হলেন প্লেবয় ম্যাগাজিনের 'মাসের সেরা প্লে মেট' হিসেবে। ১৯৮০ সালে তিনি হন বর্ষসেরা। প্লেবয়ের পাঠককূল যেন আক্ষরিক অর্থেই ডরোথির পরিষ্কার চামড়া এবং প্রতিসাম্যময় দেহ, লাস্যময় কিন্তু নিষ্পাপ মুখশ্রী, আর নির্মল চাহনি দিয়ে আবিষ্ট ছিল সেসময়। রাতারাতি ডরোথি বনে গেলেন তারকা। আর অন্যদিকে স্নাইডারের অবস্থা রইলো আগের মতোই—চাকরিবাকরিবিহীন, হতাশাগ্রস্ত। হেফনারের কাছেও স্নাইডার তেমন কোনো সহনীয় কিছু ছিল না। একদিন প্লেবয় প্রাসাদ থেকে স্নাইডারকে তাড়িয়েই দেয়া হলো। প্রাসাদরক্ষীকে বলে দেয়া হলো যে, তিনি যেন স্নাইডারকে বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখেন।



চিত্র: ডরোথি স্ট্র্যাটেন (১৯৬০ -১৯৮০)

এদিকে ডরোথিকে নিয়ে শুরু হলো হেফনারের ম্যালা পরিকল্পনা। তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো হলিউডের নায়ক, নায়িকা আর খ্যাতিমান পরিচালকদের সাথে।

এদের মধ্যে ছিলেন হলিউডের উঠতি পরিচালক পিটার বোগদানোভিচ। পিটার তখন ইতোমধ্যেই ‘পেপার মুন’ (১৯৭৩) আর ‘দ্য লাস্ট পিকচার শো’ (১৯৭১)’র মতো জনপ্রিয় ছবি তৈরি করে ফেলেছেন। তিনি ডরোথিকে দেখেই তার ভবিষ্যৎ ছবির নায়িকা হিসেবে মনোনীত করে ফেললেন। ডরোথির জন্য এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া। অবশ্য বর্ষসেরা প্লেবয় হিসেবে মনোনয়নের কারণে ইতোমধ্যেই ডরোথি পরিচিত হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন মহলে। তিনি অভিনয় শুরু করেছেন বাক রজার্স এবং ফ্যান্টাসি আইল্যান্ডের মতো টিভি সিরিয়ালে।

ডরোথির দিনকাল ভালোই চলছিল। পিটার বোগদানোভিচের ‘দে অল লাফড’ ছবিতে অভিনয় শুরু করেছেন। এটিই তার প্রথম ছবি। অন্যদিকে তার সঙ্গী পল স্নাইডার চাকরিবাকরিবিহীন। গ্ল্যামারাস ডরোথির পাশে চলচিত্র জগতে অচ্ছুৎ স্নাইডার ‘নিতান্তই বেমানান’ হয়ে উঠছেন ক্রমশ। কিন্তু তিনি তখনো ডরোথিকে বিয়ের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডরোথিও প্রথমে না করেন নি, কারণ আফটার অল - পল স্নাইডারের কারণেই প্লেবয়ের মাধ্যমে তার খ্যাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ডরোথি স্নাইডারকে বিয়ে করতে রাজি হলেন বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অনিবার্যভাবে প্রেমে পড়ে গেলেন পিটার বোগদানোভিচের। স্নাইডারকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন ডরোথি। তার সাথে বিচ্ছেদের চিন্তা শুরু করেছেন তিনি।

বেপরোয়া পল স্নাইডার শেষবারের মতো ডরোথির সাথে দেখা করতে চাইলেন। যদিও ডরোথির বন্ধুবান্ধব তাকে স্নাইডারের সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডরোথি ভাবলেন—হোয়াট দ্য হেক, এই একবারই তো। তিনি ভাবলেন যে মানুষটার সাথে এতদিনের একটা সম্পর্ক ছিল, যার কারণে তিনি এই খ্যাতির সিঁড়িতে তার সাথে দেখা করে কিছুটা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করলে ক্ষতি কী!

সেই ভাবাই তার কাল হলো। ১৯৮০ সালের ১৪ই অগাস্ট ডরোথি স্নাইডারের সাথে দেখা করলেন। সাথে তার হ্যান্ডব্যাগে নিলেন এক হাজার ডলার। ভাবলেন এ

টাকাগুলো স্নাইডারের হাতে তুলে দিলে স্নাইডারের রাগ ক্ষোভ কিছুটা হলেও কমবে, আর তা ছাড়া চাকরিবাকরিবিহীন স্নাইডারের টাকার দরকার নিঃসন্দেহে। কিন্তু স্নাইডারের মাথায় ছিল ভিন্ন পরিকল্পনা। তিনি তার শটগান ডরোথির মাথায় তাক করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলেন। হত্যা করলেন ডরোথিকে। পুলিশ পরে বাসায় এসে রক্তের বন্যায় ভেসে যাওয়া ডরোথির নিথর দেহ আবিষ্কার করলেন। যে নির্মল চাহনি আর নিষ্পাপ মুখশ্রী এতোদিন আবিষ্ট করে রেখেছিল ডরোথির ভক্তদের, হাজার হাজার ম্যাগাজিনের কভার পেজে যে মুখের ছবি এতোদিন ধরে আগ্রহভরে প্রকাশ করেছেন পত্রিকার প্রকাশকেরা, সেই মুখ বিধ্বস্ত। রক্তস্নাত বিকৃত মুখ, ফেটে যাওয়া মাথার খুঁলি আর এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়া মগজের মাঝে পড়ে থাকা নগ্ন দেহ ডরোথির। দেহে নির্যাতন আর ধর্ষণের ছাপও ছিল খুব স্পষ্ট।

স্নাইডারের ঈর্ষাপরায়ণতার মর্মান্তিক বলি হলেন ডরোথি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস—মৃত্যুর কিছুদিন আগের এক সাক্ষাৎকারে ডরোথি তার সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন—ঈর্ষাপরায়ণতা! মাত্র বিশ বছর বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস ভালোবাসা ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে হলো ডরোথিকে। স্নাইডার নিজেও আত্মহত্যা করেন ডরোথিকে হত্যার পর পরই। ব্যাপারটিকে সাদা চোখে জিঘাংসার জের বলে মনে হলেও সেটি আরেকটু গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ডরোথি ছিলেন সুন্দরী, কিন্তু নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তিনি তেমন সচেতন হয়তো ছিলেন না যখন তিনি ডেইরি কুইন রেস্তরাঁয় পার্ট টাইম কাজ করতেন। প্লেবয় ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা প্লে মেট নির্বাচিত হবার পরই তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি পরিণত হয়েছেন বহু শিক্ষা দীক্ষা গুণমান সমৃদ্ধ রথী মহারথী পুরুষের হার্টথ্রবে। অর্থাৎ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে ডরোথির 'মেটিং ভ্যালু' বেড়ে গিয়েছিল অনেকগুণ। আর অন্যদিকে স্নাইডার ছিলেন চালচুলোহীন, চাকরিবাকরিবিহীন বেকার যুবক। তিনি অর্থবিত্তে বলীয়ান সামাজিক প্রতিপাত্তিশালী হেফনার কিংবা পিটার বোগদানোভিচদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবেন কেন? তার

মেটিং ভ্যালু ছিল পড়তির দিকে। প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার, অর্থাৎ এতদিনের সুন্দরী সঙ্গী 'হাত ছাড়া' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল স্নাইডারকে। ভিজিলেন্স থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভায়োলেন্সের পথ। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তনীয় যাত্রাপথে নারীরা পুরুষ সঙ্গীদের এক ধরনের 'সম্পদ'-এর যোগান হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে[129]। অর্থবিত্ত, ভালো চাকরি, সামাজিক পদমর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরুষদের জন্য খুব বড় ধরনের মেটিং ভ্যালু। কাজেই চাকরি হারানো কিংবা চাকরি না থাকার মানে সম্পদের যোগান বন্ধ। মেয়েরা সঙ্গী নির্বাচনের সময় চাকরিদার এবং সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিওয়ালা ছেলেদের পছন্দ করে। এগুলো না থাকলে মেটিং ভ্যালু কমে আসবে। স্নাইডারের ক্ষেত্রে ঠিক এটিই ঘটেছিল। ব্যাপারটাকে সামাজিক স্টেরিওটাইপিং বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পুরুষদের জন্য চাকরিবাকরি না করে বেকার বসে থাকাটা কোনো অপশনই নয় বিয়ের বাজারে কিংবা এমনিতেই সামাজিকভাবে, কিন্তু বহু সমাজেই মেয়েদের জন্য তা নয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনের উদাহরণ টানি এ প্রসঙ্গে। স্বভাবে আমরা দুজনেই ঘরকুনো হলেও চাপে পড়ে আমাকে আর বন্যাকে মাঝেমধ্যেই কোনো দেশি পার্টিতে যেতে হয় এই আটলান্টায়। অনেক সময়ই নতুন কারো সাথে দেখা হয়, পরিচয়ের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—'ভাই আপনি কোথায় চাকরি করেন?' বন্যার ক্ষেত্রে ঠিক তা হয় না। তার দিকে প্রশ্ন আসে—'আপা/ভাবী, আপনি বাসায় থাকেন নাকি চাকরি করছেন?' এ থেকে বোঝা যায় নারীদের ক্ষেত্রে চাকরি না করাটা একটা অপশন মনে হলেও 'ভালো স্বামীর' ক্ষেত্রে তা হয় না কখনোই, তা তিনি যতই শখের বসে বইপত্তর লিখুন কিংবা ব্লগ করুন! সেজন্যই চাকরি না থাকলে একজন নারী যতটা না পীড়িত হয়, একজন পুরুষকে তার বেকার জীবন পীড়িত করে ঢের বেশি। তারা হয়ে উঠে হতাশাগ্রস্ত এবং সর্বোপরি এই ভঙ্গুর সময়টাতেই তারা সঙ্গী হারানোর ভয়ে

---

[129] এ ব্যাপারটি সঙ্গী নির্বাচনের মেটিং স্ট্র্যাটিজির সাথে জড়িত। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় দেখা গেছে সঙ্গী নির্বাচনের সময় সময় ছেলেরা সঙ্গীর দয়া, সততা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির গুণাবলীর পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুন্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়ারাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস। এনিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

হয়ে উঠে চিন্তিত এবং ঈর্ষান্বিত। জীববিজ্ঞানী রবিন বেকার এবং মার্ক বেলিস ইংল্যান্ডে চালানো তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, একজন বিবাহিত নারী যখন অন্য কোনো পুরুষের সাথে পরকীয়ায় জড়ায়, সেই পুরুষের চাকরির স্ট্যাটাস, প্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি তার বর্তমান স্বামীর চেয়ে সাধারণত বেশি থাকে[130]। অন্য আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৬৪ ভাগ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ তার সঙ্গীকে হত্যা করে যখন সে থাকে চাকরিবাকরিবিহীন একজন বেকার ভ্যাগাবন্ড[131]।

আমি যখন বইয়ের এই অংশটি লিখছিলাম, তখন একটি আলোচিত ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র এবং মিডিয়া ছিল আলোচনার তুঙ্গে। ঘটনাটি হলো—ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুমানা মঞ্জুর দেশে থাকাকালীন সময়ে তার স্বামী হাসান সাঈদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। আঁচড়ে কামড়ে নাক ঠোঁট গালের মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। রুমানাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাংলাদেশ এবং ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েও লাভ হয়নি, রুমানার দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গেছে।

হাসান সাঈদের এই ‘পশুসুলভ’ আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। কী ভীষণ কুৎসিত মন মানসিকতা থাকলে শুধু সঙ্গীনীকে কেবল মারধোর নয়, রীতিমত নাক কান গাল কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া যায়, আঙুল ঢুকিয়ে চোখ উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়। পত্রপত্রিকা, ফেসবুক আর ব্লগে চলছিল আলোচনা, প্রতিবাদের ঝড়। কেউ দুষছেন পুরুষতন্ত্রকে, কেউ বা ধর্মকে, কেউ বা আবার দোষারোপ করছেন দেশের আইন-কানুনকে। আবার কিছু মহল থেকে তাকে পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও

[130] R. R. Baker,, &, M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity. London: Chapman & Hall,1995.
[131] P. Easteal, Killing the Beloved: Homicide Between Adult Sexual Intimates, AIC, 1993.

হয়েছে।



চিত্র: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুমানা গত ৫ জুন স্বামী হাসান সাঈদের মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হন।

না হাসান সাঈদ পাগলছাগল কিছুই নন, বরং বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তিনি নারীর কাছে মেটিং ভ্যালু কমে যাওয়া একজন হীনম্মন্য ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষ—যার শকুনাচরণ ক্রমশ রূপ নিয়েছিল নিষ্ঠুর পুরুষালি সহিংসতায়। সাঈদ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সে বুয়েটের পড়ালেখা সে শেষ করতে পারেনি, ইটের ভাটি সিএনজি-সহ বিভিন্ন ব্যবসায় হয়েছে ব্যর্থ। সম্প্রতি শেয়ারেও খেয়েছে লোকসান। অন্যদিকে রুমানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল শিক্ষিকা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের শেষ পর্যায়ে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে রুমানার মেটিং ভ্যালুর পারদ সাঈদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বগামী। সত্য হোক মিথ্যে হোক সাথে যোগ হয়েছিল ইরানি যুবক তাহের বিন নাভিদ কেন্দ্রিক কিছু 'রসালো' উপাখ্যান। সঙ্গী হারানোর ভয়ে ভীত এবং ঈর্ষান্বিত সাঈদ ঝগড়া বিবাদ কলহের স্তর পার হয়ে একদিন নরপশুর মতোই ঝাপিয়ে পড়েছে রুমানার উপর। হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে তার দেহ করে ফেলেছে ক্ষতবিক্ষত।

মুক্তমনায় লীনা রহমান ‘রুমানা মঞ্জুর ও নরকদর্শন’ শীর্ষক একটি চমৎকার লেখা লিখেছেন[132]। লেখাটিতে সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ যেগুলো নারীকে অবদমনের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো নিয়েও প্রাণবন্ত আলোচনা ছিল। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বস্তুত লীনার লেখাটির সাথে সামগ্রিকভাবে একমত হয়েও লেখাটির মন্তব্যে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম—

> রুমানার উপর অত্যাচারের পেছনে ধর্মের ব্যাপারটা কতটুকু জড়িত তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার। ধর্মের কারণে যে অত্যাচার হয় না তা নয়, অনেকই হয়, তবে রুমানার ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়েও প্রবলতর ব্যাপারটি হচ্ছে পুরুষালি জিঘাংসা। নারী যখন স্বাবলম্বী হয়ে উঠে, শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক দিক দিয়ে তার সঙ্গীকে ছাড়িয়ে যায়, বহু পুরুষই তা মেনে নিতে পারে না। উচ্চশিক্ষায় রুমানার সফলতা সাঈদের ক্ষেত্রে তৈরি করেছে এক ধরনের হীনম্মন্যতা, ঈর্ষা আর জিঘাংসা। তারই শিকার রুমানা।

আমার বিশ্লেষণ যে ভুল ছিল না, তা দেখা গিয়েছে জনকণ্ঠে (১৮ই জুন ২০১১) প্রকাশিত প্রাথমিক রিপোর্টে। রিমান্ডের প্রথম দিনেই সাঈদ স্বীকারোক্তি দিয়েছিল— ‘নিজ হীনম্মন্যতা থেকেই রুমানার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছি’[133]।

---

[132] লীনা রহমান, রুমানা মঞ্জুর ও নরকদর্শন, জুন ২০th, ২০১১, মুক্তমনা

[133] নিজ হীনম্মন্যতা থেকেই রুমানার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছি : রিমান্ডের প্রথম দিনে সাইদের স্বীকারোক্তি, দৈনিক জনকণ্ঠ রিপোর্ট, ১৮ জুন ২০১১



চিত্র:
দু চোখ হারানো রুমানা মঞ্জুর সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলছেন।

রুমানা এপিসোডের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই আলোচনায় আসবে। পুলিশের হাতে দশ দিন পর্যন্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা এই তথাকথিত স্বামী রত্নটি রুমানার চরিত্র হননে নেমেছিল। ফাঁদা হয়েছিল মিথ্যে প্রেমিকের সাথে এক রসালো গল্প। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো এগুলো রসালো চাটনির মতোই পরিবেশন করেছে। রাতারাতি কিছু মানুষের সমর্থনও কুড়াতে সক্ষম হলেন সাঈদ। অনেকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করলেন 'এক হাতে তালি বাজে না'। নিশ্চয়ই কোনো গড়বড় ছিল। পরে অবশ্য সাঈদ নিজেই স্বীকার করেছিল যে, রুমানার পরকীয়ার গল্পগুলো বানানো, মিথ্যা। আমরা আগেও দেখেছি এ ধরনের ক্ষেত্রে পুরুষদের একটাই অস্ত্র থাকে নির্যাতিত মেয়েটিকে যে কোনো ভাবে 'খারাপ মেয়ে' হিসেবে প্রতিপন্ন করা। সেই যে—ইয়াসমিনকে ধর্ষণ করেছিল পুলিশেরা। এর পরদিন পুলিশেরা যুক্তির জাল বুনে বলেছিল—ইয়াসমিন বেশ্যা, খারাপ মেয়ে। যেন খারাপ মেয়ে প্রমাণ করতে পারলে খুন ধর্ষণ, চোখ খুবলে নেওয়া—সব জায়েজ হয়ে যায়! আসলে সত্য কথা হলো সাঈদ বুঝতে পেরেছিল খারাপ মেয়ে প্রমাণ করতে পারলে 'পুরুষতন্ত্র'কে সহজেই হাতে রাখা যায়। ওটাই ছিল সাঈদের তখনকার 'সারভাইভাল স্ট্র্যাটিজি'। সেজন্যই আমরা দেখলাম যে, রুমানাকে নিয়ে আগে বলা পরকীয়ার ব্যাপারগুলো সাঈদ নিজ মুখে অস্বীকার করার আগ পর্যন্ত বেশ কিছু মানুষের সহানুভূতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন সাঈদ। বাজারি পত্রিকা পড়ে তৈরি হওয়া জনমতের একটি বড়ো অংশ সাঈদ দোষ স্বীকারের আগ পর্যন্ত ক্রমাগত

সন্দেহের তীর হেনেছে রুমানা মঞ্জুরের দিকে। শুধু পুরুষেরা নয়, এমনকি অনেক নারীও রুমানার প্রতি সন্দেহের ‘অনেক আলামত’ পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে কিন্তু বোঝা যায় পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা কেবল পুরুষদেরই আচ্ছন্ন করেনি, দীর্ঘদিনের কালিক পরিক্রমায় এটি অসংখ্য নারীর মানসপটেও রাজত্ব করেছে এবং এখনও করছে ।

হ্যাঁ পুরুষতন্ত্রকে কষে গালি দেয়া সহজ, কিন্তু কেন পুরুষতন্ত্রের মানসপট এভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা তেমন সহজ নয়। সহজ নয় এটি বিশ্লেষণে আনা যে পরকীয়া শুনলেই কেন জনচেতনার সহানুভূতিতে আঘাত লেগে যায়, সবাই মরিয়া হয়ে উঠে তার বিপরীতটা প্রমাণ করতে। রুমানার কলঙ্কের কাউন্টার হিসেবে রুমানা কত নিষ্কলঙ্ক আর সতী-সাধ্বী মেয়ে সেটা প্রমাণ করতে আবার কিছু পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করল—রুমানা কত মৃদুভাষী ছিলেন, তিনি দিনে পাঁচবেলা নামাজ পড়তেন, মাথায় কাপড় দিয়ে কানাডার প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করতেন, সেখানে প্রতিবেশীদের সাথে কত মিষ্টি ব্যবহার তিনি করতেন, কত ভালো রান্না করে তাদের খাওয়াতেন, বিদেশ বিভুঁইয়ে কত ভালোভাবে ইসলামি মতাদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন, অন্য ছেলেদের সাথে তেমন মিশতেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষেই কানাডা থেকে স্বামী সন্তানকে ফোন করার জন্য ছুটে আসতেন, বাইরে একদমই বেরুতেন না ইত্যাদি। এ সবকিছুই আসলে সেই চিরচেনা মানসপটকে তুলে ধরে—নারীকে গড়ে উঠতে হবে পুরুষদের বানানো ছকে—কথায়বার্তায় হয়ে হবে মৃদুভাষী, চলনে-বলনে শান্ত-সৌম, মাথায় কাপড় টেনে চলতে হবে, স্বামী হীনম্মন্য কিংবা নপুংসক যাই হোক না কেন, তাকে নিয়েই থাকতে হবে, তার প্রতি থাকতে হবে সদা অনুগত। অনেকটা বাংলা সিনেমার এই গানটার মতো[134] —

[134] বধুবিদায় ছবির এ গানটি ইউটিউব থেকে শোনা যাবে এখানে - http://www.youtube.com/watch?v=<bSGPwVMn_E

আমি তোমার বধূ, তুমি আমার স্বামী
খোদার পরে তোমার আসন বড় বলে জানি...

পরকীয়া তো দূরের কথা, কোনো ধরনের অবিশ্বস্ততার আলামত পেলে খুন জখম কিংবা চোখ খুবলে নেওয়ার শাস্তিও সামাজিকভাবে লঘু হয়ে যায়। কারণ পুরুষেরা স্ত্রীদের অবিশ্বস্ততাকে প্রজননগতভাবে অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করে। যেহেতু পিতৃতন্ত্রের মূল লক্ষ্য থাকে 'সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তান উৎপাদন'সেজন্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জৈবিক এবং সামাজিক কারণেই স্ত্রীর পরকীয়াকে 'হুমকি' হিসেবে দেখা হয়। স্ত্রী পরকীয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয়ে গেলে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয় মান-সম্মান, সামাজিক পদপর্যাদা সহ বহু কিছুতেই। তিনি সমাজে পরিণত হন ইয়ার্কি ফাজলামোর বিষয়ে। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, অনেক দেশের জন্যই সত্য। এমনকি পাঠকেরা জেনে অবাক হবেন যে, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার টেক্সাসে এমন আইন চালু ছিল যে, অবিশ্বস্ততার আলামত পেয়ে স্বামী যদি স্ত্রীকে হত্যা করে তবে সেটি কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। প্রাচীন রোমে এমন আইন চালু ছিল যে, যদি স্বামীর নিজ গৃহে পরকীয়া বা ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটে, তবে স্বামী তার অবিশ্বস্ত স্ত্রী এবং তার প্রেমিকাকে হত্যা করতে পারবেন; ইউরোপের অনেক দেশে এখনও সেসব আইনের কিছু প্রতিফলন দেখা যায়[135]। তিভ, সোগা, গিসু, নয়োরো, লুয়িয়া, লুয়ো প্রভৃতি আফ্রিকান রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে ৪৬ শতাংশ হত্যাকাণ্ডই সংগঠিত হয় যৌনতার প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। একইভাবে, সুদান উগান্ডা এবং ভারতেও যৌন ঈর্ষা বা 'সেক্সুয়াল জেলাসি' হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হবার মূল কারণ বলে জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখনই স্বামী কোনো পরকীয়ার আলামত পেয়েছে, কিংবা স্ত্রী যখন স্বামীকে ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে তখনই সেই হত্যাকাণ্ডগুলো সংগঠিত হয়েছে। সাঈদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি স্বামীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরেই রুমানার ঝগড়াঝাটি

[135] Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988

চলছিলে। কলহের এক পর্যায়ে রুমানা উত্তেজিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে অপারগতাও প্রকাশ করেছিলেন। এরপর থেকেই মূলত রুমানাকে হত্যার পরিকল্পনা করে সাঈদ। ২১শে মে বেধড়ক মারধরের পর গলা টিপে রুমানাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এ সময় রুমানার চিৎকারে বাড়ির সবাই এগিয়ে গেলে সে যাত্রা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরে পরিবারের হস্তক্ষেপে তা মিটমাট হয়। তারপর কিছুদিন পরে রুমানার মা মেহেরপুরে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেলে ৫ই জুন আবারো হত্যার চেষ্টা চালায়। সে দিন সাঈদ রুমানাকে ঘরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এ সময় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রুমানার গলা টিপে ধরে। রুমানা সজোরে আঘাত করে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। এ সময় সাঈদের চোখের চশমা পড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে রুমানাকে বীভৎসভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গাল, নাক, মুখসহ স্পর্শকাতর স্থানে কামড়াতে থাকে। সাঈদ রুমানার নাকে কামড় দিয়ে ছিড়ে ফেলে। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে ...

হ্যাঁ, আমরা সবাই সাঈদের কৃতকর্মের শাস্তি চাই। কোনো সুস্থ মাথার মানুষই প্রত্যাশা করবেন না যে, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে সাঈদ অবলীলায় মুক্তি পেয়ে যাক, আর তৈরি করুক আরেকটি ভবিষ্যৎ-অপরাধের সুস্থিত ক্ষেত্র। বরং, তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তিই কাম্য। কিন্তু সমাজে যখন নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করে, যখন নৃশংসভাবে একটি নারীর গাল নাক কামড়ে জখম করা হয়, রাতারাতি চোখ খুবলে নেওয়া হয়, এর পেছনের মনস্তাত্বিক কারণগুলোও আমাদের খুঁজে বের করা জরুরি। আমাদের বোঝা দরকার কোনো পরিস্থিতিতে সাঈদের মতো লোকজনের আচরণ এরকম বিপজ্জনক এবং নৃশংস হয়ে উঠতে পারে। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই কিন্তু সেগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরির প্রত্যাশাতেই এটা দরকার।

সেক্সবম্ব

নীচের ছবি দুটো লক্ষ করুন।



কোন্ ছবিটিকে আপনার কাছে অধিকতর 'প্রিয়দর্শিনী' বলে মনে হয়? জরিপে অংশ নেওয়া অধিকাংশ পুরুষ এবং নারীই অভিমত দিয়েছেন ডান পাশেরটি—অর্থাৎ ২য় ছবিটিকে।

এবারে আরেকটু ভালো করে ছবি দুটো লক্ষ করুন। দেখবেন যে ছবি দুটো আসলে একই নারীর। আসলে আরও স্পষ্ট করে বললে একটি ছবি থেকেই পরের ছবিটি তৈরি করা হয়ছে, কম্পিউটারে একটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে। আর এটি প্রোগ্রাম করেছেন আইরিশ বংশদ্ভূত বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী ড. ভিক্টর জনস্টন[136]। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ১ম ছবির সাথে ২য় ছবির পার্থক্য আসলে সামান্যই। প্রথম ছবিটির নারীর চিকন ঠোঁটকে একটু পুরু করা হয়েছে ২য় ছবিতে, চিবুকের আকার সামান্য কমিয়ে দেয়া হয়েছে, চোখের গভীরতা একটু বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর তাতেই অধিকাংশ পুরুষের কাছে ছবিটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন?

বিজ্ঞানী ভিক্টর জনস্টন সহ অন্যান্য গবেষকদের মতে, পুরু ঠোঁট আসলে অধিক এস্ট্রোজেন জমা হয়ে মুখমণ্ডল নমনীয় থাকার লক্ষণ, আর অন্য দিকে সরু এবং চিকোনো চিবুক 'লো টেস্টোস্টেরন' মার্কার। এ ব্যাপারটা পুরুষদের কাছে পছন্দনীয়

---

136 VS Johnston, M Franklin. Is beauty in the eye of the beholder? Ethol. Sociobiol. 14: 183–99, 1993

কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো মোটা দাগে নারীর উর্বরাশক্তির বহিঃপ্রকাশ[137]। এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে উল্লেখ করেছিলাম—সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি কোনো বিমূর্ত ব্যাপার নয়। এর সাথে যৌন আকর্ষণ এবং সর্বোপরি গর্ভধারণক্ষমতার একটা গভীর সম্পর্ক আছে, আর আছে আমাদের দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথপরিক্রমার সুস্পষ্ট ছাপ। আমরা যখন কাউকে প্রিয়দর্শিনী বলে ভাবি, আমাদের অজান্তে আসলে সেই চিরন্তন উপলব্ধিটাই কাজ করে। আমাদের আদিম পূর্বপূরুষেরা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের সময় এস্ট্রোজেনের মাত্রা নির্ণয়ের কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি খুঁজে পায়নি, তাদের কাছে সঙ্গীর পরিষ্কার চামড়া, ঘন চুল, কমনীয় মুখশ্রী, প্রতিসাম্যময় দেহ, পিনোন্নত স্তন, সুডৌল নিতম্ব আর ক্ষীণ কটিদেশ ছিল গর্ভধারণ ক্ষমতা তথা উর্বরতার প্রতীক। তাদের কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই ছিল আদরণীয়। তারা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে বিপরীত লিঙ্গের এ সমস্ত দেহজ বৈশিষ্টেরই। যাদের এ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল তারাই সঙ্গী হিসেবে অধিকহারে নির্বাচিত হয়েছে, আর তারা প্রকারন্তরে অর্জন করেছে প্রজননগত সফলতা, আমরা তাদেরই বংশধর। তাই সঙ্গী নির্বাচনের সময় আমাদের মনেও খেলা করে যায় সেই একই ধরনের অভিব্যক্তিগুলো, যেগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল আসলে অনেক অনেক আগে প্লেইস্টোসিন যুগে—আমাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক সঙ্গী নির্বাচনের তাগিদে।

ঠিক একইভাবে মেয়েরাও লম্বা চওড়া সুদর্শন পুরষ পছন্দ করে, যাদের রয়েছে সুগঠিত চোয়াল, চওড়া কাঁধ আর প্রতিসম সুগঠিত দেহ। যেমন অভিনেতা ব্র্যাড পিট তার সুগঠিত দেহ, চওড়া এবং সুদৃঢ় চোয়ালের জন্য সারা পৃথিবীজুড়েই নারীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং সুদর্শন পুরুষ হিসেবে খ্যাত। কারণ, পুরুষের এ পুরুষালি বৈশিষ্ট্যগুলোই দীর্ঘদিন ধরে নারীদের কাছে নির্বাচিত হয়েছে এক ধরনের 'ফিটনেস মার্কার' হিসেবে, শিকারি সংগ্রাহক সমাজে এ ধরনের পুরুষেরা ছিল নারীদের কাছে অতিপ্রিয়, তারা ছিল স্বাস্থ্যবান, উদ্যমী, সাহসী, ক্ষিপ্র এবং গোত্রের নিরাপত্তা প্রদানে

[137] V S.Johnston, Female facial beauty: the fertility hypothesis. Pragmatics Cogn. 8: 107–22, 2000.

সফল। তারা অর্জন করতে পেরেছিল বহু নারীর সান্নিধ্য এবং পেয়েছিল প্রজননগত সফলতা। খুব সুচারুভাবে সেই অভিব্যক্তিগুলো নির্বাচিত হয়েছিল বলেই সেগুলো নারীদের মানসপটে রাজত্ব করে এখনও, তারা সুদর্শন পুরুষ দেখে আমোদিত হয়।



চিত্র: অভিনেতা ব্র্যাড পিট তার সুগঠিত দেহ, চওড়া এবং সুদৃঢ় চোয়ালের জন্য সারা পৃথিবী জুড়েই নারীদের কাছে আরাধ্য।

অন্যদিকে প্লেবয়, ভোগ কিংবা কসমোপলিটনের কভার গার্ল (বাংলা করলে বলা যায় 'মলাট সুন্দরী')-দের দিকে কিংবা ছবির জগতের নায়িকাদের তাকালে বোঝা যায় কেন পুরুষেরা তাদের দেখলে লালায়িত হয়ে উঠে। তাদের থাকে ক্ষুদ্র নাসিকা, চিকোনো চিবুক, বড় চোখ, পুরুষ্ঠ ঠোঁট। তাদের সবার বয়সই থাকে মোটামুটি ১৭ থেকে ২৫-এর মধ্যে—যেটি মেয়েদের জীবনকালের সবচেয়ে উর্বর সময় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। তাদের দেহ সৌষ্ঠব থাকে প্রতিসম। তাদের কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত থাকে ০.৭ এর কাছাকাছি। শুধু প্লেবয়ের মলাট সুন্দরী নয়, বড় বড় অভিনেত্রী এবং সুপার মডেলদের জন্যও ব্যাপারটা একইভাবে দৃশ্যমান। হলিউড অভিনেত্রী এবং একসময়ের বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের দেহের মাপ ৩২-

২৫-৩৪ অর্থাৎ প্রায় ০.৭৩ । এঞ্জেলিনা জোলির ০.৭২। জেনিফার লোপেজের ০.৬৭। বিপাশা বসুর ০.৭৬। আর মেরোলিন মনেরোর দেহের মাপ ছিল ৩৬-২৪-৩৪, মানে একদম খাপে খাপ ০.৭। নারীদেহের এই অনুপাতের একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে পুরুষের কাছে। দেখা গেছে, সারা দুনিয়া জুড়ে শোবিজের সাথে যুক্ত এই কাঙ্ক্ষিত নারীদের কোমর আর নিতম্বের অনুপাত সবসময়েই ০.৬ থেকে ০.৮ এর মধ্যে, বা আরও স্পষ্ট করে বললে ০.৭ এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। আমরা আগে অধ্যাপক দেবেন্দ্র সিংহের একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করেছিলাম, যে গবেষণা থেকে জানা গেছে , নারীর কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত ০.৬ থেকে ০.৮ মধ্যে থাকলে তা তৈরি করে সেই 'ক্লাসিক hourglass figure' যা সার্বজনীনভাবে পুরুষদের কাছে আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান! অধ্যাপক সিংহ ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'মিস আমেরিকা'দের মধ্যে এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্লেবয়ের নায়িকাদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখেছেন মিস আমেরিকাদের ক্ষেত্রে কোমর-নিতম্বের অনুপাত ছিল ০.৬৯ থেকে ০.৭২ এর মধ্যে, আর প্লেবয়ের নায়িকাদের ক্ষেত্রে ০.৬৮ থেকে ০.৭১ এর মধ্যে[138]। এ সমস্ত আদর্শদেহবল্লরীর

---

[138] অবশ্য দেবেন্দ্র সিংহের গবেষণার ব্যাপারটা আমার কাছেই ভুল মনে হয়। বিশেষত, বাংলাদেশের সিনেমার নায়িকাদের দেখলে মনে হয় না যে তাদের শরীরের মাপ দেবেন্দ্র সিংহের দেয়া গবেষণার সাথে মেলে। আমি এ নিয়ে মুক্তমনায় এ নিয়ে লেখার পর এক পাঠক ব্যাপারটি আমার নজরে এনে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের শোবিজের জন্য এই গবেষণা যে খুব একটা কাজের না তা মৌসুমী, শাবনূর, অঞ্জু ঘোষ সহ সব বাঙালি নায়িকাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়"। উত্তরে আমি বলেছিলাম, ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। আমার হাইপোথিসিস হলো— খাদ্যস্বল্পতার সাথে নায়িকাদের ফিগারের একটা সম্পর্ক আছে। আমার কাছে হুমায়ুন আজাদের একটি দুর্দান্ত প্রবচনই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা মনে হয়েছে—

> "ক্ষুধা ও সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে সব দেশে অধিকাংশ মানুষ অনাহারী, সেখানে মাংসল হওয়া রূপসীর লক্ষণ। এজন্যেই বাংলা ফিল্মের নায়িকাদের দেহ থেকে মাংস ও চর্বি উপচে পড়ে। ক্ষুধার্ত দর্শকেরা সিনেমা দেখে না, মাংস ও চর্বি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে" (— হুমায়ুন আজাদ, প্রবচনগুচ্ছ)

না ব্যাপারটা মোটেও ফাজলামো নয়। দেখুন চিন্তা করে – বাংলা সিনেমার দর্শক এখনো নিম্নমধ্যবিত্তই, যাদের প্রতিনিয়ত খাদ্যস্বল্পতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়। তাদের স্বপ্নের নায়িকারা একটু মোটাসোটাই হবেন আশা করা যায়। দেশের উচ্চমধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তরা খুব বেশি সিনেমা হলে যায় না। তাদের নাটকের নায়িকারা (সুবর্ণা, বিপাশা, শমি, আফসানা মিমি, প্রভা প্রমুখ)—এরা কিন্তু ঠিক অঞ্জু ঘোষদের আদলের নন, কিংবা ছিলেনও না।

অধিকারী নায়িকারা এক একজন সেক্সবম্ব, যাদের যৌনাবেদন পুরুষদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই আকাশ ছোঁয়া। আর, বলা বাহুল্য পুরুষদের মানসপটে এই উদগ্র আগ্রহ তৈরি হয়েছে ডারউইন বর্ণিত যৌনতার নির্বাচনের পথ ধরে।

কিন্তু সত্যই সেক্সুয়ালের সিলেকশনের মাধ্যমে সত্যিই সেক্সবম্ব তৈরি হয় নাকি? ব্যাপারটা হাতে কলমে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স। তবে মানুষের ক্ষেত্রে নয়, স্টিকেলব্যাক মাছের ক্ষেত্রে[139]। তার পরীক্ষাটি একধরনের অধিপ্রাকৃতিক উদ্দীপনার (supernormal stimuli) পরীক্ষা বলা যায়। অধ্যাপক ডকিন্স সহ অন্যান্য জীববিজ্ঞানীরা জানতেন যে, স্টিকেলব্যাক মাছের ক্ষেত্রে স্ত্রী মাছেরা যখন উর্বর সময় অতিক্রম করে তখন তাদের পেট হয়ে উঠে ডিমে ভর্তি গোলাকার, লালাভ টসটসে। পুরুষ মাছেরা তাদের দেখে লালায়িত হয়। ডকিন্স তার ল্যাবের একুরিয়ামে সাধারণ রূপালি মাছের পেট কৃত্রিমভাবে বড়, গোলাকার আর লালাভ করে দিয়ে কিছু 'ডামি মাছ' পানিতে ছেড়ে দিলেন। ব্যাস দেখা গেল পুরুষ স্টিকেলব্যাক মাছেরা পারলে হামলে পড়ছে সে সব মাছের ওপর। যত বেশি নিখুঁত, গোলাকার আর লালাভ পেট বানানো হচ্ছে, তত বাড়ছে পুরুষ মাছদের যৌনোদ্দীপনা। ডকিন্সের ভাষায় সেই ডামি মাছগুলো ছিল স্টিকেলব্যাক মাছের রাজত্বে এক একটি 'সেক্সবম্ব'।

আরও লক্ষ করলে দেখা যাবে, পশ্চিমা বিশ্বে খাদ্যস্বল্পতা নেই। বরং সেখানে ম্যাকডোনাল্ডস, বার্গার কিং-এর ফাস্ট ফুড সবচেয়ে সহজলভ্য আর কমদামি। সে সমস্ত খাবার নিয়মিত খেলে ওবিস হয়ে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক। সেখানে একটি মেয়েকে খুব কষ্ট করে ব্যায়ামট্যায়াম করে, ফাস্ট ফুডের তেল চর্বি এড়িয়ে, লেটুস, সালাদ খেয়ে নিজের ফিগার অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। পশ্চিমে তাই চিকনচাকন মানে কোমর আর নিতম্বের ০.৭ অনুপাতের মেয়েরাই সুন্দরী হিসেবে নির্বাচিত হবেন, কারণ তেল চর্বির অঢেল রাজত্বে চিকন থাকাটাই একটা বড় ফিটনেস মার্কার। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের যেখানে আহার জুটে না, সেখানে ফিটনেস মার্কার 'হাড়গিলগিলে' হওয়াটা যে হবে না তা বলাই বাহুল্য।

এমনকি আমেরিকাতেও নাকি অর্থনৈতিক মন্দার সময়গুলোতে একটু মোটাতাজা প্লেমেটদের আধিক্য চোখে পড়ে প্লে বয়ের ম্যাগাজিনগুলোতে। ব্যাপারটি উঠে এসেছে Terry Pettijohn এবং Brian Jungeberg-এর একটি গবেষণায় (সুত্র - Why men prefer heavier playmates in a recession - Times Online, March 13, 2009*প্ম

[139] Richard Dawkins, River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life, Basic Books, 1996

যে ব্যাপারটা স্টিকেলব্যাক মাছের ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হচ্ছে, মানুষের ক্ষেত্রেও কি সেটার সত্যতা বিভিন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে না? নারীদের সাম্প্রতিক 'ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট' সার্জারির হুজুগের কথাই ধরা যাক। এটা এমন এক ধরনের সার্জারি, যার মাধ্যমে নারীরা স্তনের আকার পরিবর্তন করে থাকেন। এ সার্জারিগুলো এক সময় কেবল পর্নোস্টাররাই করতেন, এখন হলিউড বলিউডের অভিনেত্রীদের কাছেও ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, এমনকি বাসার গৃহিণীরাও তা করতে শুরু করেছে। আমেরিকান সোসাইটি অব প্লাস্টিক সার্জন (ASPS)-এর তথ্য অনুযায়ী কেবল ২০০৩ সালেই আট মিলিয়ন মহিলা 'ব্রেস্ট ইম্পল্যান্ট' সার্জারি করেছে, যেটা আবার ২০০২ সালের চেয়ে শতকরা ৩২ ভাগ বেশি । খোদ আমেরিকাতে প্রতি বছর এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে দেড় লক্ষ নারী ব্রেস্ট ইম্পল্যান্ট করে থাকে[140]। এমন নয় যে ক্ষুদ্র স্তন তাদের কোনো দৈহিক সমস্যা করে। সার্জারির পুরো ব্যাপারটাই কেবল নান্দনিক (aesthetic), পুরুষদের যৌনোদ্দীপনাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের দেহকে সুন্দর করে উপস্থাপন, আর সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস বাড়ানো। স্টিকেলব্যাক পুরুষ মাছেরা যেমন বড়, গোলাকার আর লালাভ পেটওয়ালা স্ত্রী মাছদের জন্য লালায়িত হয়, ঠিক তেমনি মানবসমাজে দেখা গেছে পুরুষেরা সুদৃঢ়, গোলাকার আর পিনোন্নত স্তন দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে! পুরুষদের এই পছন্দ অপছন্দের প্রভাব পড়ছে আবার নারীদের আচরণে। এগুলো তারই প্রতিফলন। শুধু ব্রেস্ট ইম্পল্যান্টই নয়, সেই সাথে বোটক্স, ফেসলিফট, ঠোঁটের প্রস্থ বাড়ানো, চোখের ভুরু উঁচু করা, বাঁকা দাঁত সোজা করা, নাক খাড়া করা সহ সকল ধরনের প্লাস্টিক সার্জারির ক্রমবদ্ধমান জনপ্রিয়তা তৈরি করছে মানবসমাজে সেক্সবম্বের স্বপ্নীল চাহিদা!

প্লাস্টিক সার্জারির কথা বাদ দেই, সারা পৃথিবী জুড়ে স্নো, পাউডার লিপস্টিকের কী রমরমা ব্যাবসা। এই সব প্রসাধনসামগ্রীর মূল ক্রেতা কিন্তু মেয়েরাই। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি মিনিটে ১৪৮৪ টি লিপস্টিকের

[140] Nancy Etcoff, Survival of the Prettiest: The Science of Beauty, Anchor; 2000.

টিউব এবং ২০৫৫ জার 'স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট' বিক্রি হয়। আমরা এগুলোর যত সামাজিক ব্যাখ্যা প্রতিব্যখ্যা করি না কেন, কিংবা যত ইচ্ছে মিডিয়াকে দোষারোপ করি না কেন, এইধরনের ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকার হিসেব খুব সহজ সরল—পুরুষেরা মেয়েদের কাছ থেকে যথাসম্ভব তারুণ্য এবং সৌন্দর্য আদায় করে নিতে চায়। আবার মেয়েরাও বিপরীত লিঙ্গের সেই সঙ্গমী মননকে প্রাধান্য দিয়ে অব্যাহতভাবে সৌন্দর্যচর্চা করে যায়, তারা ত্বককে রাখতে চায় যথাসম্ভব মাখনের মতোন পেলব, ঠোঁটকে গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত; কারণ তারা দেখেছে এর মাধ্যমে স্টিকেলব্যাকের ডামি মাছগুলোর মতোই অনেক ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটিজিগতভাবে সঙ্গী নির্বাচন আর ধরে রাখায় সফল হওয়া যাচ্ছে।



চিত্র: পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি মিনিটে ১৪৮৪টি লিপস্টিকের টিউব এবং ২০৫৫ জার 'স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট' বিক্রি হয়।

এ তো গেল মেয়েদের সঙ্গমী মননের স্ট্র্যাটিজি। অন্যদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় আট বিলিয়ন ডলারের গড়ে ওঠা পর্নোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রি পুরুষদের 'সেক্সবস্ব' চাহিদার চরমতম রূপ বললে অত্যুক্তি হবে না। সারা দুনিয়া জুড়ে আট বিলিয়ন ডলারের

পর্নোগ্রাফি ব্যবসা টিকে আছে পুরুষের লালসা আর জৈবিক চাহিদাকে মূল্য দিয়ে। মেয়েরা কিন্তু কখনোই পর্নোগ্রাফির মূল ক্রেতা নয়, ছিলও না কখনো। ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট করা সিলিকোনো গার্লদের নিখুঁত দেহবল্লরী আর যৌনাবেদনময়ী মায়াবী নারীদের আকর্ষণে পুরুষেরা নিশিরাত জেগে থাকে কম্পিউটারের সামনে। পর্নোগ্রাফি দেখা কোনো সত্যিকার যৌনসঙ্গম নয়, তারপরেও পর্নোভিডিও পুরুষদের নিয়ত উত্তেজিত করে তুলে অনেকটা স্টিকেলব্যাক মাছের মতোই যেন। স্টিকেলব্যাক মাছের পুরুষ মাছেরা যেমনিভাবে লালাভ পেটওয়ালা ডামি মাছ থেকে কামার্ত হয়ে পড়েছিল ডকিন্সের ল্যাবে একুরিয়ামের ভেতর, ঠিক তেমনি মানবসমাজের 'পুরুষ মাছেরা' একইভাবে কামার্ত হয়ে পড়ে কম্পিউটারের ভেতর ডামি মডেলদের নগ্নদৃশ্য দেখে! তার মানে, নিজেদের আমরা 'আশরাফুল মাখলুকাৎ' বা সৃষ্টির সেরা জীব ভেবে যতই আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করি না কেন, আমরা প্রাণিজগতের বাইরে নই, আমাদের মানসজগৎও তৈরি হয়েছে অন্য প্রাণীদের মতোই যৌনতার নির্বাচনের পথ ধরে, পর্নোগ্রাফি এবং সেক্সবম্বদের প্রতি পুরুষদের উদগ্র আগ্রহ সেই আদিম সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে।

ছেলেদের পুরুষাঙ্গের আকার এবং প্রকৃতি কি তবে মেয়েদের যৌনতার নির্বাচনের ফল?

প্রেম ভালোবাসা এবং যৌনতায় পুরুষের পুরুষাঙ্গ যে একটা আলাদা জায়গা দখল করে আছে, তা আর নতুন করে বলে দেবার বোধ হয় দরকার নেই। কিন্তু যেটা অনেকের কাছেই অজানা তা হলো, বহু নারী গবেষকই তাদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা থেকে ইঙ্গিত করেছেন ভালো যৌনসম্ভোগের জন্য পুরুষাঙ্গের আকার সম্ভবত খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়[141]। কিন্তু তারপরেও বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে

---

[141] উদাহরণ হিসেবে, স্নায়ুবিজ্ঞানী Louann Brizendine [illegible] The Male Brain [illegible], "When it comes to sex, size is less important than men think… 85% women say that they are happy with their partner's [penis] size"

পৃথিবীতে অধিকাংশ পুরুষই তার পুরুষাঙ্গের আকার ‘ছোট’ ভেবে হীনম্মন্যতায় ভুগে থাকে। যেমন, গবেষক জে. লিভার ২০০৬ সালে ৫২৩১ জন পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন[142], প্রায় সকল পুরুষই প্রত্যাশা করে যে, তার পুরুষাঙ্গ আরেকটু বড় হলেই ভালো হতো। প্রতি এক হাজার জনে মাত্র দুজন অভিমত দিয়েছে পুরুষাঙ্গ ছোট হবার পক্ষে। আরেক গবেষক বি.ই. ডিলন এবং তার দলবল ২০০৮ সালে গবেষণায় দেখান যে, কৈশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সবসময়ই পুরুষদের জন্য পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্র আকার একটি বিশাল উদ্বেগের কারণ[143]। অনেক পুরুষই আছেন যারা সঙ্গীর সাথে প্রথম যৌন সম্পর্কের আগে এই ভেবে উদ্বিগ্ন থাকে যে, নগ্ন অবস্থায় তার ক্ষুদ্র পুরুষাঙ্গ দেখতে পেয়ে তার সঙ্গী নিশ্চয় যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু পুরুষেরা তার নিজের যন্ত্রটি নিয়ে যাই ভাবুন না কেন, মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রায় ৮৫ ভাগ নারী মনে করে তার সঙ্গীর পুরুষাঙ্গের আকার তার প্রত্যাশা এবং মাপমতোই আছে[144]!

সত্যি কথা হলো—পুরুষদের পুরুষাঙ্গের ‘ক্ষুদ্র’ আকার নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগার আসলে কোনো কারণ নেই। মানবসমাজে পুরুষদের পুরুষাঙ্গের গড়পড়তা আকার অন্যান্য প্রাইমেটদের চেয়ে ঢের বড়—সুপার সাইজ বলা যায়। আর এই ব্যাপারটা তৈরি হয়েছে নারীর যৌন অভিরুচিকে প্রাধান্য দিয়ে। জিওফ্রি মিলার তার ‘সঙ্গমী মনন’ গ্রন্থের size mattered অংশে পুরুষাঙ্গের আকার নিয়ে নারী বিজ্ঞানীদের সনাতন কিছু ধারণা খণ্ডন করে অভিমত দিয়েছেন, তারা যেভাবে পুরুষাঙ্গের আকারকে হিসেবের বাইরে রাখতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা আসলে এতোটা তুচ্ছ করার মতো নয়। যৌনতার নির্বাচনের মূল জায়গাটিতে আবারো ফেরত যাই। আমরা আগের একটি অংশে

আরেক নারী জীববিজ্ঞানী Lynn Margulis ল্যশ্লয় Mystery of Dance গ্রন্থে লিখেছেন, “Penis dimension is neither the major determinant of female sexual pleasure, nor is a big penis a guarantee for female pleasure”

[142] J. Lever, D.A. Frederick & L.A. Peplau, Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan. Psychology of Men & Masculinity, 7, 129-143, 2006

[143] BE Dillon, NB Chama, SC Honig. Penile size and penile enlargement surgery: A review. Int J Impot Res,20:519–29, 2008

[144] Louann Brizendine M.D., The Male Brain, Broadway; March 23, 2010

দেখেছিলাম নারীর পিনোন্নত স্তন, সুডৌল নিতম্ব আর ক্ষীণ ক'টিদেশের প্রতি পুরুষদের সার্বজনীন আকর্ষণের কথা, আমরা দেখেছি কীভাবে যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে পুরুষেরা মেয়েদের দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচিত করেছিল, কারণ সে বৈশিষ্ট্যগুলোই হয়ে উঠেছিল তাদের চোখে প্রজনন ক্ষমতা এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। এই যৌনতার নির্বাচন কিন্তু একতরফাভাবে হয়নি। আমরা আগেই বলেছি, যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করে পুরুষ যেমন গড়েছে নারীকে, তেমনি নারীও গড়েছে পুরুষের মানসপটকে এবং তার দেহজ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে। এক লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলোর আবেদন তৈরি করেছে আরেক লিঙ্গের চাহিদা।

অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মানবসমাজে পুরুষদের পুরুষাঙ্গের আকার এবং প্রকৃতি অনেকটাই নির্ধারিত হয়েছে নারীর যৌন চাহিদাকে মূল্য দিয়ে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোলামেলা আলোচনায় যাওয়া যাক। মানুষের কাছাকাছি প্রজাতির প্রাইমেট সদস্যদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ম্যান্ড্রিলদের গাঢ় গোলাপি রঙের অণ্ডকোষ আর লাল রঙের পুরুষাঙ্গ আছে। ভার্ভেট বানরদের নীল রঙের অণ্ডকোষের সাথে রক্তিম লাল বর্ণের পুরুষাঙ্গ আছে, ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে অবশ্য সেসব কিছুই নেই। সাদা চোখে মনে হতে পারে মানুষদের পুরুষাঙ্গ বোধ হয় সাদামাটা ম্যারম্যারে একটি অঙ্গ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, আসলে তা নয়। প্রাইমেটদের অন্য প্রজাতির তুলনায় মানব পুরুষাঙ্গ আকারে বড়, মোটা এবং অধিকতর নমনীয়। একটা তুলনামূলক হিসেব দেই। গরিলাদের বিপুল দেহের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এতবড় দেহ থাকলে কী হবে, তাদের পুরুষাঙ্গের আকার পূর্ণ উত্থিত অবস্থাতেও মাত্র দুই ইঞ্চির বেশি হয় না। শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে সেটি মাত্র তিন ইঞ্চি। আর মানুষের ক্ষেত্রে উত্থিত পুরুষাঙ্গের আকার গড়পড়তা পাঁচ ইঞ্চি । সবচেয়ে বড় পুরুষাঙ্গের আকার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় পাওয়া গিয়েছে প্রায় তের ইঞ্চি, যা গড়পড়তা দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণেরও বেশি। আর তার চেয়েও বড় কথা হলো, মানব পুরুষাঙ্গের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে, যা অন্য প্রাইমেট বর্গদের থেকে একদমই আলাদা। অন্য

প্রাইমেট প্রজাতিতে যেখানে পুরুষাঙ্গে একটি হাড় আছে যেটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যাকালাম (baculum) বলে অভিহিত করা হয় সেটি মানব লিঙ্গে একেবারেই অনুপস্থিত। সেজন্য বিশেষ এই মানব প্রত্যঙ্গটি হয়েছে অন্য প্রাইমেটদের তুলনায় অনেক বেশি নমনীয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী জিওফ্রি মিলার তার গবেষণায় দাবি করেছেন অন্য প্রাইমেটদের পেন্সিল সদৃশ রোগা পুরুষাঙ্গের তুলনায় মানব পুরুষদের দীর্ঘ, চওড়া এবং হাড়বিহীন নমনীয় পুরুষাঙ্গ তৈরি হয়েছে মূলত নারীর সার্বিক চাহিদাকে মূল্য দিয়ে[145]। মিলার তার 'সঙ্গমী মনন' (The Mating Mind) বইয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন এ ধরনের পুরুষাঙ্গ নারীরা পছন্দ করেছে কারণ এটি মেয়েদের চরম পুলক (অর্গাজম) আনয়নে সহায়তা করেছে, এটি হয়েছে তাদের জন্য প্রচণ্ড রকমের আনন্দের উৎস, এবং তাদের ক্রমিক চাহিদা তৈরি করেছে উন্নত পুরুষাঙ্গ গঠনের নির্বাচনী চাপ[146]। অন্য কিছু গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণাতেও এই দাবির স্বপক্ষে কিছুটা সত্যতা মিলেছে বলে দাবি করা হয়[147]।

কান টানলে নাকি মাথা আসে। তাই পুরুষাঙ্গের আকারের কথা বলার সাথে সাথে অণ্ডকোষের আকার নিয়েও কিছু কথা এখানে চলে আসবে। পাঠকদের কী মনে হবে জানি না, পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু খুবই আকর্ষণীয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষের আকারের সাথে বহুগামিতা কিংবা অবিশ্বস্ততার একটা সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। সে ব্যাপারটিতে যাওয়ার আগে আমাদের কাছাকাছি প্রজাতিগুলো থেকে কিছু মজার উদাহরণ হাজির করা যাক। আমরা সবাই চোখে না দেখলেও বই পত্র কিংবা 'কিং কং' জাতীয় মুভির মাধ্যমে বিশালকায় গরিলার আকার আয়তনের সাথে পরিচিত। একেকটি ব্রহ্মদৈত্য গরিলা আকারে

---

[145] G. F. Miller, (1998). How mate choice shaped human nature: A review of sexual selection and human evolution. In C. B. Crawford, & D. Krebs (Eds.), Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications (pp. 87−130). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

[146] Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature, Anchor, 2001.

[147] Paul Bloom, How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like, W. W. Norton & Company; 1st edition , 2010

ওজনে প্রায় সাড়ে তিনশ থেকে চারশ পাউন্ড ছাড়িয়ে যায়। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, দেহের আয়তনের সাথে তাল মিলিয়ে তার শুক্রাশয়ের আকারও হবে মাশাল্লা—ফুটবল না হোক, নিদেনপক্ষে হওয়া উচিত টেনিস বলের সাইজ। আসলে কিন্তু তা হয় না। এমন চারশ পাউন্ড ওজনের বৃহদাকার গরিলাদের শুক্রাশয়ের ওজন হয় মাত্র দেড় আউন্স। আর অন্যদিকে শিম্পাঞ্জিদের দৈহিক আকার কিন্তু অনেক ছোটখাট। কিন্তু সে তুলনায় তাদের শুক্রাশয়ের আকার অনেক বড়। মাত্র ১০০ পাউন্ড ওজনের একটি শিম্পাজির শুক্রাশয়ের ওজন প্রায় চার আউন্স! এ যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি! কিন্তু কেন এমন হলো?

এর কারণ লুকিয়ে আছে শিম্পাঞ্জি আর গরিলাদের সামাজিক সম্পর্কের পার্থক্যের মাঝে। দেখা গেছে শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে নারীরা হয় বহুগামী। তারা একই দিনে একাধিক পুরুষ শিম্পাঞ্জির সাথে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়। অধিক সংখ্যক পুরুষের সাথে যথেচ্ছাচার সম্ভোগের মাধ্যমে নারী শিম্পাঞ্জিরা প্রকারান্তরে নিশ্চিত করতে চায় যে, উৎকৃষ্ট জেনেটিক মাল-মশলাসম্পন্ন পুরুষের দ্বারাই যেন তার ডিম্বাণুর নিষেক ঘটে। কিন্তু নারী শিম্পাঞ্জির এই ধরনের অভিরুচির কারণে পুরুষ শিম্পাঞ্জির জন্য ‘বংশ রক্ষা’ হয়ে যায় মাত্রাতিরিক্ত কঠিন। তাদেরকে এক অসম বীর্য প্রতিযোগিতার (sperm competition) মধ্যে নামতে হয়। নারী শিম্পাঞ্জির যোনিতে গর্ভধারণ নিয়ে বিভিন্ন পুরুষ শিম্পাঞ্জির শুক্রের মধ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে, সেই কারণে একটি পুরুষ শিম্পাঞ্জির পক্ষে কখনোই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না যে, যৌনসম্পর্ক হলেই তার নির্দিষ্ট বীর্য থেকেই নারী শিম্পাঞ্জিটি গর্ভধারণ করবে বা করছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায় যদি তার শুক্রাশয়ের আকার অপেক্ষাকৃত বড় হয়, আর তার শুক্রাশয় যদি সঙ্গমের সময় অঢেল শুক্রের যোগান দিতে সমর্থ হয়। শিম্পাঞ্জির এই বীর্য প্রতিযোগিতার লড়াইকে অনেকটা লটারি টিকেটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যত বেশি সংখ্যক লটারি টিকেট আপনার দখলে থাকবে তত বেশি সম্ভাবনা তৈরি হবে আপনার বিজয়ী হবার। আপনার যদি সামর্থ্য থাকে প্রায় সব লটারি টিকেট কোনোভাবে

করায়ত্ত করার, আপনার বিজয়ী হবার সম্ভাবনা পাল্লা দিয়ে বাড়বে। আদিতে হয়তো শিম্পাঞ্জিকুলে বড়, ছোট কিংবা মাঝারি—সব ধরনের শুক্রাশয়ওয়ালা পুরুষ শিম্পাঞ্জির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু শিম্পাঞ্জি নারীদের বহুগামিতার সাথে পাল্লা দিতে দিয়ে বড় শুক্রাশয়ওয়ালা শিম্পাঞ্জিরাই বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল, তারাই প্রতিযোগিতায় সফল গর্ভসঞ্চারের মাধ্যমে অধিক হারে সন্তানসন্ততি রেখে গেছে। এই নির্বাচনী চাপই শিম্পাঞ্জিকুলে ত্বরান্বিত করেছে বৃহৎ শুক্রাশয় গঠনের দিকে (গড়পড়তা শিম্পাঞ্জির শুক্রাশয়ের ওজন তার দেহের ওজনের ০.৩ ভাগ, এবং শুক্রাণু প্রক্ষেপণের সংখ্যা প্রতি বীর্যপাতে ৬০ $\times$ ১০^{৭})।

ঠিক উলটো ব্যাপারটি ঘটে গরিলাদের ক্ষেত্রে। নারী গরিলারা বহুগামী নয়। কেবল পুরুষ গরিলারা বহুগামী। শক্তিশালী পুরুষ গরিলারা বড় সড় হারেম তৈরির মাধ্যমে নিশ্চিত করে বহু নারীর দখল। এভাবে পুরুষ গরিলারা নিশ্চিত করে তাদের অধিনস্ত নারীর দেহে নিরাপদ গর্ভসঞ্চার। কাজেই পুরুষ গরিলাদের জন্য ব্যাপারটা কখনোই পুরুষে পুরুষে বীর্য প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ হয়ে উঠে শক্তিমত্তার প্রতিযোগিতা। শক্তিশালী পুরুষ গরিলারা স্বীয় শক্তির মাধ্যমে অধিকাংশ নারীর দখল নিয়ে নেয়, অধিকাংশ শক্তিহীনদের জন্য পড়ে থাকে দুর্ভাগ্য। সামাজিক অবস্থানের কারণেই গরিলাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী চাপ তৈরি করেছে বড়সড় দেহ সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেহগঠনের, বৃহৎ শুক্রাশয় তৈরির দিকে নয়। গরিলাদের ক্ষেত্রে বৃহৎ শুক্রাশয় গঠনের কোনো উপযোগিতা নেই। নারী পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের কারণেই গরিলাদের ক্ষেত্রে দেহ অনুপাতে শুক্রাশয়ের আকার অনেক ছোট (শুক্রাশয়ের ওজন দেহের ওজনের ০.০২ ভাগ, এবং শুক্রাণু প্রক্ষেপণের সংখ্যা প্রতি বীর্যপাতে ৫ $\times$ ১০^{৭})।

আপনার মাথায় নিশ্চয় এখন ঘুরতে শুরু করেছে—গরিলা আর শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মানবসমাজের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা কী রকম? এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান হলো গরিলা আর শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি (শুক্রাশয়ের ওজন

দেহের ওজনের ০.০৪-০.০৮ ভাগ এবং শুক্রাণু প্রক্ষেপণের সংখ্যা প্রতি বীর্যপাতে ২৫ $\times$ ১০^{৭}), যদিও গবেষকদের অনেকেই রায় দিয়েছেন শুক্রাশয়ের গতি প্রকৃতি কিছুটা শিম্পাঞ্জির দিকে একটু বেশি করে ঝুঁকে রয়েছে। মানবসমাজে পুরুষমানুষদের শুক্রাশয়ের আকার গরিলাদের মতো এত ছোট নয়, ফলে ধরে নেওয়া যায় যে, মানবসমাজে নারীরা শতভাগ একগামী মনোভাবাপন্ন নয়। আবার শুক্রাশয়ের আকার পুরুষ শিম্পাঞ্জিদের শুক্রাশয়ের মতো এত বড়সড়ও নয়—ফলে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, মানবসমাজে নারীরা আবার শতভাগ নির্বিচারী বহুগামীও হবে না। মানুষের মধ্যে একগামিতা যেমন আছে তেমনি বহুগামিতার চর্চাও। মানুষ নামের এই প্রাইমেটের এই স্পিশিজটির অধিকাংশ সদস্যই 'বিবাহ নামক ইন্সটিটিউশনের'মাধ্যমে মনোগামিতার চর্চাকে বৈশিষ্ট্য হিসেবে জ্ঞাপন করলেও এর মধ্যে আবার অনেকেই সময় এবং সুযোগমতো বহুগামী হয়, কাকোল্ড্রির চর্চা করে। অনেক ক্ষমতাবান পুরুষেরা (যেমন মহামতি আকবর, চেঙ্গিসখান প্রমুখ) আবার অধিক নারীর দখল নিতে অনেকটা গরিলাদের মতোই 'হারেম তৈরি'করে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই 'সিরিয়াল মনোগামি' অর্থাৎ, একই সময়ে কেবল একজন সঙ্গীর সাথেই জীবন অতিবাহিত করে। নারীদের ক্ষেত্রেও বহুগামিতা ঠিক একই কারণে দৃশ্যমান এবং সেটা সকল সমাজেই। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অধিকাংশ নারীরাই নাকি বিয়ের আগে দু চারটি প্রেম-টেম করে শেষমেষ একটি স্বামী খুঁজে নিয়ে ঘর-সংসার করে, কদাচিৎ স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে পরকীয়া করে লুকিয়ে-ছাপিয়ে, কখনো বা একেবারেই নয়। পশ্চিমেও মেয়েরা বয়ঃসন্ধির পর থেকেই স্বাধীনভাবেই একাধিক 'ডেট' করে, তাদের মধ্য থেকেই যোগ্য সঙ্গীকে বেছে নেয়। কখনো বা সঙ্গী বাছার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে আজীবন, অনেকটা অধুনা পরলোকগত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের মতো। সেজন্যই জোয়ান এলিসন রজার্স তার "যৌনতা: প্রাকৃতিক ইতিহাস" (Sex: A Natural History) বইয়ে উল্লেখ করেছেন[148] —

পুরুষের অপেক্ষাকৃত বড় শুক্রাশয় এটাই ইঙ্গিত করে যে, নারীরা বিবর্তনের

---

[148] Joann Ellison Rodgers, Sex: A Natural History, W. H. Freeman, January 15, 2002

ইতিহাস পরিক্রমায় একগামী নয়, বরং বহুগামীই ছিল।

মানবেতিহাসের পথপরিক্রমায় নারীরা যে আসলে একগামী ছিল না, তা পুরুষদের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আকৃতি এবং সেই সাথে সঙ্গমের প্রকৃতি থেকেও তা কিছুটা আঁচ করা যায়। এ নিয়ে জৈব শরীরবৃত্তবিদ গর্ডন জি গ্যালপ এবং তার দলবলের একটি চমৎকার গবেষণা আছে[149]। 'মানব লিঙ্গ একটি বীর্য প্রতিস্থাপন যন্ত্র' (The human penis as a semen displacement device)—শিরোনামের এই গবেষণাপত্রে গবেষকদল দেখিয়েছেন, অন্য প্রাইমেটদের থেকে মানুষের পুরুষাঙ্গের গঠন কিছুটা আলাদা। ব্যাকালাম নামের হাড়টি যে আমাদের পুরুষাঙ্গে অনুপস্থিত, তা আমরা আগেই জেনেছি। এর বাইরে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (glans) সুচালো কীলকাকৃতির (wedge shaped)। লিঙ্গের অগ্রভাগের ব্যাস পুরুষাঙ্গের স্তম্ভের ব্যাসের চেয়ে খানিকটা বড় হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এবং স্তম্ভের সাধারণ তলে উদ্ভূত হওয়া 'করোনাল রিজ'-এর অবস্থান থাকে স্তম্ভের সাথে উলম্বভাবে। এ ছাড়া, সঙ্গম শুরুর পর থেকে বীর্যস্খলনের আগ পর্যন্ত যোনির অভ্যন্তরে পুরুষকে উপর্যপুরি লিঙ্গ সঞ্চালনের (repeated thrusting) প্রয়োজন হয়। কাজেই সুচালো কীলকসদৃশ লিঙ্গের অগ্রভাগের আকৃতি এবং সেই সাথে উপর্যপুরি লিঙ্গাঘাতের প্রক্রিয়া এটাই ইঙ্গিত করে যে, নারীর যোনির ভিতরে স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোনো পুরুষের শুক্রাণুর আগমন ঘটে থাকলে সেটাকে বিতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট। গ্যালোপের গবেষণাপত্রের ২৭৮ পৃষ্ঠায় সেটারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে[150] —

> If a female copulated with more than one male within a short period of time, this would allow subsequent males to "scoop out" semen left by others before ejaculating.

আরও একটি ব্যাপারেও নারীদের পরকীয়ার ভালোই আলামত পাওয়া গেছে।

---

[149] G.G. Gallup Jr. et al., The human penis as a semen displacement device, Evolution and Human Behavior 24, 2003, pp 277–289

[150] পূর্বোক্ত।

দম্পতিদের দীর্ঘদিন আলাদা করে রেখে এবং বহুদিন পরে সঙ্গমের সুযোগ করে দিয়ে দেখা গেছে এতে পুরুষের বীর্যপাতের হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। যত বেশি দিন যুগলকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখা হয়, পুনর্বার মিলনের সময় তত বেশি পাওয়া যায় শুক্রাণু প্রক্ষেপণের হার। দেখা গেছে যদি কোনো দম্পতির মধ্যে স্বামী স্ত্রী শতভাগ সময় জুড়ে একসাথে থাকে, তবে প্রতিবার সঙ্গমে গড়পড়তা ৩৮৯ মিলিয়ন শুক্রাণু প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যদি শতকরা ৫ ভাগ সময় জুড়ে দম্পতিরা একসাথে থাকে, তবে প্রতি প্রক্ষেপণে শুক্রাণুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭১২ মিলিয়নে - অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ! আসলে দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর মিলনের সময় স্পার্মের যোগান বেড়ে যায় কারণ, পুরুষেরা ভেবে নেয় যে বিচ্ছেদকালীন সময়টুকুতে স্ত্রীর পরকীয়া ঘটার কিছুটা হলেও সম্ভাবনা থাকে। অন্য কোনো পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী ধারণ করতে পারে এই সম্ভাবনা থেকেই বীর্য প্রতিযোগিতা বা স্পার্ম ওয়ার এ লিপ্ত হয় পুরুষটি তার অজান্তেই। প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে সে নিক্ষিপ্ত করে তার অঢেল শুক্রাণুর যোগান, এবং দাবি করে তার শুক্রের মাধ্যমে নারীর গর্ভধারণের কাঙ্ক্ষিত নিশ্চয়তা। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় নারীদের পরকীয়া এবং বহুগামিতার আলামত প্রচ্ছন্নভাবে আছে বলেই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর মিলনের সময় খুব প্রত্যাশিতভাবেই শুক্রাণুর সংখ্যা বেড়ে যায়।

যদি মানবসমাজে নারীরা অনাদিকাল থেকে বহুগামিতায় অভ্যস্থ না হতো, যদি একগামী সম্পর্কের বাইরেও অতিরিক্ত যুগল মৈথুনে (extra-pair copulations) কখনোই নিজেদের নিয়োজিত না করত, তাহলে পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কীলকাকৃতি হওয়ারও দরকার পড়তো না, প্রয়োজন হতো না সঙ্গমকালীন সময়ে উপর্যুপরি লিঙ্গাঘাতেরও[151]। দরকার ছিল না দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর মিলনের সময় শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধিরও। আসলে মানবসমাজে নারীর একগামিতার পাশাপাশি বহুগামিতার প্যাটার্নের একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য এগুলো। শুধু পুরুষের বিশেষ অঙ্গেই

[151] Baker, R. R., & Bellis, M. A. (1995). Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity. London: Chapman & Hall.

নয়, বহুগামিতার নিদর্শন রয়েছে নারীদের নিজেদের শরীরেও। সেটা জানতে হলে আমাদের নারীর চরম পুলক বা অর্গাজম সম্বন্ধে জানতে হবে।

পুলকিত মনন (অর্গাজমিক মাইণ্ড)

বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ এবং বিবর্তন বিজ্ঞানী স্টিফেন জে. গুল্ড মনে করতেন নারীর চরম পুলকের কোনো বিবর্তনীয় উপযোগিতা নেই[152]। এটা অনেকটা বিবর্তনের সাইড-ইফেক্ট—যাকে তিনি ডাকতেন স্প্যান্ড্রেল নামে। বড় বড় ইমারত তৈরি করার সময় দেখা যায় যে, দুটি খিলানের মাঝে স্প্যান্ড্রেল বাড়তি উপাদান হিসেবে এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়, ইমারতের কারিগরি নকশার প্রয়োজনে নয়, বরং উপজাত হিসেবে। এই স্প্যান্ড্রেলগুলো ইমারতকে মজবুত করতেও সাহায্য করে না, আরোপ করে না কোনো বাড়তি গুণাগুণ। কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই এগুলো কাঠামোতে উড়ে এসে জুড়ে বসে। যৌনসঙ্গমের সময় নারীর পুলকের ব্যাপারটাও গুল্ড মনে করতেন অনেকটা সেরকমেরই, যার স্বকীয় কোনো 'সার্ভাইভাল ভ্যালু' নেই; এটা স্রেফ বিবর্তনের উপজাত।

এভাবে ভাবার অবশ্য কারণ আছে। পুরুষদের জন্য পুলক বা অর্গাজম সরাসরি বীর্যপাতের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ বীর্যপাতের সময়টাতেই পুরুষেরা চরম পুলক অনুভব করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুলকের ব্যাপারটা সরাসরি প্রজননের সাথে যুক্ত থাকায় এ থেকে 'পুরুষালি অর্গাজমের' বিবর্তনগত উপযোগিতা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে তা নয়। নারীর চরম পুলকের সাথে গর্ভধারণের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কী—চরম পুলক ছাড়াও নারীর পক্ষে গর্ভধারণ সম্ভব, এবং সেটা অহরহই ঘটছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ নারী

---

[152] E.A. Lloyd, The Case of The Female Orgasm: Bias in the science of evolution. Cambridge MA: Harvard University Press, 2005
Also see, S.J. Gould, (1992). Male Nipples and Clitoral Ripples. In Bully for Brontosaurus: Further Reflections in Natural History. New York: W. W. Norton. pp. 124-138, 1992.

সঙ্গমের সময় সবসময়ই চরম পুলক লাভ করে, ৪৮ ভাগ নারী অধিকাংশ সময়, ১৯ ভাগ নারী জীবনের কখনো-সখনো, ১১ ভাগ নারী কদাচিৎ আর ৭ ভাগ নারী জীবনের কখনোই অর্গাজম অনুভব করে না[153]। অর্থাৎ, পুরুষদের অর্গাজমের ব্যাপারটা প্রচ্ছন্ন হলেও মেয়েদেরটা রহস্যময়, জটিল এবং অনেকসময় সাগরতীরে মৎস্যকুমারীর দেখা পাওয়ার মতোই যেন অলভ্য।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই সনাতন স্প্যান্ড্রেল আর উপজাত তত্ত্বের বাইরে গিয়ে নারীর পুলকের বেশ কিছু বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা হাজির করেছেন বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা। জীববিজ্ঞানীরা আবার এর মধ্যে খেয়াল করেছেন যে, মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাইমেটদের নারীদের মধ্যেও চরম পুলকের অস্তিত্ব রয়েছে[154, 155]। ব্যাপারটা সত্যি হয়ে থাকলে নারী অর্গাজমের বিবর্তনগত উপযোগিতা থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

বহু বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানী অভিমত দিয়েছেন যে, এই প্রক্রিয়ায় আসলে নারীরা তাদের অজান্তেই পুরুষদের বীর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে, এবং অর্গাজমের জটিল অথচ মায়াবী প্রক্রিয়ায় যোগ্য কিংবা সঠিক পুরুষটিকে বাছাইয়ের কাজ করে ফেলে। অর্গাজমের সময় একটি নারীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠে, হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যায়, মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বের হতে থাকে, মাংশপেশীর সংকোচন বা খিঁচুনির মতো অবস্থা ঘটে, কারো কারো ক্ষেত্রে হয় হ্যালুসিনেশন বা অলীক দর্শন[156]। নারীর ভেতরে চলা এই জটিল এবং রহস্যময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী সনাক্ত করে নেয় তার কাঙ্ক্ষিত 'মিস্টার রাইট'কে। সে হিসেবে চিন্তা করলে অর্গাজম আসলে নারীর এক ধরনের 'মেট সিলেকশন ডিভাইস' বা সঙ্গী নির্ণায়ক যন্ত্র। নিউইয়র্ক টাইমসের খ্যাতনামা বিজ্ঞান লেখিকা ন্যাটালি

---

153 Carol Tavris & Susan Sadd, The Redbook Report on Female Sexuality, New York: Delacorte, 1977

154 AK Slob, and JJ van der Werff ten Bosch. Orgasm in non-human species. In Proceedings of the First International Conference on Orgasm, pp. 135-149, 1991.

155 Alan F. Dixon, Primate Sexuality. Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes, and Human Beings, Oxford University Press, Oxford, 1998

156 Louann Brizendine M.D., The Female Brain, Broadway; March 23, 2006

এঞ্জিয়ার সেজন্যই তার একটি বইয়ে লিখেছেন[157] —

> নারীর পুলক হচ্ছে নারী অভিরুচি বাস্তবায়নের এক চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। ... এটা নারীর মতো করে গোপন বিতর্কের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেওয়ার একটি সচেতন প্রক্রিয়া।

নারীর পুলকের সময় জরায়ুসহ বিভিন্ন মাংশপেশীর অবিরত সংকোচন ঘটে চলে। বিজ্ঞানীরা বলেন এই সংকোচন ঘটার পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে। এই জরায়ুর মাংশপেশী সংকোচনের মাধ্যমে একটি নারী নিশ্চিত করে যে, জরায়ুর গ্রীবাদেশীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (cervical mucus barrier) অতিক্রম করে সে যেন শুক্রাণুকে নিজের দেহভ্যন্তরে পুরোপুরি টেনে নিতে পারে। আমি একটি প্রকাশিত কেস স্টাডি থেকে এমন ঘটনার সন্ধানও পেয়েছি যে, অর্গাজমের চাপে একটি পুরুষের কন্ডম পর্যন্ত ভিতরে শুষে নিয়েছিল একটি নারীর দেহ, পরবর্তী অনুসন্ধানে কন্ডমটি পাওয়া গিয়েছিল নারীটির সার্ভিকাল ক্যানালের সরু পথে আটকে যাওয়া অবস্থায়[158]। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, অর্গাজম বা নারী পুলকের মূল লক্ষ্য থাকে শুক্রাণুকে যতদূর সম্ভব ডিম্বাণুর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া, এর ফলে বৃদ্ধি পায় গর্ভধারণের সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানীরা এটাও দেখেছেন যে, নারীর অর্গাজম হলে সে যে পরিমাণ শুক্রাণু নিজের অভ্যন্তরে ধারণ করে, অর্গাজম না হলে তার চেয়ে অনেক কম শুক্রাণু সে তার মধ্যে ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ অর্গাজম হলে নারীর নিজের অভ্যন্তরে শুক্রাণুর ধারণ ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়[159]। যেমন, দেখা গিয়েছে— স্বাভাবিক অবস্থায় একটি নারী সাধারণত সঙ্গমের পর মোটামুটি ৩৫ ভাগ শুক্রাণু নিজ দেহ থেকে বের করে দেয়। কিন্তু নারীর অর্গাজম হলে সে প্রায় সত্তুর ভাগ স্পার্ম নিজের মধ্যে ধারণ

---

157 Natalie Angier, Woman: An Intimate Geography, Anchor; Reprint edition, 2000

158 I. Singer, "Fertility and the female orgasm." In Goals of Human Sexuality, London: Wildwood House., p 159–97, 1973

159 K Dawood, KM Kirk, JM Bailey, PW Andrews, NG Martin. Genetic and environmental influences on the frequency of orgasm in women, Twin Research and Human Genetics, 8(1): p 27-33, 2005.

করে, আর বের করে দেয় ৩০ ভাগ। তার মানে চরম পুলক না হবার অর্থ হলো, অধিকতর বেশি শুক্রাণুর বর্জন। এই সাক্ষ্যগুলো সেই 'স্পার্ম রিটেনশন' তত্ত্বকেই সমর্থন করে যার মাধ্যমে নারী অধিক সংখ্যক শুক্রাণুকে যোনি থেকে জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের দিকে টেনে নিয়ে প্রকারান্তরে নিশ্চিত করতে চায় সঠিক পুরুষকে দিয়ে নিজের গর্ভধারণের সম্ভাবনা।

এখন কথা হচ্ছে—সঠিক পুরুষটি কেমন হতে পারে যে কি না নারীকে নিয়মিত অর্গাজম উপহার দেবে? কোনো কিছু চিন্তা না করেই বলা যায় যে পুরুষটির একটি গুণ হতে পারে—সে দেখতে শুনতে হবে সুদর্শন। জীববিজ্ঞানের ভাষায় সুদর্শন পুরুষের মানে হচ্ছে প্রতিসম (symmetrical) চেহারা আর দেহের অধিকারী পুরুষ। কারণ বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায় নারীরা বুঝে নিয়েছে যে, প্রতিসম চেহারা এবং দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী পুরুষেরা স্বাস্থ্যবান, তাদের দেহ রোগ জীবাণুর আবাসস্থল নয়, অর্থাৎ মোটা দাগে তারা 'সুপেরিয়র জেনেটিক কোয়ালিটি'র অধিকারী। রান্ডি থর্নহিল স্টিভেন গেংস্টাডের গবেষণা থেকে দেখা গেছে, নারীদের পুলকের পৌনঃপুনিকতা এবং চরম পুলকানুভূতি আনয়নের ক্ষেত্রে সুদর্শন পুরুষেরাই অধিকতর বেশি সফল হয়ে থাকে[160]।

সুদর্শন পুরুষেরাও আবার সে ব্যাপারটি ভালো করেই জানে এবং বুঝে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুদর্শন পুরুষেরা খুব কম সময়ের মধ্যেই (shortest courtship) যে কোনো ভালোবাসার সম্পর্ককে যৌনসম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এও দেখা গেছে, পশ্চিমা দেশে সুদর্শন পুরুষেরা ডেট করার সময় গড়পড়তা প্রতি নারীর পেছনে কম সময় এবং অর্থ ব্যয় করে। শুধু তাই নয় সুদর্শন স্বামীরা অনেক বেশি হারে স্ত্রীদের প্রতারণা করে অন্য সম্পর্কে জড়ায়[161]।

---

[160] R. Thornhill, S. W. Gangestad, & R Comer Human female orgasm and mate fluctuating asymmetry. Animal Behaviour, 50, 1601-1615, 1995.

[161] Louann Brizendine, The Female Brain, Three Rivers Press, August 7, 2007

তবে নারী পুলক নিয়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটি বেরিয়ে এসেছে বিজ্ঞানী রবিন বেকার এবং মার্ক বেলিসের সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে। তাদের গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সমস্ত নারীরা পরকীয়ায় মত্ত, তাদের অর্গাজম অনেক বেশি হয়। মানে, নিয়মিত সঙ্গীর চেয়ে গোপন প্রেমিকের সাথে সঙ্গমে নারীর চরম পুলকের হার অনেক বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে। ব্রিটেনের ৩৬৭৯ জন নারীর উপর জরিপ চালিয়ে তারা দেখেছেন যে, তাদের ঋতুচক্রের সবচেয়ে উর্বর সময়গুলোতেই তারা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, যে সময়টাতে তাদের গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি[162]। এটাও দেখা গেছে যে, পরকীয়ারত নারীরা স্বামীর সাথে অনেক বেশি পুলক জালিয়াতি (fake orgasm) করে স্বামীদের আশ্বস্ত রাখতে চেষ্টা করে—সম্ভবত এই ধারণা দিতে যে, সে কেবল তার স্বামীর প্রতিই রয়েছে বিশ্বস্ত[163]।

নিঃসন্দেহে স্বামীদের জন্য কোনো সুসংবাদ নয় এটি। কিন্তু এ ব্যাপারগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের মেটিং স্ট্র্যাটিজি সব সময় স্বামীকে তুষ্ট করে 'যৌন বিশ্বস্ত' হয়ে চলার জন্য বিবর্তিত হয়নি, বরং বিস্তৃত হয়েছে কখনো সখনো উৎকৃষ্ট জিনের সন্ধানে নিজের প্রজনন সফলতাকে বাস্তিবায়িত করার জন্যও। মাথা নেড়ে যতই এটাকে অস্বীকারের চেষ্টা করা হোক না কেন, বিবর্তনের অমসৃণ যাত্রাপথে রয়েছে এর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম মনের গভীরে

ভালোবাসার কথা বললেই আমাদের সামনে সবার আগে হৃদয়ের কথা চলে আসে। বিদগ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকারা অহরহ 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' হয়ে ওঠে, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আসল সত্যটা হলো—বিজ্ঞানীরা বলেন, ভালোবাসার উৎস

---

162 R.R. Baker & M.A. Bellis, Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity, Springer, 1999

163 Louann Brizendine, The Female Brain, Three Rivers Press, August 7, 2007

হৃদয় নয়, বরং মস্তিষ্ক। শুধু তাই নয়, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী জিওফ্রি মিলারের মতে, মানুষের মস্তিষ্ক বা ব্রেন হচ্ছে এক ‘Magnificent Sexual Ornament’, যা যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ অভিরুচিকে মূল্য দিয়ে। মিলারের মতে মস্তিষ্কের প্রকৃতিও অনেকটা পুরুষাঙ্গের মতোই যৌননির্বাচনের ফসল। আমরা সে সমস্ত সঙ্গীর সাথেই থাকতে পছন্দ করি যাদের সাথে থেকে আমরা সুখী বোধ করি[164]। আর কার সাথে সুখী বোধ করব, তা নির্ধারণ করে আমাদের মস্তিষ্ক, হৃদয় নয়। আমরা যেমন স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন সঙ্গী পছন্দ করি, তেমনি পছন্দ করি এমন কাউকে যে রসিকতা বোঝে, প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারে রোমান্টিক এবং বিশ্বস্ত, শিল্প-সাহিত্য সংগীতের ব্যাপারে সমঝদার। আমরা এ ধরনের গুণাবলিগুলো পছন্দ করি কারণ বিপরীতলিঙ্গের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক অভিযোজিত হয়েছে আর আমাদের পছন্দ-অপছন্দ আর ভালোলাগাগুলো বিবর্তিত হয়েছে যৌনতার নির্বাচনের পথ ধরে। যৌনতার নির্বাচনই আমাদের মস্তিষ্কে তৈরি করেছে গান-বাজনা, নৃত্য-গীত, কাব্য, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যকর্ম, খেলাধুলা, বাগ্মীতা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ। যাদের মধ্যে এ গুণাবলি আমরা খুঁজে পাই, তারা অনেক সময়ই হয়ে ওঠে আমাদের পছন্দের মানুষজন।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, মস্তিষ্কের প্রকৃতি বদলে গেলে ভালোবাসার প্রকৃতিও বদলে যায়। এরকম একটি কেস স্টাডির কথা আমি সম্প্রতি পড়েছি পল ব্লুমের ‘হাও প্লেসার ওয়ার্ক্স’ বইয়ে। ১৯৩১ সালে নথিবদ্ধ এ ঘটনা থেকে জানা যায় এক মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে অহরহ অভিযোগ করতেন—তার সঙ্গী মোটেই পরিশীলিত নয়, কেমন যেন অদক্ষ চাষাভূষা টাইপের। বরদাস্তই করতে পারতেন না তিনি স্বামীকে একেবারে। কিন্তু কিছুদিন পরে কোনো এক রোগে কিংবা দুর্ঘটনায় মহিলাটির মস্তিষ্কের বড় একটা অংশ আহত হয়। দুর্ঘটনার পর স্মৃতিশক্তি ফিরে পাওয়ার পর তার সঙ্গী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছিল। যে লোকটাকে কিছুদিন আগেও

[164] Paul Bloom, How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like, W. W. Norton & Company; 2010)

অপরিশীলিত চাষাড়ে বলে মহিলার মনে হচ্ছিল, সেই সঙ্গী তার কাছে রাতারাতি আবির্ভূত হলেন "ধনবান, বুদ্ধিদীপ্ত, সুদর্শন এবং বর্ণাঢ্য" ব্যক্তি হিসেবে। সত্যি বলতে কী—যৌনাকর্ষণ এবং রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপারগুলো রয়ে যায় মস্তিষ্কের খুব গভীরে, মনের গহীন কোণে। মস্তিষ্কের আঘাত সেই মহিলাটিকে সুযোগ করে দিয়েছিল একেবারে নতুনভাবে শুরু করতে, ফলে তার চিরচেনা সঙ্গী তার কাছে আবির্ভূত হয়েছিল একেবারে নতুন মানুষ হিসেবে, অনেক পছন্দনীয় হিসেবে। অর্থাৎ, মস্তিষ্কের প্রকৃতি বদলে যাওয়ায় মহিলাটির ভালোবাসার প্রকৃতিও বদলে গিয়েছিল।

'A Midsummer Night's Dream' নাটিকায় শেক্সপিয়র উচ্চারণ করেছিলেন, 'Love looks not with the eyes but with the mind'। শেক্সপিয়র মিথ্যে বলেননি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তার একটি গানে যে কথাটি বলেছিলেন, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'; সেই কথাটিকেই সামান্য বদলে দিয়ে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বললে বলা যায়—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম মনের গভীরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে।।

আশা করছি রবীন্দ্রনাথের গানে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের কাঁচি চালানোয় রবীন্দ্রভক্তরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে যাবেন না। ভালোবাসার দাবি বলে কথা!

পঞ্চম অধ্যায়

নারী ও পুরুষ: দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা?

আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা আরও বলেন, ডারউইনের 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' বা 'যৌনতার নির্বাচন' বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট নির্মাণেও অবশ্যম্ভাবীরূপে পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী-পুরুষ একই মানবপ্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে এক ধরনের মনোদৈহিক পার্থক্য—জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। নারীদের জননতন্ত্রের প্রকৃতি পুরুষদের জননতন্ত্র থেকে আলাদা। মেয়েদেরকে যে ঋতুচক্র, নয়মাসব্যাপী গর্ভধারণসহ হাজারো ঝুট-ঝামেলা পোহাতে হয়—পুরুষদের সেগুলো কোনোটিই করতে হয় না। একটি পুরুষ, তাত্ত্বিকভাবে হলেও যে কোনো সময়ে এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য নারীর গর্ভে অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিতে পারে (কুখ্যাত চেঙ্গিস খানের মতো কেউ কেউ সেটা করে দেখিয়েছেও)। কিন্তু একটি মেয়ে এক বছরে শুধু একটি পুরুষের শুক্রাণু দিয়েই গর্ভ নিশ্চিত করতে পারে—এর বেশি নয়। আসলে কেউ যদি বলেন, জৈববৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে যৌনতার উদ্ভবই হয়েছে আসলে নারী-পুরুষে পার্থক্য করার জন্য—এটা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এই পার্থক্যের প্রভাব ছেলে মেয়েদের মানস জগতেও পড়েছে, পড়েছে সমাজেও। কোনো গবেষকই এখন অস্বীকার করেন না যে যৌনতার বিভাজন নারী পুরুষে গড়ে দিয়েছে বিস্তর পার্থক্য—শুধু দেহ

কাঠামোতে নয়, তার অর্জিত ব্যবহারেও। সেজন্যই গবেষক ডোনাল্ড সিমন্স বলেন,

> 'Men and women differ in sexual natures because throughout the immensely long haunting and gathering phase of evolutionary history of sexual desires and dispositions that were adaptive for either sex were for either sex were for the other tickets to reproductive oblivion.'।

মানব সভ্যতার যে কোনো জায়গায় খোঁজ নিলে দেখা যায়—ছেলেরা সংস্কৃতি নির্বিশেষে মেয়েদের চেয়ে চরিত্রে বেশি 'ভায়োলেন্ট' বা সহিংস হয়ে থাকে, মেয়েরা বাচনিক যোগাযোগে (ভার্বাল কমিউনিকেশন) ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিপক্ক হয়। 'পলিগামি' বা বহুগামিত্বের ব্যাপারটা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অধিকতর প্রবলভাবে দৃশ্যমান। সম্পর্কের মধ্যে প্রতারণা বা 'চিট্' ব্যাপারটাও কিন্তু মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি করে থাকে। আবার মেয়েরা প্রতারণা ধরতে অধিকতর দক্ষ।

আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু কিন্তু আলাদা। পুরুষের স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় হাজার হাজার, আর সে তুলনায় ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় কম। ডিম্বাণুর আকার শুক্রাণুর চেয়ে বড় হয় অনেক অর্থাৎ, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে স্পার্ম সহজলভ্য, তাই কম দামি, আর সে তুলনায় ডিম্বাণু অনেক মূল্যবান। 'স্পার্ম অনেক চিপ' বলেই (সাধারণভাবে) পুরুষদের একটা সহজাত প্রবণতা থাকে বহু সংখ্যক জায়গায় তার প্রতিলিপি ছড়ানোর। সেজন্য তথাকথিত আধুনিক একগামী সমাজেও দেখা যায় পুরুষেরাই বেশি প্রতারণা করে সম্পর্কে, আর আগেকার সময়ে রাজা বাদশাহদের হারেম রাখার কিংবা শক্তিশালী সেনাপতিদের যুদ্ধ জয়ের পর নারী অধিকারের উদাহরণগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। অপর দিকে 'এগ ভালুয়েবল' বলেই প্রকৃতিতে নারীরা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে থাকে অপেক্ষাকৃত খুঁতখুঁতে, কারণ তারা নিশ্চিত করতে চায় কেবল উৎকৃষ্ট জিনের দ্বারাই যেন তার ডিম্বাণুর নিষেক ঘটে। এ ছাড়া এর আগের অধ্যায়ে আমরা রবার্ট ট্রাইভার্সের 'অভিভাবকীয়

বিনিয়োগ’ (parental investment) অনুকল্পের সাথেও পরিচিত হয়েছি। যেহেতু নারীরা অভিভাবকীয় বিনিয়োগের সিংহভাগে জড়িত থাকে, তারা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে হয়ে উঠে অধিকতর হিসেবি এবং সাবধানী। সেজন্যই প্রকৃতিতে দেখা যায়, পুরুষ ময়ুর পেখম তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, ‘খুঁতখুঁতে’ ময়ূরী হিসেব নিকেশ করে নির্বাচন করে যোগ্যতম ময়ূরকেই তার সৌন্দর্যের ভিত্তিতে। পুরুষ কোকিল গান গেতে থাকে তাদের সুমধুর গলায়, ফ্রুট ফ্লাইরা নাচতে থাকে স্ত্রী মাছিদের প্রণয় লাভের জন্য, পুরুষ চিত্রল হরিণেরা সম্মোহিত করতে চায় তাদের বর্ণাঢ্য শিং এর যাদুতে, আর স্ত্রীরা নির্বাচন করে তাদের মধ্যে যোগ্য পুরুষটিকে।

মানবসমাজের দিকে তাকানো যাক। সাধারণভাবে বললে, একজন পুরুষ তার সারা জীবনে অসংখ্য নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে পারে। ইতিহাসে একজন পুরুষের সবচেয়ে বেশি সংখক সন্তানের হিসেব পাওয়া যায়—ব্লাড থার্স্টি মৌলে ইসমাইল-এর (১০৪২ জন সন্তান)। তাত্ত্বিকভাবে একজন পুরুষ গর্ভ সঞ্চার করতে পারে প্রতি মুহূর্তেই। অপরদিকে একজন নারী বছরে কেবল একটি সন্তানেরই জন্ম দিতে পারে। সে হিসেবে সাড়া জীবনে তার সন্তান সর্বোচ্চ ২০-২২টির বেশি হবার সম্ভাবনা নেই (যমজ সন্তানের হিসেব গোনায় আনছি না)। বিবর্তনীয় পটভূমিকায় দেখা গেছে নারীরা যদি ক্রমাগত সঙ্গী বদল করতে থাকলে তা আসলে কোনো প্রজননগত উপযোগিতা (reproductive benefit) প্রদান করে না। তার চেয়ে বরং সন্তানের দেখাশোনায় শক্তি বেশি নিয়োজিত করলেই বরং ভবিষ্যৎ জিন টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এই কারণেই নারীদের মধ্যে বহুগামিতা থাকে পুরুষদের তুলনায় কম। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, আদিম কিছু ট্রাইবে ভ্রাতৃয় বহুভ্রাতৃত্ব (fraternal polyandry), যেখানে সহোদর ভাইয়েরা মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো একজন পত্নীর অংশীদার - দুচারটি জায়গায় দৃশ্যমান হলেও অভ্রাতৃয় বহুভ্রাতৃত্ব (nonfraternal polyandry) পৃথিবীর কোথাওই সেভাবে দৃশ্যমান নয়।

পর্নোগ্রাফির প্রতি আকর্ষণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে বেশি, সেটা বোধ হয়

না বলে দিলেও চলবে। কিন্তু মেয়েরা আবার ছেলেদের তুলনায় ‘লাভ স্টোরি’র বেশি ভক্ত। সিরিয়াল কিলারের সংখ্যা ছেলেদের মধ্যে বেশি, মেয়েদের মধ্যে খুবই কম। সংস্কৃতি নির্বিশেষে পুরুষদের টাকা পয়সা, স্ট্যাটাস ইত্যাদির মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, আর মেয়েদের সৌন্দর্যের। নৃতত্ত্ববিদ মেলভিন কনোর খুব পরিষ্কার করেই বলেন—

> ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সহিংস আর মেয়েরা অনেক বেশি সংবেদনশীল—অন্তত শিশু এবং নাবালকদের প্রতি। এই ব্যাপারটা উল্লেখ করলে একে যদি ‘গতানুগতিক কথাবার্তা’ (cliché) বলে কেউ উড়িয়ে দিতে চান—সেটা এ সত্যকে কিছুমাত্র দমন করবে না।

ব্যাপারগুলো সঠিক নাকি ভুল, কিংবা ‘উচিত’ নাকি ‘অনুচিত’ সেটি এখানে বিচার্য নয়, বিচার্য হচ্ছে আমাদের সমাজ কেন এইভাবে গড়ে উঠেছে—যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মন-মানসিকতা একটি নির্দিষ্ট ছকে সবসময় আবদ্ধ থাকে? এখানেই মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান যতটা সফল, সমাজবিজ্ঞান ততটা নয়।

কেন সংস্কৃতি-নির্বিশেষে ছেলেরা সম্পর্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার সঙ্গীর সাথে বেশি প্রতারণা করে কিংবা কেন পর্নোগ্রাফির বেশি ভক্ত—এটি জিজ্ঞাসা করলে সমাজবিজ্ঞানী কিংবা নারীবাদীদের কাছ থেকে নির্ঘাত উত্তর পাওয়া যাবে যে, যুগ যুগ ধরে মেয়েদের সম্পত্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে, তারা শোষিত—এই মনোবৃত্তি তারই প্রতিফলন। কিন্তু যে সমস্ত সমাজে ছেলেমেয়েদের পার্থক্যসূচক মনোভাবের মাত্রা কম—সেখানে কী তাহলে এ ধরনের ঝোঁক নেই? না তা মোটেও নয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ইসরায়েলের কিবুৎজ (Kibbutz) শহরের একটি পরীক্ষামূলক গবেষণায়। সমাজে বিদ্যমান সমস্ত রীতি বা ট্যাবু আসলে জন্মগত নয়, বরং সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত—এই ধারণা থেকে সেখানকার অধিবাসীরা ঠিক করেছিল সমস্ত যৌনতার প্রভেদমূলক পার্থক্যকে ওই শহর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে। তার প্রক্রিয়া হিসেবে সেখানকার মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো ছোট ছোট চুল রাখতে

উৎসাহিত করা হলো, আর ছেলেদেরকে শেখানো হলো সহিংসতা ত্যাগ করে কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা যায়! যে সমস্ত মেয়েরা ‘টম বয়’ হয়ে জীবন কাটাতে চায়, তাদের পিঠ চাপড়ে সাধুবাদ জানানো হলো, ছেলেরা যেন ঘরের কাজ আর মেয়েরা যেন বাইরের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে সেজন্য যথাযথ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কিবুৎজ সে সময় গণ্য হয়েছিল আদর্শবাদীদের স্বর্গ হিসেবে—যেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। কিন্তু তিন প্রজন্ম পরে দেখা গেল সেই ‘আদর্শ’ কিবুৎজ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে সেক্সিস্ট বা যৌনবৈষম্যবাদী শহর হিসেবে। সেখানকার মানুষজন আদর্শবাদীদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে ফিরে গিয়েছিল সেই চিরন্তন গৎবাঁধা জীবনে। অভিভাবকদের আদর্শবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানেরা। ছেলেরা দেখা গেল, অভিভাবকদের দেখিয়ে দেয়া পথ অস্বীকার করে বেশি পদার্থবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত পড়তে শুরু করেছে, মেয়েরা বেশি যাচ্ছে মেডিকেলে। তারা নার্সিং-এ কিংবা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। ছেলেদের ঘরের কাজ করার যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল মেয়েরাই শেষপর্যন্ত ঘরদোর গোছানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। দায়িত্ব তুলে নেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে তারা বলল, ‘আরে ছেলেরা ঠিকমত বাসাবাড়ি পরিষ্কার রাখতে পারে না’। আর অন্যদিকে ছেলেরা বলল, ‘আরে যত ভালোভাবেই করি না কেন বউয়ের মর্জিমাফিক কিছুতেই হয় না’। ব্যাপারটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এ ধরনের বিভক্তিগুলোকে যতই অস্বীকার করে সাম্যের পথে সমাজকে ঠেলে দেয়া হয়, বিদ্যমান জৈববৈজ্ঞানিক পার্থক্যগুলো সে সমাজে তত প্রকট হয়ে উঠে। ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়।

চাহিদায় পার্থক্য, পার্থক্য মানসিকতাতেও

মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ করছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে

পড়ার মতোই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার প্রথম থেকেই ডারউইন বর্ণিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদি কাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিক হারে সন্তানসন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেই। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে পরিবার নিয়ে লং ড্রাইভিং-এ বেড়িয়ে কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে দেখে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর ল্যান্ডমার্ক, ম্যাপের দারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না। আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মম্ভরি' মানসিকতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসেবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু ড্রাইভিংই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোনো সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।



চিত্র: সমীক্ষায় দেখা গেছে ড্রাইভিং-এ বেরিয়ে কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে দেখে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে মানচিত্রের দারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না।

এদিকে পুরুষেরা যখন প্রতিযোগিতা, হানাহানি মারামারি করে তাদের 'পুরুষতান্ত্রিক' জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে (যুদ্ধ এবং হানাহানি নিয়ে এর পরের অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে), তখন অন্য দিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে 'সংসার গোছানোর'। গৃহস্থালির পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রহণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর মেয়েদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয় । ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পড়তা মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে অন্তত ১০০ গ্রাম বড় হয়, কিন্তু ওদিকে মেয়েদের ব্রেন ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিষ্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্তত ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি থাকে।

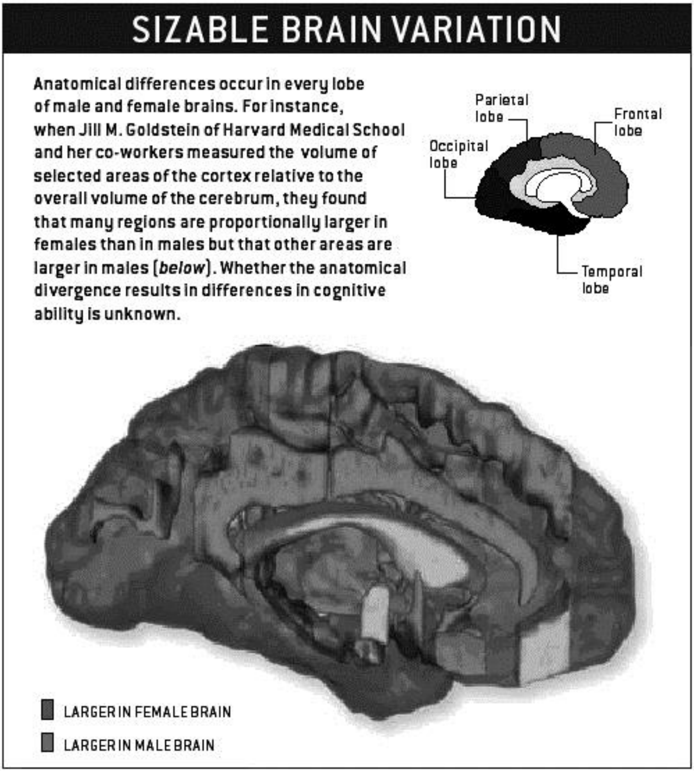
মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে[165]। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায়—একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মতো উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ-স্বল্পতা সহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরও পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে চার পাঁচটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই গুবলেট করে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই হান্টার—গ্যাদারার পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারি হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হতো, ফলে তাদের মানসজগৎ একটিমাত্র বিষয়ে 'ফোকাসড্' হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হতো, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে।

আরও কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিষ্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও। এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে

---

[165] একটি ব্যাপার এখানে পরিস্কার করা প্রয়োজন। বইয়ের এই অংশে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটি কোন লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। ছেলেদের মস্তিস্কের আকার বড় হবার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যে কোন কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। অতীতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথা টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের ভুল স্টেরিওটাইপিং এর চেষ্টা করা হয়েছিল। ছেলে আর মেয়েদের মস্তিস্কের গঠনে জৈববৈজ্ঞানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, যার কারণ বিবিধ। এইটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরাই মূল উপজীব্য।

বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পড়তা বিমূর্ত এবং 'স্পেশাল' কাজের ব্যাপারে বেশি সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশি বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে সাবলিল।



চিত্র: বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

হয়তো এজন্যই ছেলেরা অধিক হারে স্থাপত্যবিদ্যা কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার

পরও বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোনো সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং-এ, মেয়েরা যেমনিভাবে একটা 'গ্যারেজ মেকানিক' হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এটা কি কেবলই মেয়েরা শোষিত কিংবা পিছিয়ে পড়া বলে, নাকি বিবর্তনীয় 'সিলেকশন প্রেশার' তাদের মধ্যে অজান্তেই কাজ করে বলে?

সব টাকমাথা পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে সুন্দরী বউ দেখি কেন?

কলেজ জীবনে ক্লাস 'বাং মেরে' নিউমার্কেটে ঘুরার অভিজ্ঞতা আমাদের সময়কার বোধ হয় কমবেশি সব ছাত্রেরই আছে। আমারও ছিল পুরোমাত্রায়। একটা পুরো গ্যাং নিয়ে চলে যেতাম। ওই গ্যাং-এর একটা অংশ আবার সুন্দর মেয়ে দেখায় সদা ব্যস্ত থাকত। কিন্তু দেখলে কী হবে, পোড়া কপাল, যত বেশি সুন্দরী মেয়ে—তত বেশি টাক মাথা, বয়স্ক, হোঁদল-কুৎকুতে স্বামী নিয়ে ঘুরছে। শেষমেষ এমন হলো যে, টাকমাথা 'আবলুস বাবা' টাইপের কাউকে বলিউডের নায়িকাদের মতো মেয়ে নিয়ে ঘুরতে দেখলেই আমরা ধরে নিতাম—ব্যাটার হয় ম্যালা পয়সা, নইলে ব্যাটা সমাজে বিরাট কেউকেটা কেউ হবে। মজার ব্যাপার হলো—পরে দেখা যেত আমাদের অনুমান নির্ভুল হতো প্রায় সবক্ষেত্রেই। আসলে ক্ষমতাবান পুরুষেরা যে সুন্দরী তরুণীদের প্রতি বেশি লালায়িত হয়, আর সুন্দরীরা পয়সা আর স্ট্যাটাসওয়ালা স্বামীর প্রতি—এটা সব সমাজেই এত প্রকট যে এটা নিয়ে গবেষণা করার কেউ প্রয়োজনই বোধ করেননি কখনো। এজন্যই ন্যান্সি থর্নহিল বলেন,

> Surely no one has ever seriously doubted that men desire young, beautiful women, and that women desire wealthy high status men.

কিন্তু সনাতন সমাজবিজ্ঞানীরা আপত্তি করেছেন। তাদের অনুমান ছিল সব সংস্কৃতিতে নিশ্চয় এ ধরনের 'স্টেরিওটাইপিং' নেই। এখন এদের অনুমান সঠিক না কি ভুল তা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস।

তিনি ৩৩ টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পড়তা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুণ্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়ারাও গড়পড়তা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস। অধ্যাপক বাস প্রথমে আমেরিকায় সমীক্ষা চালালেন। দেখা গেল, আমেরিকায় মেয়েরা যত ভালো চাকরিই করুক না কেন, তারা আশা করে তার স্বামী তাদের চেয়ে বেশি রোজগার করবে—নইলে ব্যাপারটা 'এনাফ কুল্' হবে না। ম্যাচ ডট কম –এর মতো সাইটগুলোতে দেখা যায় মেয়েরা তার হবু সঙ্গীর স্ট্যাটাস এবং প্রতিপত্তির প্রতি আগ্রহী হয় ছেলেদের চেয়ে ১১ গুন বেশি। এমনকি একটি পরীক্ষায় অধ্যাপক বাস একই লোককে কখনো বার্গার কিং বা ম্যাকডোনাল্ডসের কর্মীর পোশাক পরিয়ে, কখনোবা বিরাট কোনো কোম্পানির সিইও সাজিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, নিম্ন স্ট্যাটাসের পোশাক পরা লোকের সাথে মেয়েরা প্রাথমিকভাবে কোনো ধরনের সম্পর্ক করতেই রীতিমত অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ একই লোককে বড় স্ট্যাটাসের কোনো পোশাক পরিয়ে বাইরে নেওয়া হলেই মেয়েরা তার প্রতি উৎসুক হয়ে উঠছে। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে সেরকম প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি। অর্থাৎ, ছেলেরা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্ট্যাটাস নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নয়, যতটা তারা উদ্বিগ্ন একটি মেয়ের দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে। প্রথমে যখন বাসের ফলাফল বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হলো, সেটা উড়িয়ে দেয়া হলো এই বলে—আরে ওটা আমেরিকার পচে যাওয়া ভোগবাদী সংস্কৃতির নিদর্শন। অন্য জায়গায় নিশ্চয় এরকম হবে না। অন্য জায়গার ঘটনা বুঝতে বাস ইউরোপীয় দেশগুলোতে তার সমীক্ষা চালালেন। সেখানেও একই ধরনের ফলাফল বেড়িয়ে আসলো – ছেলেরা মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতি বেশি মনোযোগী, আর মেয়েরা ছেলেদের স্ট্যাটাসের- তা সে হল্যান্ডেই সমীক্ষা চালান হোক, অথবা জার্মানিতে। এবারে বলা হলো ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনেকটা আমেরিকার মতোই। সেখানে তো এরকম ফলাফল আসবেই। এরপর অধ্যাপক বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা

১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালালেন— একেবারে আলাস্কা থেকে শুরু করে সেই জুলুল্যান্ড পর্যন্ত। প্রতিটি সংস্কৃতিতেই দেখা গেল মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আর্থিক প্রতিপত্তিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে[166]। জাপানে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেল আর হল্যান্ডে সবচেয়ে কম—কিন্তু তারপরেও সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারী-পুরুষের চাহিদার পার্থক্য কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি: কেন পুরুষেরা পর্নোগ্রাফি ভালোবাসে আর মেয়েরা প্রেমের উপন্যাস

নারীপুরুষের এ ধরনের চাহিদার পার্থক্য আরও প্রকট হয়েছে নারী-পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে ‘ফ্যান্টাসি’কেন্দ্রিক গবেষণাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে—আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্য দিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গীকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময় সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে। একারণেই

---

166 D.M. Buss, Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49, 1989.

গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [167] —

> পুরুষদের যৌনতার বাঁধন-হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপী, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাস অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরঙ্গ এবং অক্রিয়।

একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডেভিড বাসের 'মেটিং স্ট্র্যাটিজি' নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাতেও। এমনি একটি গবেষণায় দেখা গেছে একজন পুরুষকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সাড়া জীবনে কতজন যৌনসঙ্গীর দরকার বলে তার মনে হয়, গড়পড়তা উত্তর পাওয়া গেছে-১৮। নারীদের ক্ষেত্রে সেটা মাত্র ৪.৫ (নীচের ছবি দ্রঃ)।

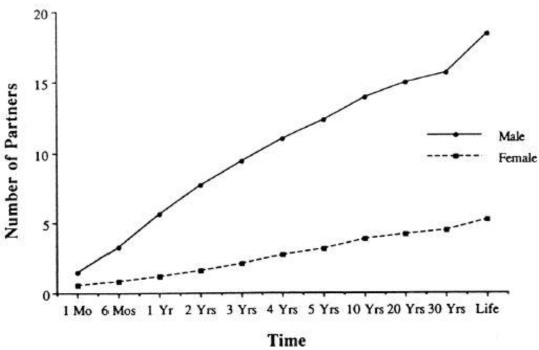


Figure 4. Number of sexual partners desired. (Subjects recorded in blank spaces provided how many sexual partners they would ideally like to have for each specified time interval.)

চিত্র – বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যৌনসঙ্গীর চাহিদার মাত্রায় পার্থক্য রয়েছে। একজন পুরুষের গড়পড়তা যৌনসঙ্গীর সংখ্যার মানসিক চাহিদা মেয়ের চাহিদার চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি থাকে (*উৎস* –ডেভিড বাস, হিউম্যান মেটিং স্ট্র্যাটিজি[168])

আরও কিছু মজার তথ্য এবং জরিপের ফলাফল সন্নিবেশিত করা যাক। এই জরিপটা

---

[167] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

[168] David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.

চালানো হয়েছিল একটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। আর.ডি ক্লার্ক এবং হ্যাটফিল্ডের পরিচালিত এ গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল জার্নাল অব সাইকোলজি এন্ড হিউম্যান সেক্সুয়ালিটিতে **১৯৮৯** সালে[169]। ব্যাপারটা ছিল এরকমের। কলেজের কিছু ছাত্রদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল যে তারা অপরিচিত ছাত্রীদের সামনে গিয়ে বলবে—

"এই মেয়ে শোন, তোমাকে আমি কয়েকদিন ধরেই ক্যাম্পাসে দেখছি। তুমি খুবই আকর্ষণীয়।"

তারপরের তিনটি প্রশ্ন হবে এরকমের—

১। তুমি আমার সাথে ডেটে যেতে চাও?

২। তুমি কি আমার সাথে আমার এপার্টমেন্টে যেতে চাও?

৩। তুমি কি আমার সাথে সেক্স করতে ইচ্ছুক?

দেখা গেছে, এ ধরনের প্রশ্নে ৫০% ছাত্রী ডেট এ যেতে রাজি হয়েছে, ৬% ছাত্রী সেই ছাত্রের সাথে এপার্টমেন্টে যেতে রাজি হয়েছে এবং ০% ছাত্রী সেক্সে রাজি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু ছাত্রী প্রথমেই এভাবে সেক্সের আবেদন হাজির করাকে 'ইনসাল্ট' বা অপমান হিসেবে নিয়েছে।

কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে ফলাফল পাওয়া গেছে ভিন্ন রকমের। কোনো মেয়ে যদি কোনো ছাত্রের কাছে গিয়ে ঠিক উপরের প্রশ্নগুলো করে, তবে দেখা গেছে, ৫০% ছেলে প্রথমেই ডেটে রাজি হয়েছে, ৬৯% সেই ছাত্রীর সাথে এপার্টমেন্টে যেতে রাজি হয়েছে, আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ৭৫% ছাত্র প্রথমেই ছাত্রীর সাথে যৌনকর্মে সম্মতি দিয়েছে।

ছেলে মেয়েদের যৌন-অভিলাসের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে

[169] Clark, R. D., III & Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of Psychology and Human Sexuality, 2, 39-55.

আজকের দিনের বাণিজ্যে এবং পণ্য-দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্নোগ্রাফি’ অন্যটি হলো ‘রোমান্স নভেল’। পর্নোগ্রাফির মূল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উদগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টার্নেট সয়লাব হয়ে আছে সফট পর্ন, হার্ড পর্ন, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্সসহ হাজার ধরনের বারোয়ারি জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মতো হার্ডকোর পর্ন পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পূর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ—মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

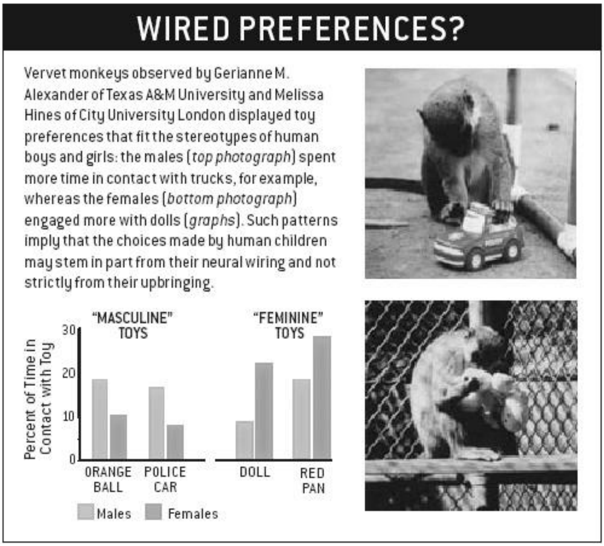
আর মেয়েদের এই ‘অবারিত ইমোশন’ তৈরি করতে বাজারে আছে ‘রোমান্স নভেল’। এই রোমান্টিক নভেলের মূল ক্রেতাই নারী। দেদারসে প্রেম-পিরিতি-বিচ্ছেদের পসরা সাজিয়ে শ’য়ে শ’য়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয়, আর সেগুলো দেদারসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলত মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেদ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহাররঞ্জন গুপ্ত । প্রেম কত প্রকার ও কী কী তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানীংকালে বিশেষত উঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয়—কীভাবে তার উপন্যাস ‘সাজাতে’ হবে, আর কী কী থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান-অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ে নায়িকার সেক্সের সাথে আবার ইমোশন মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা দেদারসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে যাচ্ছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরও কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লেবয়'-এর পাশাপাশি একসময় 'প্লে গার্ল' এবং 'ভিভা' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। চলেনি। মেয়েরা এ ধরনের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেদের প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব যান্ত্রিক। পর্নোগ্রাফি সেজন্যই ছেলেদেরকেই বেশি আকর্ষণ করে। আরও একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভায়াগ্রা পুরুষের জন্য কাজ করলেও মেয়েদের জন্য করে না। ভায়াগ্রা কাজ করে খুব সাধারণ একটি পদ্ধতিতে। পুরুষাঙ্গে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে। ঠিক একই পদ্ধতিতে ক্লায়টোরিসে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েদের জন্য 'পিঙ্ক ভায়াগ্রা' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সফল হয়নি। একটি বড় কারণ মেয়েদের প্রেম এত যান্ত্রিক নয়, তাদের প্রেম অনেক বর্ণময়, অনেক ধরনের আবেগের সুগ্রন্থিত মিশ্রণ। তাই ছেলেদের ভায়াগ্রার মতো মেয়েদের জন্য ভায়াগ্রা তৈরি করতে গিয়ে বড় বড় কারখানাগুলো চুল ছিঁড়ে ফেলছে কিন্তু পণ্ডশ্রমই সার হয়েছে, সফলতা আসেনি। এদিকে ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল—এই শিকল ভাঙার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ধরনের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল—চলেনি। কারণ কী? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে—আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন—

> আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কী বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী-পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকই ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার।

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি 'ভার্ভেট মাঙ্কি' নিয়ে গবেষণা করেও

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানবসমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরনের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা-মা'রা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা-গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপণনে। যে কেউ টয়সেরাসের মতো দোকানে গেলেই ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন। কিন্তু খেলনাগুলো দেখলেই বোঝা যাবে—এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বানানো।



চিত্র – বিজ্ঞানীরা ছেলে ভার্ভেট মাঙ্কি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানবসমাজের ছেলেমেয়েদের খেলনা নিয়ে 'স্টেরিওটাইপিং'-এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু শিশু বয়সে নয়, পরিণত বয়সেও ছেলে মেয়েদের মধ্যকার মানসিকতার

প্রভেদমুলক পার্থক্য বজায় থাকে পুরোমাত্রায়। পুরুষদের একটা বড় অংশ অর্থ, প্রতিপত্তি এবং যৌনতার প্রতি যেভাবে লালায়িত হয়, মেয়েরা গড়পড়তা সেরকম হয় না। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান ছেলে মেয়েদের এই মানসিক পার্থক্যকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে। ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন' তত্ত্ব সঠিক হলে, আমাদের দেহ জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে চাইবে 'জিন সঞ্চালনে'। পুরুষদের জন্য যেহেতু নয় মাস ধরে গর্ভধারণের ঝামেলা নেই, নেই অন্য আনুষঙ্গিক ঝামেলা মেয়েদের যেগুলো পোহাতে হয় গর্ভধারণের জন্য, সেহেতু তাদের মধ্যে একটা অংশ থাকেই যারা মনে করে যত বেশি জিন সঞ্চালন করা যাবে ততই বেশি থাকবে ভবিষ্যত প্রজন্ম বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। তাই ইতিহাসে দেখা যাবে শক্তিশালী পুরুষেরা কিংবা গোত্রাধিপতিরা কিংবা রাজা বাদশাহরা হেরেম তৈরি করে সুন্দরী স্ত্রী আর উপপত্নী দিয়ে প্রাসাদ ভর্তি করে রাখত। পর্নোগ্রাফির প্রতি আকর্ষণ পুরুষদেরই বেশি থাকে কিংবা পতিতাপল্লীতে পুরুষেরাই যায়—আদিম সেই উদগ্র 'যৌনস্পৃহা' মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই।

পর্নোগ্রাফি থেকে মুক্ত নয় রক্ষণশীল জিহাদি (অবশ্যই পুরুষ) সৈনিকেরাও

২০১১ সালের মে মাস। আমি যখন বইয়ের এই অংশটুকু লিখছিলাম, তখন পাকিস্তানের এবোটাবাদে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে সবেমাত্র হত্যা করা হয়েছে। লাদেনকে হত্যার জন্য মার্কিন বাহিনী হঠাৎ করেই পাকিস্তানে অভিযান চালায়। লাদেন তখন ইসলামাবাদ থেকে ৩৫ মাইল দূরে এবোটাবাদ নামক একটি শহরের একটি তিন তলা বাড়িতে অবস্থান করছিল। হেলিকপ্টার দিয়ে পরিচালিত ওই অভিযানে লাদেন, লাদেনের একজন ছেলে এবং তার ২ জন সহযোগীর মৃত্যু হয়।

কিন্তু তার মৃত্যুর পর যে খবরটি মিডিয়ায় এল তা আরও চাঞ্চল্যকর। ওসামা

বিন লাদেনকে হত্যার পর ওসামার বাড়ি থেকে জব্দ কম্পিউটার থেকে পাওয়া গেল পর্নোগ্রাফির হরেক রকম কালেকশন। যে বিন লাদেন মেয়েদের সম্মান করে শরিয়া মোতাবেক চলাফেরা, হিজাব পরা, পর্দানসীন থাকাকে পশ্চিমা ধাচের অশালীন চলাফেরার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন, সেই লাদেন পশ্চিমা মেয়েদের পর্নোগ্রাফি তার কম্পিউটারে সংগ্রহ করে রাখতেন, এবং সম্ভবত উৎসাহের সাথে সেগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন। এ খবরটি প্রকাশিত হয়েছে রয়টার, সিএনএন, ইয়াহু নিউজ, ফক্স নিউজ, এবিসি নিউজ, গার্ডিয়ান, হাফিংটন পোস্টসহ বহু নিউজ মিডিয়াতেই[170]।

এর মানে হচ্ছে, মরহুম বিন লাদেন চমৎকার একটি ইসলামি জীবন অনুসরণ করেছেন। যেখানে তিনি তার বিপ্লবী আদর্শে বলিয়ান উম্মতদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্ররোচিত করেছেন, নাইন-ইলেভেনের মতো আরও ঘটনা পুনর্বার ঘটানোর ডাক দিয়েছেন, কাফির নাসারাদের সমূলে ধ্বংস করে ইসলামি সাম্যবাদের পতাকা তুলে ধরার হাঁকডাক পেরেছেন, সেখানে সেই বিপ্লবের অসংবাদিত নেতা লাদেন ইসলামাবাদের মাত্র ৬০ মেইল দূরে সামরিক বাহিনীর অভয়ারণ্য বলে খ্যাত এবোটাবাদের একটি দূর্গতুল্য প্রাসাদে তিন স্ত্রী এবং এগারোজন সন্তানসন্ততি নিয়ে নিরাপদে জীবনযাপন করতেন, কাফির নাসারাদের বানানো কোকা-কোলা / পেপসি চুক চুক করে পান করতেন, শখ করে দূর্গের বাইরে মারিজুয়ানা বা গঞ্জিকার বাগান করতেন, এবং গভীর রাতে কম্পিউটারে বসে বসে পর্নোগ্রাফি দেখতেন। চমৎকার একজন ইসলামি নেতার মতোই কাজ কারবার।

যদিও হলফ করে বলার উপায় নেই যে, বিন লাদেনই সেই পর্নোগুলো দেখতেন, কিন্তু তারপরেও যখন তার পার্সোনাল কম্পিউটারেই রকমারি ধরনের ঢালাও পর্নের সংগ্রহ আবিস্কৃত হয়েছে, এবং সেই কম্পিউটারটি সুরক্ষিত ছিল কেবল বিন লাদেনের

[170] এ প্রসঙ্গে পড়ুন, মরহুম ওসামা বিন লাদেনের কম্পিউটারে পর্নোগ্রাফি – একটি জটিল দার্শনিক প্রশ্ন, মুক্তমনা, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ (মে ১৬th, ২০১১)

নিত্যদিনের ব্যবহারের জন্যই, তখন মন থেকে জোরালো একটা সন্দেহের তীর প্রক্ষিপ্ত হয় বৈকি! যাহা হাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে আর যার হাঁসের মতো পালক আছে—তাহা শেষ পর্যন্ত হাঁসই!

কেন পর্নোগ্রাফি বহু পুরুষদের উন্মাতাল করে?

পর্নোগ্রাফি দেখা কোনো সত্যিকার যৌনসঙ্গম নয়, এটা সবাই জানে। তারপরেও পর্নোভিডিও কেন পুরুষদের উত্তেজিত করে, কামার্ত করে তুলে? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে এর উত্তর পাওয়া গেছে। সাভানা অনুকল্পের কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি; যে কারণে আমরা তেল চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি লালায়িত হই, যে কারণে আমরা সাপ আর বিষধর কীটপতঙ্গ দেখলেই ভয় পাই, পর্নোগ্রাফির প্রতি বহু পুরুষদের আসক্তির কারণও মূলত একই জায়গায়। সাভানা অনুকল্প বলছে, আমরা আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও আমাদের মস্তিষ্ক রয়ে গেছে প্রস্তর যুগে—আমাদের করোটির ভিতর বাস করে আদিম প্রস্তর যুগের মস্তিষ্ক। কারণ মানব মস্তিষ্কের মূল মডিউলগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমরা যখন আফ্রিকার সাভানা তৃণভুমিতে শিকারি সংগ্রাহক হিসেবে জীবন কাটাতাম। ভিডিও, সিনেমা, এগুলো আধুনিক কারিগরী উৎকর্ষময়তার অবদান, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক আধুনিক জটিলতার মাঝে সময় অতিক্রম করলেও এর প্রকৃত বাস্তবতা থেকে অপার বাস্তবতাকে পৃথক করতে অনেক সময়ই থাকে অক্ষম। সেজন্যই গভীর রাতে ভূতের বই পড়লে বা সিনেমা দেখলে আমাদের অনেকেরই গা ছম ছম করে। যে কারণে ভূতের সিনেমা দেখে অনেকে ভয় পায়, একই কারণে পর্নোগ্রাফি দেখেও অনেকে উত্তেজিত হয়। মেয়েদের নগ্ন ছবি কিংবা পর্নোভিডিও দেখলে পুরুষদের মস্তিষ্ক বুঝে উঠতে পারে না যে, এগুলো সত্যি নয়—এগুলো আসলে কৃত্রিমভাবে তৈরি পণ্যমাত্র। এই অত্যাধুনিক পণ্যগুলোর কোনো অস্তিত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের সাভানা পরিবেশে ছিল না। তাদের কাছে সে সময় কোনো নগ্ন মেয়ের সাথে সঙ্গম কিংবা সঙ্গম করার জন্য উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সবসময়ই ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রকৃত বাস্তবতার নিয়ামক। কাজেই আধুনিক মানুষ কম্পিউটারে বসে কোনো মেয়ের নগ্ন ছবি দেখলে কিংবা পর্নো ভিডিও দেখলে 'প্রস্তর যুগে' তৈরি পুরুষের মস্তিষ্ক অনুধাবন করতে পারে না যে উপকরণগুলো আসলে কৃত্রিম, বরং মস্তিষ্কে সেই সমস্ত

সঙ্কেতই পাওয়া যায় যার মাধ্যমে মনে হয় সত্যি সত্যিই ওই মেয়েদের সাথে যৌনসঙ্গমের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ সময় পুরুষদের জননেন্দ্রিয় শক্ত হয়ে যায়, রক্তচাপ বেড়ে যায়, তাদের দৃষ্টি ফোকাস হয়ে উঠে ভিডিওতে দেখা মেয়ের দেহের বিবিধ যৌনাঙ্গে। ঠিক এগুলোই ঠিক একইভাবে ঘটে সত্যিকার এবং সফল যৌনসঙ্গমের প্রাক্কালে। মস্তিষ্ক যদি বুঝতে পারত ভিডিওতে দেখা কিংবা কম্পিউটারে ব্রাউজ করা মেয়েগুলো ভার্চুয়াল, তাদের সাথে সত্যিকার সঙ্গম করা সম্ভব হবে না, তাহলে সে দৃশ্যগুলো দেখে পুরুষাঙ্গ কখনই সঙ্গমের জন্য উত্থিত হতে শুরু করত না। কিন্তু মানব মস্তিষ্ক সেটা অনুধাবন করতে পারে না বলেই পর্নোগ্রাফি দেখলে পুরুষেরা উত্তেজিত হয়ে উঠে।

সাভানা অনুকল্পের ব্যাপারটা একইভাবে নারী মস্তিষ্কের জন্যও প্রযোজ্য। নারীদের জন্য পর্নোগ্রাফির আবেদন ভিন্নভাবে তৈরি হয়েছে বিবর্তনের যাত্রাপথে। বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায় পুরুষদের মতো ঘন ঘন সঙ্গী বদল মেয়েদের জন্য কোনো প্রজননগত সফলতা নিয়ে আসেনি। নারীরা যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে থাকে অপেক্ষাকৃত খুঁতখুঁতে, ফলে স্বভাবগতভাবেই নারীরা অসতর্ক সঙ্গমে (casual sex) পুরুষদের মতো প্রলুব্ধ হয় না। কারণ, এ ধরনের অসতর্ক সঙ্গমে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভকালীন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে নারীকেই। গবেষণায় দেখা গেছে, গড়পড়তা একটি পুরুষ কোনো নারীর সাথে পরিচয়ের এক সপ্তাহের মাথায় যৌনসঙ্গমে ইচ্ছুক হয়, সেখানে একটি নারী যৌনসম্ভোগের জন্য অপেক্ষা করতে চায় ছয় মাস[171]। ঠিক যে কারণে পুরুষের প্রস্তর যুগের মস্তিষ্ক পর্নো ভিডিও দর্শনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ঠিক একই কারণে মেয়েরা হয়ে পড়ে এ ব্যাপারে সতর্ক। মেয়েদের প্রস্তর যুগের মস্তিষ্ক ভুল সঙ্কেত পাঠাতে থাকে যে, এই পর্নোগ্রাফির ফলশ্রুতিতে তারা গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে। তাই অধিকাংশ মেয়েই পর্নোগ্রাফির প্রতি নিস্পৃহ কিংবা নিরাসক্ত থাকে, এদের মধ্যে অনেকেই দারুণভাবে বীতশ্রদ্ধও। বিবর্তনীয় যাত্রাপথে নারী পুরুষের যৌনতার ভিন্ন স্ট্র্যাটিজির কারণেই পর্নোগ্রাফির প্রতি ভিন্ন আবেদন দেখা যায়।

বিন লাদেনের পর্নো দেখা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। মুক্তমনায় প্রকাশিত

[171] D. M. Buss, & D. P. Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232, 1993

প্রবন্ধে আমি সেটা পরিষ্কার করে বলেছিলামও যে, আমি পর্নোবিরোধী কেউ না। কে নিশিরাত জেগে পর্নোগ্রাফি দেখছে আর না দেখছে সেটা আমার বিবেচ্য ছিল না কখনোই, এই লেখার মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির বিলুপ্তির কোনো পিটিশনও হাজির করছি না আমি, যার ইচ্ছে হয় দেখুক, আমার কী বলার আছে! কিন্তু আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুটি হলো—যে বিন লাদেন পাশ্চাত্যে অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, হোমোসেক্সুয়ালিটি আর পতিতাবৃত্তিসহ বহুকিছুতে সোচ্চার, সকল ধরনের 'পশ্চিমা বেলেল্লাপনার' বিরুদ্ধেই তার নিরঙ্কুষ জিহাদ, সেই নীতি নৈতিকতার চূড়ামণি বিধ্বংসী জিহাদি নেতা লাদেন বসে বসে পর্নোগ্রাফি দেখতেন —ব্যাপারটা অভিনব না? সর্ষের মধ্যেই যখন ভুত থাকে, তখন আর কী বা বেশি বলার থাকে।

শুধু পর্নোগ্রাফি নয়, বিন লাদেনের দূর্গ থেকে এভেনার মতো বিভিন্ন 'সেক্সুয়াল স্টিমুলেটর'ও পাওয়া গেছে। তার চেয়েও মজার ব্যাপার হলো, নিজে আয়েশ করে বাহারি ধরনের পর্নো দেখলেও তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীরা যেন কোনোক্রমেই পুনর্বার বিয়ে না করতে পারেন—এ নিয়ে একটি উইল করে গেছেন 'মহানুভব লাদেন'। অবশ্য এগুলো কোনোটাই আমার কাছে খুব একটা বিস্ময়কর কিছু মনে হয়নি। কাগজে কলমে মৌলানারা তোতাপাখির মতো 'ইসলামে পর্নোগ্রাফি হারাম' জাতীয় বুলি আউরালেও কিংবা বোরখা আর হিজাবের জয়গান গাইলেও আরব বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোই সবচেয়ে 'সেক্স স্টার্ভড' জাতি সেটা অনেক আগে থেকেই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। হিন্দি নাচ গানের সেক্সুয়াল ভিডিওর জমজমাট ব্যবসা নাকি আরবেই। মধ্যপ্রাচ্যের 'বেলি ড্যান্সিং' কিংবা পাকিস্তানের মুজরার কথাও কমবেশি সবাই জানে। শুধু তাই নয়, সৌদি বাদশাহদের হারেম পোষা থেকে শুরু করে, দেশ বিদেশ থেকে সুন্দরী নারী ভাড়া করে নিয়ে এসে শেখদের পার্থিব লালসায় ব্যবহারের খবর প্রায়ই পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায়[172] । আর

---

[172] ইরোটিক এবং পর্নোগ্রাফিক আরব কালচার নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে, এপ্রসঙ্গে দেখুন, Adil Mustafa Ahmed, The Erotic and the Pornographic Arab Culture, British Journal of Aesthetics, Vol 34, No 3, July, 1994

এর মধ্যে পাওয়া গেছে আরও এককাঠি সরেস খবর। সম্প্রতি গুগলের বদৌলতে পর্নোওয়েবসাইট কারা বেশি পরিভ্রমণ করে এ সংক্রান্ত জরিপ চালানো হয়েছে, আর এ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মজাদার তথ্য। ২০০৬ সালে করা এ জরিপে পাওয়া ফলাফলে যে তথ্য উঠে এসেছে তা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর। সবচেয়ে বেশি পর্নসাইট ভ্রমণ করেন ইসলামি শরিয়া সমৃদ্ধ পাকিস্তানিরা[173]। শুধু ২০০৬ সালের নয়, ২০০৪ সালের পর থেকেই পাকিস্তানিরা এ ব্যাপারে শীর্ষে, এবং গত বছরের জরিপেও একই ফলাফল বেরিয়ে এসেছে[174]। জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানিরা কেবল হিউম্যান সেক্সেই আগ্রহী নয়, সেই সাথে ‘horse sex’, ‘donkey sex’, ‘camel sex’ প্রভৃতি সার্চেও তালিকার প্রথমে। শুধু পশুমেহনে পাকিদের আসক্তি থাকলেও না হয় কথা ছিল, সেই সাথে তারা আগ্রহী ‘rape sex’, ‘child sex’ এবং ‘rape video’ দর্শনেও (সাধু সাবধান)। পর্নোগ্রাফির প্রতি এই ইসলামি রাষ্ট্রটির প্রবল আসক্তি দেখে অনেকেই বলছেন, এই দেশটাকে পাকিস্তান না ডেকে *পর্নিস্তান* ডাকলে কেমন হয়?[175] ঘটনা অবশ্য এখানেই শেষ নয়, আরও আছে—২০০৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী যৌনতাসন্ধানী বুভুক্ষু প্রথম দশটি দেশের ছয়টিই ইসলামি দেশগুলোর দখলে। সেগুলো হচ্ছে: মিসর (দ্বিতীয়), ইরান (চতুর্থ), মরক্কো (পঞ্চম), সৌদি আরব (সপ্তম) এবং তুরস্ক (অষ্টম)। অমুসলিম দেশ চারটে হচ্ছে: ভিয়েতনাম (তৃতীয়), ভারত (ছয়), ফিলিপাইন (নবম) এবং পোল্যান্ড (দশম)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রথম আটটি দেশের ছ’টিই মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দ্য ডেইলি বিস্টের কলামিস্ট আসরা নোমানী ‘Osama's Dirty Mind : Bin Laden’s porn and Muslim hypocrisy on sex’ শীর্ষক প্রবন্ধে এজন্যই লিখেছেন[176] -

---

[173] Pakistan most sex-starved, Daily Times, May 17, 2006, অন লাইন লিঙ্ক: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2006%5C05%5C17%5Cstory_17-5-2006_pg1_4

[174] ২০১০ সালের রিপোর্টের ফলাফল দেখুন এখানে: Google ranks Pakistan No. 1 for pornographic search terms; http://www.pakpoint.net/google-ranks-pakistan-1-for-pornographic-search-terms/15607/

[175] ফক্স নিউজে এ সংক্রান্ত একটি নিউজ হেডিং ছিল –No. 1 Nation in Sexy Web Searches? Call it Pornistan; http://www.foxnews.com/world/2010/07/12/data-shows-pakistan-googling-pornographic-material/

[176] Asra Q. Nomani, Osama's Dirty Mind; http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2011-05-14/osama-bin-ladens-porn-and-muslim-hypocrisy-on-sex/

> Some of the Muslim societies that are the most repressive toward women...also have some of the highest rates of pornography usage in the world.

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেরোরিজম বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিন ফেয়ার বলেছেন, 'লাদেনের বাসায় পর্নো পাওয়ায় অবাক হইনি মোটেই। জিহাদিরা পর্নো ভালোবাসবে এটা তো জানা কথাই। সাধে কী তাদের জন্য পরকালে বাহাত্তুরটা হুর পরির লোভ দেখানো হয়েছে নাকি!'। রজার সিম্পসনের উদ্ধৃতি দিয়েই বলতে হয় -- 'the greater the repression the greater the revolution'. আমি মুক্তমনায় প্রকাশিত আমার ঐ প্রবন্ধে সেজন্যই কৌতুক করে বলেছিলাম, 'আগামী বিশ্বের সেক্সুয়াল রিভলুশন সম্ভবত ইসলামি বিশ্বেই শুরু হবে, আর মরহুম বিন লাদেন হলেন সেই বিপ্লবের পথিকৃৎ। আমার তো তাই মনে হচ্ছে'।

অথচ পর্নোগ্রাফি নাকি হারাম ইসলামে[177]! এক মুখে পর্নোকে হারাম বলা হয়, অথচ ইসলামের জিহাদিদের নেতাই বসে বসে সোৎসাহে পর্নো দেখেন। হারামের কথাই যখন এল, কী হারাম আর কী হারাম নয় তা বলা সত্যই মুশকিল। ধর্মকারী নামে একটা সাইট আছে নেটে। সেই সাইটের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাইটটিতে বলা হয়েছে, 'যুক্তিমনস্কদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। বিতর্ক বা বাকবিতণ্ডার স্থান নেই এখানে। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে।'

অবশ্য সেক্স ম্যানিয়্যাক জীব কেবল ইসলামেই আছে তা মনে করলে বেজায় ভুল হবে। সব ধর্মেই সেটা কমে বেশি আছে বলাই বাহুল্য। ভারতে পরলোকগত সাইবাবার সেক্স স্ক্যান্ডাল পত্রপত্রিকায় এসেছে। 'ভগবান রজনীশের' যৌনউন্মত্ততার

[177] এ প্রসঙ্গে ইউটিউবে দেখুন ডায়রেকটর ফর দা সেন্টার ফর ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট মৌলানা জিয়াউল্লাহ খানের ফতোয়া - Islam forbids pornography।

কথাও সর্বজনবিদিত ছিল। চার্চের বিভিন্ন পাদ্রী প্রায়ই শিশু যৌন নিপীড়ন এবং ব্যভিচারের কারণে নিত্যদিনই পত্রপত্রিকার শিরোনাম হন, তা তো আমরা এখনও হর-হামেশাই দেখছি। আসলে যেখানেই মাত্রাতিরিক্ত বাধার প্রাচীর তুলে দিয়ে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই তৈরি হয়েছে নানা ধরনের আসক্তি এবং আস্ফালন। আমরা অবশ্য মনে করি যৌনতা বিবর্তনেরই ফসল। যৌনতাকে পাপ, ব্যভিচার, পশ্চিমের বেলাল্লাপনা বলে কৃত্রিম উপায়ে যে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, যায় না দমন করা কেবল হিজাব কিংবা বুরকার বুলি কপচিয়ে, সেটা মরহুম ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে লুকিয়ে পর্নো দেখে এবং অন্যান্য (অ)কাজ কুকাজের মাধ্যমে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের সত্যতাই পুনর্বার প্রমাণ করে দিলেন, নয় কি?

আমাদের সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পবোধগুলো তৈরি হয়েছে বিবর্তনের পথ ধরে

সুদক্ষ শিল্পীর নয়নাভিরাম শিল্পকর্ম কে না ভালোবাসে! পিকাসোর গুয়েরনিকা, অগস্ত রঁদ্যার 'থিঙ্কার' কিংবা মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড' দেখে আমরা মুগ্ধ হই, ঠিক তেমনি আমরা উদ্বেলিত হই শামীম শিকদারের 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা'র পাশে দাঁড়িয়ে, কিংবা নিতুন কুণ্ডুর 'সাবাস বাংলাদেশ' প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু কেন আমাদের ভাস্কর্য দেখতে ভালো লাগে? কখনো কি আমরা ভেবেছি—কেন ভাস্করদের নিপুণ কাজ আমাদের মনোমুগ্ধকর বলে মনে হয়, তাদের ব্যক্তিত্বকে কাঙ্ক্ষিত মনে হয়? অনেক বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীই মনে করছেন ব্যাপারটির উৎস আসলে বিবর্তনমনোসঞ্জাত। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এমনিভাবে পাথুরে হাতিয়ার, প্রবালের নেকলেস প্রভৃতি বানিয়ে জয় করতে পেরেছিল বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ, জাগাতে পেরেছিল অন্যদের চিত্তচাঞ্চল্য। প্রায় দেড় মিলিয়ন বছর আগে হোমো ইরেক্টাসরা শুরু করেছিল পাতলা পাথরের ফালি বানানো। এগুলো দেখতে ডিম্বাকৃতির, কখনোবা ত্রিভুজাকৃতির পাতার

মতোন বা ‘টিয়ার ড্রপ’ আকারের[178]। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকাসহ পৃথিবীর যেখানেই হোমো ইরেক্টাস আর হোমো ইরগাস্টারদের যাতায়াত ছিল, সেখানেই পাওয়া গেছে হাজার হাজার একুলিয়ান হ্যান্ড অ্যাক্স। সবচেয়ে পুরনো ‘অ্যাকুলিয়ান হ্যান্ড অ্যাক্স’-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ১.৮ মিলিয়ন বছর আগেকার ।



চিত্র: ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঞ্জিনিয়ার ওল্ডুভাই গর্জে পাওয়া প্রাচীন অ্যাকুলিয়ান হ্যান্ড অ্যাক্স।

এ প্রাচীন হাতিয়ারগুলোই আমাদের মানবেতিহাসের সবচেয়ে পুরনো শিল্প। ব্যবহারিক অস্ত্রের এই বিমুগ্ধকর নান্দনিক রূপান্তর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কারিগরি দক্ষতা তুলে ধরে। ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ‘হ্যান্ড এ্যাক্স’ সভ্যতার নতুন এক ধাপের প্রতীক। দেখে মনে হয় এই হাতিয়ারগুলো তৈরিই হয়েছে একধরনের প্রচ্ছন্ন ‘ফিটনেস সিগন্যাল’ দেয়ার জন্য, যে সিগন্যালের মধ্যে প্রকাশ পায় নির্মাতার বুদ্ধি, কর্মনিপুণতা, সচেতনতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং দূরদর্শিতা। অনেকটা পেখমওয়ালা ময়ূরের মতোই অস্ত্র বানানোয় দক্ষ পুরুষ আকর্ষণ করতে পেরেছিল আদিম সমাজে নারীদের অনুগ্রহ। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের এ গুণগুলো ছিল তারা আকর্ষণ করেছিল অধিকমাত্রায় বিপরীত লিঙ্গের সান্নিধ্য, তারাই রেখে গেছে অধিক হারে উত্তরসূরী। যারা এই কারিগরিবিদ্যা রপ্ত করতে পারেনি, তারা বিপরীত লিঙ্গের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনি, তারা প্রজননগতভাবে সফল ছিল না।

নিউজিল্যান্ডের কেন্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেনিস ডাটন (৯ ফেব্রুয়ারি

[178] ডেনিস ডাটনের বক্তৃতা : সৌন্দর্য ও ডারউইনের থিওরি, লুনা রুশদী, ২৯ জানুয়ারি ২০১১ http://arts.bdnews=? /com/?p=>>\ [

১৯৪৪-২৮ ডিসেম্বর, ২০১০) একটি বই লিখেছেন ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং শিল্পের প্রতি অনুরাগ বিশ্লেষণ করে[179]। তার একটি চমৎকার লেকচার আছে টেড ডট কম সাইটে এবং ইউটিউবে[180]। তিনি মনে করেন, শিল্প বিষয়ক যে কোনো আধুনিক রুচি সেটা যে কোনো শিল্প মাধ্যমই হোক না কেন, উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তনের ক্রমপ্রক্রিয়ায়, ডারউইনের তত্ত্ব দিয়ে যাকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে পূর্বপুরুষদের চোখে পাথুরে হাতিয়ার তৈরির মতো দক্ষতাগুলো যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ধরা দিয়েছিল, সেই একই ধরনের ভালোলাগাগুলো এখনও আমাদের মনে কাজ করে যায় প্রায় একইরকমভাবে। নিপুণ কারিগরি দক্ষতায় সম্পন্ন যে কোনো কাজ বা শিল্প দেখলে আমাদের মন এখনও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, আমরা সেই শিল্পকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হই অবচেতনভাবেই। কোনো গয়নার দোকানে টিয়ার ড্রপ আকারের কোনো হীরার অলংকার দেখলে আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠে। এমন মনে করার কারণ নেই যে আমাদের সংস্কৃতিই হঠাৎ করে শিখিয়েছে এগুলোকে সুন্দর ভাবতে। বরং আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষরাও ভালোবাসতো এই ধরনের শৈল্পিক আকৃতিগুলো, আর কদর করত এর নির্মাণের পেছনের কর্মকুশলতা আর দক্ষতাকে। আমাদের আধুনিক রুচিবোধগুলো মূলত তৈরি হয়েছে সেই প্লেইস্টোসিন যুগের আদিম পছন্দ অপছন্দগুলোর উপর ভর করেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, খেলাধুলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগগুলো তৈরি হয়েছে লৈঙ্গিক আবেদনের মাধ্যমে যৌনতার নির্বাচনের পথ ধরে। প্রাকৃতিক নির্বাচন গড়ে উঠেছে মূলত বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, আর অন্যদিকে যৌনতার নির্বাচন কাজ করেছে প্রজননগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী জিওফ্রি মিলার মনে করেন, আমাদের এই শৈল্পিক রুচিবোধগুলো কোনো অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার সুনিপুণ ডিজাইনের মাধ্যমে যেমন হয়নি, ঠিক তেমনি পুরোটুকু তৈরি হয়নি অন্ধ এবং নির্বিচারী এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের

[179] Denis Dutton, The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution, Bloomsbury Press, 2008

[180] Denis Dutton: A Darwinian theory of beauty, http://www.youtube.com/watch?v=PktUzdnBqWI

মাধ্যমেও। বরং আমাদের মানসপটের বিবর্তন হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিনের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভর করে এবং তাদের সতর্ক সঙ্গী নির্বাচনের মাধ্যমে। আমরা তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছি তাদের নানারকম পছন্দ—উদ্যম, সৃজনশীলতা, কৌতুকপ্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিল্পবোধসহ বিভিন্ন নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। তারা সঙ্গী নির্বাচনের সময় সচেতনভাবেই গুরুত্ব দিয়েছে কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি, সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলো সংরক্ষিত থেকেছে আমাদের জনপুঞ্জে। সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যে খুঁজে পেলে আমাদের মস্তিষ্ক স্বভাবতই আমোদিত হয়, প্রলুব্ধ হয়—ঠিক যেমন ময়ূরী প্রলুব্ধ হয় দীর্ঘ পেখমওয়ালা ময়ূরকে খুঁজে পেলে। আমরা মূলত আমাদের পূর্বপুরুষদের লক্ষ বছরের বংশগতীয় পরীক্ষানিরীক্ষার সফল পরিণতি।

নারী পুরুষ শেষ পর্যন্ত অভিন্ন মানব সত্তারই অংশ

পুরো অধ্যায়টিতে মূলত জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষের পার্থক্য উল্লেখ করা হলেও এটা মনে রাখতে হবে যে, নারী পুরুষ কোনো আলাদা প্রজাতির জীব নয়, নয় কোনো ভিন্ন ভুবনের দুই বাসিন্দা, বরং তারা শেষ পর্যন্ত তারা অভিন্ন মানবপ্রকৃতিরই অংশ। হ্যাঁ নারীপুরুষের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে এবং আচরণগত বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য আছেই, সেটার কারণ বহুবিধ। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নারী এবং পুরুষকে বিবর্তনের যাত্রাপথে ভিন্ন ধরনের অভিযোজনগত সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে, তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান করেছে, যেগুলোর প্রকাশ আজও তাদের মানসপটে রয়ে গিয়েছে। যেমন, গর্ভধারণ, শিশুকে স্তন্যপান করানো সহ বহুকিছুর অভিযোজনগত সমাধান জৈবিকভাবে করতে হয়েছে কেবলমাত্র নারীকেই। আবার অন্য দিকে অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তার সংশয় সংক্রান্ত ঈর্ষা নিয়ে জুঝতে হয়েছে মূলত পুরুষকেই, নারীকে নয়। এগুলোর পার্থক্য সূচক প্রভাব নারী পুরুষের শরীরে এবং

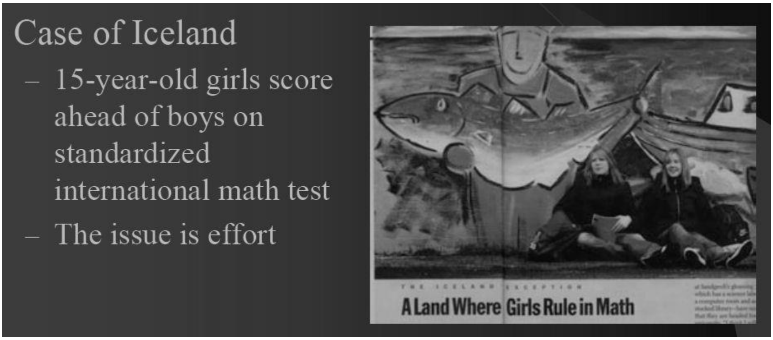
মনোজগতে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়।

বিভিন্ন সমস্যা নারী পুরুষ যেমন ভিন্নভাবে যেমন সমাধান করেছে, তেমনি আবার অতীতের পৃথিবীতে বহু অভিযোজনগত সমস্যাই ছিল যেগুলো আবার তারা সমাধান করেছে প্রায় একই রকমভাবে, একই পদ্ধতিতেই। যেমন, নারী পুরুষ উভয়েরই দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের জন্য সঠিক সঙ্গী খুঁজে নিতে হয়েছে, তাদেরকে বুঝতে হয়েছে তার সঙ্গী তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকবে কিনা, সন্তানকে বড় করলে তুলার ব্যাপারে শতভাগ নিয়োজিত থাকবে কি না ইত্যাদি। ভালোবাসা, সম্পর্কের স্থায়িত্ব, সুস্থ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি প্রভৃতি বহু ব্যাপারে নারীপুরুষের চাহিদাগুলো নির্বিশেষে একইরকমই হয়[181]। নারী পুরুষ উভয়েই চায় নিজেরা সুখী হতে, নিজেদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত এবং সুখী দেখে যেতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব প্রভৃতির ব্যাপারে কারো অবদানই কম নয়। বিজ্ঞানী জেনেট শিবলী হাইড তার একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, নারীপুরুষের পার্থক্যসূচক অভিব্যক্তিগুলোর চেয়ে তাদের মধ্যে জেন্ডারগত সাম্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়[182]। নারীবাদী বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, যৌনতার বৈচিত্র্য এবং শারীরিক আগ্রাসনসহ কিছু ক্ষেত্রে একটি নারীর সাথে একটি পুরুষের পার্থক্য রয়েছে সত্য[183], কিন্তু সেটা জেন্ডারগত সাম্যকে লঙ্ঘন করে না, বরং আন্তঃযৌনতা প্রতিযোগিতা (intrasexual competition) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়[184]। রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিকাগো মেডিকাল স্কুল) বিজ্ঞানী লিসি এলিয়ট তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, নারী পুরুষের মধ্যে শারীরিক এবং জৈবিক দিক থেকে পার্থক্য আছে, কিন্তু সেই পার্থক্যগুলো এমন কিছু বড় নয়। বহুক্ষেত্রেই ছেলেদের বাচনক্ষমতা, সহমর্মিতা যেমন চেষ্টা করলে বাড়ানো যায়, ঠিক তেমনি আবার মেয়েদের গাণিতিক কিংবা

---

[181] D.M. Buss &, D. P. Schmitt, Evolutionary Psychology and Feminism. Sex Roles, 64, 768-787, 2011.
[182] J. S. Hyde, The gender similarities hypothesis. The American Psychologist, 60, 581–592, 2005
[183] M. B. Oliver, & J. S.Hyde, Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 29–51, 1993.
[184] J. Archer, Does sexual selection explain human sex differences in aggression? The Behavioral and Brain Sciences, 32, 249–311, 2009.

ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপণের ক্ষমতাগুলোও বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে[185]। যেমন, দেখা গেছে, গণিত বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে চেষ্টা করলে নারীরা শুধু পুরুষদের সমান নয়, এমনকি ছাড়িয়েও যেতে পারে। আসলে জগতের বহু বিষয় যেগুলো একসময় কেবল 'পুরুষদের এলাকা' বলে চিহ্নিত করা হতো, সেগুলোতে নারীরা কেবল পদার্পণই করেনি, ছাড়িয়েও গিয়েছে। যেমন, সারা পৃথিবীতে গণিতকে ঢালাওভাবে 'পুরুষদের' আধিপত্যময় বিষয় বলে বিবেচনা করা হলেও দেখা গেছে আইসল্যান্ডে মেয়েরা গড়পড়তা ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো ফলাফল করেছে[186]।



চিত্র: গণিত এবং বিজ্ঞানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনাগ্রহ এবং অসফলতার কথা ঢালাওভাবে মিডিয়ায় বলা হলেও আইসল্যান্ডে গণিতে গড়পড়তা নারীরাই পুরুষদের চেয়ে অনেক ভালো ফলাফল করছে।

আবার ছেলেরা গড়পড়তা যে সব ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে দুর্বল—বিশেষত সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিংবা সহমর্মিতা আর সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমে সেগুলোর অব্যাহতভাবে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে অনেক ছেলেরই। কাজেই উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এবং সঠিক প্রচেষ্টা থাকলে নারী পুরুষ সবার পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব। পাথরের গায়ে কখনোই খোদাই করে লেখা নেই—নারীরা 'ইহা পারিবে', আর পুরুষেরা 'উহা'। বরং অভিন্ন মানববৈশিষ্টের বহু

---

[185] Lise Eliot, The Truth about Boys and Girls, Scientific American Mind, April 1, 2010.
[186] Vivienne Walt , The Iceland Exception: A Land Where Girls Rule in Math, Feb. 27, 2005

কিছুই আমরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে ধারণ করি, এবং নিজ নিজ পছন্দ, অভিরুচি এবং আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলোর পরিস্ফুটন ঘটাই।





চিত্র: ছেলেরা গড়পড়তা যে সব ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে দুর্বল বলে চিহ্নিত - বিশেষতঃ সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিংবা সমবেদনা বা সহমর্মিতা প্রদর্শন কিংবা সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে - সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমে সেগুলোর অব্যাহতভাবে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন, ছেলেদের তার বোন, সাথী কিংবা সমরূপ কারো সাথে ছোটবেলা থেকেই পুতুল খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের এবং পরিচর্যামূলক দক্ষতাগুলো বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই।

এই জায়গায় আমার মতে, নারীদের নিয়ে একটু বেশি বলা দরকার, যেহেতু সামাজিক স্টেরিওটাইপিং এর ব্যাপারগুলো মূলত নারীদের ঘিরেই, এবং সেগুলো নারীদের অবদমনের কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। একটা সময় ছিল যখন নারীদের পুরুষের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। অথচ উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আজ দেখা যাবে, নারীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন, সবচেয়ে দুর্গম, এবং মেধাশীল ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত মহাকাশযাত্রায় নারীদের অবদানের কথাই বলা যাক। সোভিয়েত নারী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ছিলেন প্রথম মহাকাশ বিজয়ী নারী, এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানি না, বর্তমানে নাসার বহু

উল্লেখযোগ্য মহাকাশ মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুদক্ষ নারীরা। যেমন, আইলিন কলিনস ১৯৯৯ সালের স্পেস শাটলের প্রথম মহিলা কমান্ডার হিসেবে কলাম্বিয়া মিশনের সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর আগে তিনি মার্কিন বিমান বাহিনীর সি-১৪১ বিমানের প্রধানের দায়িত্বেও ছিলেন । ২০০৭ সালের স্পেস শাট্‌ল ডিস্কভারি এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের মিলনের সময় উভয়েরই প্রধান ছিলেন নারী। ডিস্কভারির নেতৃত্বে ছিলেন পামেলা মেলরয় আর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের দায়িত্বে ছিলেন পেগি হুইট্‌সন। নাসায় কর্মরত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রয়াত ড. কল্পনা চাওলাও কলম্বিয়া মিশনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহাকাশচারণায় যথেস্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন; এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ পিএইচডি ডিগ্রি ছিল তার। আরেকজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী মার্কিন নভোচারী শ্যানন লুসিড একসময় মহাকাশে দীর্ঘতম সময় কাটানোর রেকর্ড সৃস্টি করেছিলেন। এ ছাড়া ড. স্যালী রাইডের কথাও অনেকে জানেন যিনি স্পেস শাট্‌লের প্রথম মহিলা সদস্য হন ১৯৮৩ এ। মহাকাশ জয়ে এখনও অবদান রাখতে না পারলেও বাঙালি মেয়েরা পিছিয়ে নেই যাত্রীবাহী বিমান চালনায়। যেমন, বাংলাদেশ বিমানের ইয়াসমিন রহমান এশিয়ার প্রথম মহিলা ডিসি-১০ বিমানের ক্যাপ্টেন হবার গৌরব অর্জন করেন ১৯৯১ তে। ডিসি-১০ বিমানের ক্যাপ্টেন হয়ে পাঁচ বছর বিমান চালাবার পর রাজনৈতিক কারণে তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ইয়াসমিন রহমানের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। স্থাপত্যবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে পাঁচ বছর স্থপতির পেশায় নিয়োজিত থেকে আবার সাফল্যের সাথে পরীক্ষা দিয়ে সক্রিয় বিমান চালনায় প্রত্যাবর্তন করে বিমানের এয়ারবাস এর ক্যাপ্টেন হন ২০০১ সালে। নারীদের জন্য তিনি এক উজ্জীবিত উদাহরণ। পাশাপাশি বাংলাদেশের সুলেখক এবং গবেষক সেলিনা হোসেনের কন্যা ফারিয়া লারার কথাও আমরা জানি, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন একজন সফল পাইলট। ১৯৯৬ সালে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অফ বাংলাদেশের কাছ থেকে তিনি প্রাইভেট পাইলটের লাইসেন্স অর্জন করেন। এর দু'বছর পরে ১৯৯৮ সালের ১৯ শে মার্চ লারা বাণিজ্যিক পাইলট

হওয়ার লাইসেন্স পান। তিনি এরপরই পাইলটদের প্রশিক্ষক হবার প্রশিক্ষণ দেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী যিনি এই পেশায় আসেন। ১৯৯৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু না হলে তিনিই হতেন বাংলাদেশের প্রথম নারী পাইলট প্রশিক্ষক।

মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারীরা সব পারে' নামের একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশের পাপিয়া নামের এক সাহসী মেয়ের উদাহরণ নিয়ে এসেছিলেন[187]। ১৯৯৮ সালের দিকে পাপিয়া জীবিকার তাগিদে ঢাকার রাস্তায় রিকশা চালাতে শুরু করে ইতিহাস সৃস্টি করেছিলেন। পাপিয়া তার রিক্সায় বাহক নারী নাকি পুরুষ তা বিচার না করে সবাইকে বহন করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটাই বোধহয় প্রথম আর শেষ উদাহরণ। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা এখনও এরকম দুঃসাহসিক কাজে মেয়েদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সামাজিক বাস্তবতার জন্য মেয়েরা বাসের ড্রাইভার বা কন্ডাক্টরও হয়তো হতে পারবেন না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, যদিও ট্রাফিক ও যাত্রীসংখ্যার দিক দিয়ে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক আর ঢাকার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই তবু সিঙ্গাপুর শহরে কিংবা ব্যাংককে মেয়ে বাসকন্ডাক্টর এক অতি পরিচিত দৃশ্য। আমি নিজেই দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে থেকেছি। বহুবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এমন বাসে আমার উঠতে হয়েছে যেখানকার চালক পুরুষ নন, নারী। শুধু বাসের চালক বা কন্ডাক্টর হওয়া নয়, রাস্তায় রাস্তায় ফটোকপি মেশিন চালনা, মাল পরবহন, মালামালের ক্রয়বিক্রয় সহ সব ধরনের মানসিক এবং শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অংশগ্রহণ করেছে সমান তালে।

সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সময়ের একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে এ প্রসঙ্গে। ১৯৯৯/২০০০ সালের ঘটনা। আমি তখন সবেমাত্র বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে পাড়ি

---

[187] অপার্থিব, আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ নারীরা সব পারে -১, মুক্তমনা, ২৩ ফাল্গুন ১৪১৬ (মার্চ ৭, ২০১০)

দিয়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে মাস্টার্স করছি। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে সিঙ্গাপুরের ক্লেমেন্টি এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতাম, আর সেখান থেকে বাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম। বাসে সিটের তুলনায় যাত্রী উঠতো বেশি, অনেকটা ঢাকা শহরের বাসগুলোর মতোই। বাসের সিট ভরে যাওয়ার পর অনেক যাত্রীকেই দাঁড়িয়ে যেতে হতো—তাদের মধ্যে নারী পুরুষ সবাই থাকতেন। স্বভাবতই আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে সবেমাত্র এসেছি তাদের জন্য ব্যাপারটা ছিল খুব অস্বস্তিকর। আমরা সব তাগড়া জোয়ানেরা সিট দখল করে বসে আছি, আর হয়তো পাশেই একটি মেয়ে পুরো রাস্তা বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু সাইফুল ছিল খুব মানবদরদি টাইপের। একদিন ঠিক তার সিটের পাশেই একটি নরমসরম মেয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দেখে থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজ সিটে মেয়েটিকে বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু মেয়েটি তাতে খুশি হলো না মোটেই, বরং অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,

- 'আপনার জায়গায় কেন আমি বসব?'—অবাক চোখে প্রশ্ন মেয়েটির।

- 'কারণ, আপনি দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। আর আমি বসে ...'—সাইফুলের জবাব।

- 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি বসলে তো আবার আপনাকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়'।

- 'তাতে অসুবিধা নেই'।

- 'আমার আছে। আপনি তো আমার আগে বাসে উঠেছেন, আপনি কেন আমার জন্য সিট ছেড়ে দেবেন? আর দিলেই বা আমি বসব কেন?'

- 'কিন্তু আপনি তো মেয়ে...' আমতা আমতা কণ্ঠ সাইফুলের।

- 'মেয়ে তো কী হয়েছে? আমি তো আর অথর্ব নই। আপনি যেভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, আমি ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। এতে তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

-'তা বটে, কিন্তু ...'

- 'আমরা এখানে কেবল বয়োবৃদ্ধ নাগরিক বা সিনিয়র সিটিজেনদের কিংবা পঙ্গু বা প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন ছেড়ে দেই। অন্য কারো জন্যে নয়।

আপনাদের দেশে কি নিয়ম আলাদা?’

- ‘হ্যাঁ, আমাদের দেশে বাসে নারীদের জন্য আলাদা আসন থাকে। কোনো নারী দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা তাদের জন্য আসন ছেড়ে দেই। নইলে অভদ্রতা করা হয়। আমি ভেবেছিলাম এই ভদ্রতার ব্যাপারটা সব জায়গায় একই রকম হবে...।’

- ‘কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন, যে এই ভদ্রতার আড়ালে একটি মানসিকতা কাজ করছে যে, নারীরা অথর্ব, তারা আপনাদের মতো দাঁড়িয়ে বাসে করে যেতে পারবেন না...’।

ঘটনার অনেক দিন পার হয়ে গেলেও এই সংলাপগুলো আমার এখনও মনে আছে—আমার, সাইফুলের দুজনেরই। ‘এই ভদ্রতার আড়ালে একটি মানসিকতা কাজ করছে যে, নারীরা অথর্ব’—মেয়েটির এই ধাক্কার জের আমাদের বহন করতে হয়েছিল অনেকদিন।

আসল কথা হলো, সভ্যতার বিনির্মাণে কারো অবদানই কম নয়, দুজনেই একে অন্যের পরিপূরক। নারী পুরুষ উভয়েই সভ্যতা তৈরিতে অবদান রেখেছে বিপুলভাবে, এ নিয়ে কারোই কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অধ্যায়টি শেষ করছি কাজী নজরুল ইসলামের ‘নারী’ কবিতাটি থেকে অবিস্মরণীয় কিছু লাইন তুলে দিয়ে -

‘বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী।

...

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নি বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে

কত নারী দিল সিঁথির সিদুর, লেখা নাই তার পাশে।

...

কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি, কত বোন দিল সেবা
বীর স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী'।

...

সে যুগ হয়েছে বাসি
যে যুগে যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক, নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি!

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবন মানে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা,
যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা'
... (নির্মলেন্দু গুণ)

মানবিকতার নমুনা

অনেকেই খুব সরল চিন্তাভাবনা থেকে ধরে নেন, মানুষ বোধ হয় খুব শান্তিপ্রিয় একটা জীব, আর সহিংসতা জিনিসটা পুরোটাই কেবল পশুদের প্রবৃত্তি। এই পশুপ্রবৃত্তিকে মানুষ আবার আলাদা করে 'পাশবিকতা' বলে ডাকে। এমন একটা ভাব যে, আমরা মানুষেরা তো আর পশু নই, আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা কি আর পশুদের মতো সহিংসতা, খুন ধর্ষণ, হত্যা—এগুলোতে জড়াই? আমরা মানব। পাশুদের কাজ 'পাশবিক' আর আমাদের কাজ সব 'মানবিক'। তো, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের এই খোদ বিংশ শতাব্দিতে ঘটানো কিছু 'মানবিক' কাজের খতিয়ানে নজর দেয়া যাক[188]—

[188] cited from various known statistics including -

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় দেড় কোটি লোক, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক ।

- পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের নয় মাসের মধ্যে ৩০ লক্ষ বাংলাদেশিকে হত্যা করে, ধর্ষণ করে প্রায় ২ লক্ষ নারীকে।
- ল্যাঙ্গেট সার্ভে অনুযায়ী আমেরিকার ইরাক দখল এবং যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৬ লক্ষের উপর ।

- খেমাররুজ বাহিনী কম্বোডিয়ায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে হত্যা করে অন্তত ২০ লাখ মানুষকে।

- চীনে চেয়ারম্যান মাও-এর শাসনামলে গৃহযুদ্ধ দুর্ভিক্ষসহ নানা কারণে মারা যায় ৪ কোটি লোক। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়েই মৃত্যুসংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৩০ লক্ষের উপর। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে ২ কোটি লোক, ১০ লাখ লোখ ভিয়েতনামে, ২০ লাখ লোক উত্তর কোরিয়ায়, ২০ লাখ লোক কম্বোডিয়ায়, ১০ লাখ লোক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে, দেড় লাখ লোক পূর্ব ইউরোপে, ১৭ লাখ লোক আফ্রিকায়, ১৫ লাখ লোক আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসনামলে নিহত হয়।

- বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকার আধিপত্যের ঝান্ডার উদাহরণগুলোও এখানে প্রাসঙ্গিক। মার্কিন আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ই উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গমাইল

Case Study: Genocide in Bangladesh, 1971; Lancet surveys of Iraq War casualties;
Surveillance for Fatal and Nonfatal Injuries – 2001, Centers for Disease Control and Prevention National Vital Statistics System;
World Report on Violence and Health, World Health Organization, 2002;
Report on Terrorist Incidents, 2006 (issued April 2008), National Counterterrorism Center (NCTC);
Selected Death Tolls for Wars, Massacres and Atrocities Before the 20th Century
Marc Hauser, Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, Harper Perennial, 2007 etc.

জায়গার ওপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্য ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমনকি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিল দেশের অনেক জায়গায়। নিউজ উইকের এক সাংবাদিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে কাজ করতেন, তিনি লিখেছেন নাৎসিরা বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন তাকেও হার মানিয়েছিল। ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকাণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক ঘৃণ্য অধ্যায়। ১৯৬৮ সালের ১৬ই মার্চ সকাল সাড়ে তিনটায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনবাহিনী দক্ষিণ চীন সাগরের উপকুলে একটি ছোট্ট গ্রাম মাইলাইতে প্রবেশ করে, এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের উপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ ৩৪৭ জন গ্রামবাসীকে কয়েকঘণ্টার মধ্যে হত্যা করে। নারী আর শিশুদের বিকৃত উপায়ে ধর্ষণ করে ওই আবু-গারিবের কয়েক ডিগ্রি উপরের মাত্রায়। গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন এতই ভয়াবহ ছিল যে, খোদ মার্কিনবাহিনীরই দুই-একজন (হিউ টমসন)-এর বিরোধিতা করে গ্রামবাসীর পক্ষে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ায়। অনেকদিন ধরে সারাবিশ্ব এই ঘটনা সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারেনি। এ ধরনের বহু নজিরবিহীন ধ্বংসলীলা ঘটেছে দেশে-দেশে রক্তলোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যের হাতে এই বিংশ শতাব্দীতে।

- সাড়া বিশ্বে প্রতি বছর পাঁচ হাজার নারী মারা যায় ‘অনর কিলিং’-এর শিকার হয়ে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে এই মৃত্যুর হার সর্বাধিক।

- সাড়া বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১৪ লক্ষ নারী ধর্ষণ এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। হাই স্কুলে গমনরত প্রায় ১৭ ভাগ ছাত্রী কখনো না কখনো শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, ১২ ভাগ ছাত্রী শিকার হয়

যৌন নিগ্রহের।

- আন্তর্জাতিকভাবে প্রতি বছর সামাজিক নিপীড়ন, ধর্ষণ, হেনস্থাসহ বিভিন্ন কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় দশ লক্ষ লোক।
- সাড়া বিশ্বেই প্রায় ১৬ লক্ষ লোক সহিংসতার শিকার হয়ে মারা যায়। তার অর্ধেকই মারা যায় আত্মহত্যায়, এক তৃতীয়াংশ গণহত্যায় এবং এক-পঞ্চমাংশ সশস্ত্র সংঘাতে।
- প্রতি বছর সাড়া দুনিয়া জুড়ে চোদ্দ হাজারেরও বেশি সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ঘটে, মৃত্যুবরণ করে ২২০০০ লোক।
- দলীয় কোন্দল, অস্ত্রবাজি প্রভৃতির শিকার হয়ে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রতি বছর মারা যায় পনেরো থেকে পচাত্তুর জন লোক, আর ব্রাজিল, দক্ষিন আফ্রিকা, কলম্বিয়া আর আমেরিকায় এই সংখ্যা বছরে দশ হাজার থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

চিন্তা করে দেখুন—উপরে আমাদের 'মানবিক' কীর্তিকলাপগুলোর যে গুটিকয় হিসাব-কিতাব উল্লেখ করেছি তা কেবল এই বিংশ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী সময়ের ঘটনা। বিশাল সিন্ধুর বুকে কেবল বিন্দুমাত্র, তাই না? কিন্তু তারপরেও 'মানবিক বীভৎসতার' সামান্য নমুনা দেখেই যে কারো চক্ষু চরকগাছ হতে বাধ্য।

হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র আর আধুনিক অস্ত্র সস্ত্রের ঝনঝনানি বৃদ্ধি পাওয়াতেই বোধ হয় সহিংসতা বিংশ শতাব্দীতে এত মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। আগেকার পৃথিবীর সময়গুলো নিশ্চয় খুব শান্তিময় ছিল। আমাদের বুড়ো দাদা-দাদি কিংবা বয়োবৃদ্ধদের প্রায়ই সুর করে বলতে শুনি—'তোরা সব গোল্লায় যাচ্ছিস, আমাদের সময়ে আমরা কত ভালো ছিলাম'। তো আপনিও যদি আপনার দাদা-দাদি আর বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো সেরকমই ভেবে থাকেন যে, 'দিন যত এগুচ্ছে সমাজ তত অধঃপতিত হচ্ছে', তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বড়সড় বিস্ময়।

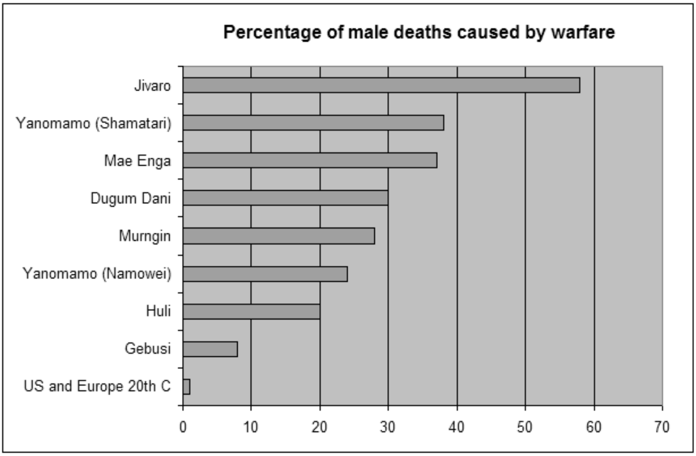
স্টিভেন পিঙ্কারের উদ্ধৃতি দিয়েই বলি[189] —

> আসলে আমরা আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতেই তুলনামুলকভাবে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং সহিষ্ণু সময় অতিক্রম করছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বর্বর।

হয়তো পিঙ্কারের কথাটা অত্যুক্তি মনে হবে। কিন্তু আপনি যদি নিরপেক্ষভাবে মানব জাতির ইতিহাসের পাঠ নেন, এবং তথ্য বিশ্লেষণ করেন তাহলে আর সেটাকে অবাস্তব কিংবা অত্যুক্তি কোনোটাই মনে হবে না। আসুন, সেটার দিকে একটু নজর দেই।

আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ যারা প্লেইস্টোসিন যুগের পুরো সময়টাতে শিকারি সংগ্রাহক হিসেবে জীবনযাপন করত তাদের জীবনযাত্রা থেকে কিছু বাস্তব পরিসংখ্যান হাজির করা যাক। ১৯৭৮ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্যারোল এম্বার তার গবেষণায় দেখান যে, আদিম যুগে শিকারি সংগ্রাহক সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ গোত্রই হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত থাকত আর এর মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংগঠিত হতো প্রতি দুই বছরের মধ্যেই[190]। প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেন্স কিলী (Lawrence Keeley) আধুনিক বিশ্বে বিংশ শতাব্দিতে ঘটা ইউরোপ আমেরিকার সহিংসতার সাথে আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিংসতার তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন যুদ্ধে যে হারে মানুষ মারা গেছে (দুই বিশ্ব যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা গোনায় ধরেও) সেটা আদিম কালে আমাদের পূর্বপুরষদের সহিংসতার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য[191]।

[189] A Biological Understanding Of Human Nature: A Talk With Steven Pinker, Science at the Edge, 2008
[190] Ember, Carol R. 1978 Myths about Hunter-Gatherers Ethnology. 17 (4) 439-448
[191] Lawrence H. Keeley, War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, Oxford University Press, USA, 1997



চিত্র – আদিম কালের শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ এবং আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সমাজের তুলনামূলক রেখচিত্র (প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেন্স কিলীর 'ওয়ার বিফোর সিভিলাইজেশন' থেকে সংগৃহিত)।

উপরের গ্রাফটি লক্ষ করুন। উপর থেকে শুরু করে প্রথম আটটি গ্রাফ শিকারি সংগ্রাহক সমাজের। আর শেষটি যেটি 'প্রায় অদৃশ্যমান' অবস্থায় কোনো রকমে অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, সেটি আধুনিক কালের সহিংসতার নিদর্শন। গ্রাফটি দেখলেই আপনি তুলনামূলক সহিংসতার নমুনাটি বুঝতে পারবেন, আধুনিক কালের তুলনায় আদিমকালে সহিংসতা কি হারে বেশি ছিল। এখনও মানবসমাজে নিউগিনি হাইল্যান্ডস এবং আমাজন এলাকায় কিছু আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। সেখানকার জিভারো (Jivaro) কিংবা ইয়ানোমামোর (Yaņomamö) শিকারি সংগ্রাহক সমাজে যে পরিমাণ সহিংসতা হয় তাতে একজন ব্যক্তির অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ সম্ভাবনা থাকে আরেজন শিকারির হাতে মারা যাওয়ার, সেখানে গেবুসিতে (Gebusi) সেই সম্ভাবনা শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। আর আধুনিক সমাজে সেটা ২ ভাগেরও কম। আদিম সমাজে যে হারে মারামারি কাটাকাটি চলতো, সেই হারে আধুনিক সমাজ পরিচালিত হলে বিংশ শতাব্দীতে একশ মিলিয়ন নয়, দুই বিলিয়ন মানুষ মারা যেত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সেই হিসেবে আমরা পিছাইনি, বরং এগিয়েছি।

প্রাচীনকালে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের উপর যেভাবে অত্যাচার করা হতো তা শুনলে আজকের নরম হৃদয়ের মানুষেরা অক্কা পাবেন নিঃসন্দেহে। এক গোত্র আরেক গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে শুধু 'স্পয়েল ওব ওয়ার' হিসেবে নারীদের ধর্ষণ, উপভোগ কিংবা দাস তো বানাতোই (এগুলো ছিল একেবারেই মামুলি ব্যাপার), যুদ্ধবন্দিদের বসিয়ে রেখে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চোখ উপড়ে ফেলা হতো, হাত পা কেটে ফেলা হতো, অনেক সময় আবার আয়েশ করে উপড়ানো মাংস ভক্ষণও করা হতো আনন্দের সাথে[192, 193]। পাঠকদের হয়তো বর্ণনাগুলো পড়ে বিকৃত হরর ছায়াছবির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আজকের দিনের হরর ছায়াছবিগুলোই ছিল সেসময়ের নির্মম বাস্তবতা। সে সময় যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো নিয়মনীতি ছিল না, ছিল না কোনো 'জেনেভা কনভেনশন', ছিল না নারী কিংবা শিশুদের প্রতি কোনো বিশেষ সুব্যবহারের নির্দেশ। একতরফাভাবে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে কচুকাটা করাই ছিল যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা পারতপক্ষে মারামারি হানাহানি খুনোখুনি একদম বাদ না দিতে পারলেও অনেকটাই কমিয়ে এনেছি বলা যায়। এমনকি যুদ্ধের সময়ও কিছু 'এথিক্স' পালন করি, যেমন, বেসামরিক জায়গায় হত্যা, লুণ্ঠন, বোমাবাজিকে নিরুৎসাহিত করি, যুদ্ধবন্দিদের উপর যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানবিক ব্যবহার করার চেষ্টা করি। এর পেছনে গণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, মানবিক অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। শুধু তাই নয়, আমাদের সভ্য জীবনযাত্রা লক্ষ করুন। অনেক কিছুতেই আমরা প্রাণপণে 'পলিটিকালি কারেক্ট' থাকার চেষ্টা করি। বক্তব্যে কিংবা লেখায় উপজাতির বদলে বলি আদিবাসী, নিগ্রো শব্দের বদলে বলি আফ্রিকান আমেরিকান। সভ্য সমাজে অফিস আদালতে কাজ যারা করেন তারা সচেতন থাকেন আরও একধাপ বেশি— লক্ষ রাখেন কারো ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার কিংবা বয়স নিয়ে কোনোক্রমেই যেন বক্রোক্তি যেন

[192] Michael Ghiglieri, The Dark Side Of Man, Basic Books, 2000

[193] Lawrence H. Keeley, War Before Civilization, পূর্বোক্ত।

প্রকাশিত না হয়ে যায়। আমরা আজ সমবেতভাবে গ্লোবাল ওয়্যার্মিং নিয়ে দুশ্চিন্তা করি, বিলুপ্তপ্রায় পান্ডা কিংবা মেরু ভল্লুকদের রক্ষার ব্যাপারে আমাদের মন কেঁদে উঠে অহর্নিশি। অথচ এই ষোড়শ শতকে আমাদের 'মহা শান্তিপ্রিয়' পূর্বপুরুষেরাই প্যারিসের রাস্তায় জীবন্ত বিড়াল দড়িতে ঝুলিয়ে দিত, তারপর তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত। সেই জীবন্ত বিড়াল যখন আগুনে পুড়ে ব্যথায় কোঁকাতে থাকত, সেটা ছিল তাদের বিনোদনের উৎস। বিড়ালের চারপাশে সমবেত জনতা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত। তাদের চোখের সামনে অসহায় বিড়ালটি একদল পাষণ্ড লোকের বিনোদনের খোড়াক যোগাতে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যেতো[194]।

মিথ অব নোবেল স্যাভেজ

কিন্তু যত আশাবাদীই হই কিংবা হওয়ার অভিনয় করি না কেন, সত্যি বলতে কী মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস আসলে শেষ পর্যন্ত সহিংসতারই ইতিহাস। যে কোনো প্রাচীন ইতিহাসভিত্তিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোতে চোখ রাখলেই দেখা যায় এক রাজা আরেক রাজার সাথে যুদ্ধ করছে, কেউ ষড়যন্ত্র করছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য, কেউবা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণের জন্য মুখিয়ে আছে, কখনো গ্ল্যাডিয়েটরদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায়, কখনো বা নরবলি দেয়া হয়েছে কিংবা কুমারী নারী উৎসর্গ করা হয়েছে রাজ্যের সমৃদ্ধি কামনায়। আমরা ইতিহাসের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে যত পেছনের দিকেই যাই না কেন, এ ধরনের যুদ্ধ এবং অমানবিক নৃশংসতার হাত থেকে আমরা নিস্তার পাই না। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা কেউ বা যুদ্ধ করেছে লাঠিসোটা দিয়ে, কেউ বা বল্লম দিয়ে, কেউ বা তীর ধনুক দিয়ে কিংবা কেউ বুমেরাং ব্যবহার করে। আদিম গুহাচিত্রগুলোতে চোখ রাখলেই দেখা যায় তীক্ষ্ণ সেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তারা পশু শিকার করেছে, কখনো বা হানাহানি মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যেই। তারপরেও আমাদের স্কুল কলেজের বইপত্রে শেখানো হয়েছে কিংবা

---

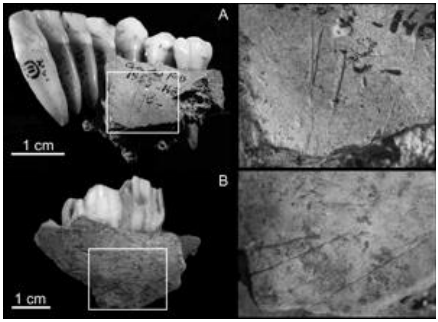
[194] Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004), pp. 170

জনপ্রিয় মিডিয়ায় বহুদিন ধরে বোঝানো হয়েছে আমরা নাকি খুব শান্তিপ্রিয় জীব। আমরা পশুদের মতো নির্বিচারে হানাহানি মারামারি করি না। আসলে মানুষ খুব 'শান্তিপ্রিয় প্রজাতি'—সমাজে গেড়ে বসা এই মিথটিকে স্টিভেন পিঙ্কার তার ব্ল্যাঙ্ক স্লেট চিহ্নিত করেছেন 'মিথ অব নোবেল স্যাভেজ' (Myth of Nobel Savage) হিসেবে। অবশ্য এই অযাচিত মিথটিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের অবদানও ফেলে দেবার মতো নয়। তারা প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলেন আমাদের অন্ধকার জীবনের ইতিবৃত্তগুলো বেমালুম চেপে গিয়ে একধরনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জনমানসে প্রোথিত করতে। সে সব 'শান্তিকামী নৃতত্ত্ববিদেরা' এক সময় সোৎসাহে বলে বেড়াতেন যে, ছোটখাটো যুদ্ধ টুদ্ধ হলেও মানবেতিহাসের পাতায় কোনো নরভক্ষণের (canabalism) দৃষ্টান্ত নেই। তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের কথা গিলতে শুরু করলেন যখন সহিংসতা, হানাহানি, যুদ্ধ, হত্যা এবং এমনকি নরভক্ষণেরও গণ্ডায় গণ্ডায় আলামত বেরিয়ে আসতে শুরু করল। প্রাথমিক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় আটশ হাজার বছর আগেকার পাওয়া ফসিলের আলামত থেকে। অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রিস্টি জি. টার্নার বহু পরিত্যক্ত মানব হাড়-গোড় বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, সেগুলো আসলে রান্না করে ভক্ষণ করা হয়েছিল, আর তা করেছিল সমসাময়িক মানুষেরাই। তাদের সে সময়কার থালা-বাসন এবং অন্যান্য রন্ধন সামগ্রীতেও মায়োগ্লোবিনের (পেশী প্রোটিন) নিদর্শন স্পষ্ট[195]। এমনকি আমরা হোমোস্যাপিয়েন্সরা আজ থেকে ৫০,০০০ বছর আগে নিয়ান্ডার্থালদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম এবং সম্ভবত তাদের অবলুপ্তির কারণ ছিলাম আমরাই—শান্তিপ্রিয় আধুনিক মানবদের পুর্বসূরীরা[196]। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে শানিদার গুহায় পাওয়া বিভিন্ন আলামত আর রালফ সোলেকি[197] এবং স্টিভেন চার্চিলের গবেষণা থেকে জানা গেছে সম্ভবত আধুনিক হোমোস্যাপিয়েন্স মানুষের নিক্ষিপ্ত

[195] Ann Gibbons, Archaeologists Rediscover Cannibals, Science, Vol. 277. no. 5326, pp. 635 - 637, 1997
[196] Jane Bosveld, "Did We Mate With Neanderthals, or Did We Murder Them?", Discover Magazine, November 2009
[197] Ralph S. Solecki, Rose L. Solecki, Anagnostis P. Agelarakis, "The Proto-Neolithic Cemetery in Shanidar Cave", 2004

অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতেই নিয়ান্ডার্থালদের মৃত্যু হয়। শানিদার গুহায় পাওয়া নিয়ান্ডার্থালদের ফসিলের ক্ষতের সাথে আধুনিক মানুষের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হালকা বর্শার আঘাতের সামঞ্জস্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়[198]। শুধু তাই নয়, গবেষক ফার্নান্ডো রেমিরেস রোসির গবেষণা থেকে জানা গেছে, কিছু জায়গায় যুদ্ধজয়ের পরে হোমোস্যাপিয়েন্সরা ঘটা করে নিয়ান্ডার্থালদের মাংস ভক্ষণ করে উৎসব পালন করত। অধ্যাপক রোসি স্পষ্ট করেই বলেন, ‘এটা পরিষ্কার যে, আধুনিক মানুষেরা নিয়ান্ডার্থালদের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করেছিল’[199]।





চিত্র: (ক) স্টিভেন চার্চিলের হাতে দুই ধরনের অস্ত্রের মডেল । বাম হাতে নিয়ানডার্থালদের ভারী অস্ত্র, আর ডান হাতে আদিম আধুনিক মানুষের হাল্কা বর্শা জাতীয় অস্ত্র, যার আঘাতের ছাপ নিয়ান্ডার্থালদের ফসিলে স্পষ্ট। (খ) ফার্নান্ডো রেমিরেস রোসির আলামত থেকে স্পষ্ট যে, হোমোস্যাপিয়েন্সরা নিয়ান্ডার্থালদের সাথে কেবল যুদ্ধই করেনি, তাদের মাংসও ভক্ষণ করেছিল একসময়।

পুরুষালি সহিংসতা

আগের অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছি পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সহিংস, এবং

---

198 শিক্ষানবিস, শানিদার গুহার নিয়ানডার্থালেরা, মুক্তমনা।

199 Jane Bosveld, “Did We Mate With Neanderthals, or Did We Murder Them?”, Discover Magazine, November 2009

তার কারণ আমাদের বৈজ্ঞানিকভাবেই বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমার আলোকে খুঁজতে হবে। বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিল হান্টার বা শিকারি, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরি বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে আর সম্পত্তি আর নারীর দখল নিতে। জন টুবি, লিডা কসমাইডস, রিচার্ড র‍্যাংহাম তাদের বেশ কিছু গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে ট্রাইবাল সোসাইটিগুলোতে সহিংসতা শক্তিশালী পুরুষদের উপযোগিতা দিয়েছিল টিকে থাকতে, এবং তারা সেসময় যুদ্ধ করত নারীর দখল নিতে[200]। এমনকি এখনকার ট্রাইবাল সমাজগুলোতে এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ভেনিজুয়ালার আদিম ট্রাইব ইয়ানোমামো (Yąnomamö)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই ট্রাইব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ করেন—

> এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করে না, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও।

দেখা গেল ট্রাইবে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত

---

[200] Tooby, J., and L. Cosmides. "The Evolution of War and Its Cognitive Foundations." Proceedings of the Institute for Evolutionary Studies, 88 (1988): 1–15.
Wrangham, R. W. "Evolution of Coalitionary Killing." Yearbook of Physical Anthropology 42 (1999): 1–30.

বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, গবেষকরা ইতিহাসের পাতা পর্যালোচনা আর বিশ্লেষণ করে বলেন, বিশেষত প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসে চেঙ্গিস খানের (১১৬৭-১২২৭) মতো যুদ্ধবাজেরা একেকটি একটি বড় উদাহরণ। চেঙ্গিস খান শুধু যুদ্ধই করতেন না, যে সাম্রাজ্যই দখল করতেন, সেখানকার নারীদের ভোগ করতেন উৎসাহের সাথে। তিনি বলতেন[201],

> সর্বোত্তম আনন্দজনক ব্যাপার নিহিত রয়েছে শত্রুকে ধ্বংসের মধ্যে, তাদেরকে তাড়া করার মধ্যে আর তাদের যাবতীয় সম্পদ লুটপাটের মধ্যে, ধ্বংসের আর্তনাদে আক্রান্তদের আপনজনের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি ঝরা অবলোকন করতে, তাদের অশ্বের দখল নিতে, আর তাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের নগ্ন শরীরের উপর উপগত হতে।

পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনও চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে— প্রতিটি যুদ্ধেই দেখা যায় অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

---

[201] Trevor Royle, Collins Dictionary of Military Quotations, Collins; New Ed edition, 1991



চিত্র: ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমণের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু আধুনিক যুগই বা বলি কেন, ইতিহাসের পাতা উল্টালে কিংবা বিভিন্ন দেশের লোককাহিনি উপকথাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যৌনতার কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতও কম হয়নি। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসে, আর শিল্পীর ভাস্কর্যে। পশ্চিমা বিশ্বে হোমারের সেই প্রাচীন সাহিত্য *ইলিয়াড* শুরুই হয়েছিল একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, আর সেই যুদ্ধ আবার হয়েছিল একটি নারীকে অপহরণের কারণে—সেই হেলেন; হেলেন অব ট্রয়। আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রাচীন রামায়ণের কাহিনি আমরা জানি—রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল সীতাকে অপহরণের জন্য। এ ধরনের সাহিত্যের উপকরণ এবং উপকথা সব সংস্কৃতিতেই কমবেশি ছড়িয়ে আছে। এ থেকে একটি নিষ্ঠুর সত্য বেরিয়ে আসে—ব্যাপক আকারে জিন সঞ্চালনের জন্য যুদ্ধ পুরুষদের একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম ছিল প্রতিটি যুগেই।

আজ আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করছি, শান্তি-প্রিয় নিরুপদ্রব জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তারা সবাই কিন্তু সেই আদিম সমাজের সহিংস পূর্বপুরুষদের বংশধর, যারা অস্ত্র চালনায় ছিল দক্ষ আর সুচারু এবং যারা সাহসিকতা, বুদ্ধি,

ক্ষিপ্রতা আর সমরদক্ষতার মাধ্যমে স্বীয় গোত্রকে দিয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা, আর নিঃসন্দেহে অর্জন করতে পেরেছিল বহু নারীর প্রণয় এবং অনুরাগ। ঠিক সেজন্যই পুরুষদের এই 'পুরুষালি' গুণগুলো সার্বজনীনভাবেই নারীদের কাছে প্রত্যাশিত গুণ হিসেবে স্বীকৃত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ সেজন্যই বলেন, 'আমরা এমন কোনো সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়'। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহসিকতার মতো গুণগুলোকে আমাদের আদিম পুর্বপুরুষেরা যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের অজান্তেই নির্বাচিত করেছিল। এখনও সেই গুণগুলোর উৎকর্ষতার চর্চাকে ইনিয়ে বিনিয়ে মহিমান্বিত করার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত দেখি সমাজে। জেমস বন্ড, মিশন ইম্পসিবল কিংবা আজকের 'নাইট এন্ড ডে'র মতো চলচিত্রগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যার কেন্দ্রে থাকে প্রায় অমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন হিরোইক ইমেজের একজন পুরুষালি চরিত্র, যে অসামান্য বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা আর সাহসের মাধ্যমে একে একে হাজারো বিপদ পার হয়ে চলেছে, আর অসংখ্য নারীর মন জয় করে চলেছে।



চিত্র: জেমস বন্ড কিংবা নাইট এন্ড ডে-র মতো ছবিগুলোতে প্রদর্শিত পুরুষালি সহিংসতা, ক্ষিপ্রতা এবং দৈহিক উৎকর্ষতা কি আসলে আদিম বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানজাত চাহিদার স্বপ্নীল রূপায়ণ?

শুধু জেমস বন্ডের ছবি নয়, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সমাজের বিভিন্ন প্যাটার্নের ব্যাখ্যা হিসেবে সম্প্রতি খুব চমৎকার কিছু বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। বইয়ের পরিসরের কথা ভেবে সব কিছু নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়, আমি এই অধ্যায়ে মূলত আমার আলোচনা ভায়োলেন্স বা সহিংসতা বিষয়েই কেন্দ্রীভূত রাখার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন ১৯৮৮ সালে একটি বই লেখেন *হোমিসাইড* নামে[202]। তাদের বইয়ে তারা দেখান যে, হত্যা, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, অভিভাবক হত্যা, পুরুষ কর্তৃক পুরুষ হত্যা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা—সব কিছুর উৎস আসলে লুকিয়ে রয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কেন সিন্ডারেলার গল্প কম বেশি সব সংস্কৃতিতেই ছড়িয়ে আছে?

শিশুনির্যাতন বিষয়টাকে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা বড়জোর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে এ পর্যন্ত চিত্রিত করা হলেও, এর সার্বজনীন রূপটি আসলে ব্যাখ্যাহীন ছিল। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন থাকলেও অজানা ছিল না। সবাই কম বেশি জানত যে, প্রতিটি সংস্কৃতিতেই সিন্ডারেলা কিংবা স্নো হোয়াইটের মতো লোককথা কিংবা গল্পকাহিনি প্রচলিত, যেখানে সৎবাবা কিংবা সৎমা কর্তৃক শিশুর উপর নির্যাতন থাকে মূল উপজীব্য হিসেবে।

---

[202] Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988



চিত্র: পৃথিবীর প্রায় সব সংস্কৃতিতেই সিন্ডারেলা বা স্নো হোয়াইটের মতো লোককাহিনি বা রূপকথা প্রচলিত আছে, যেখানে বিবৃত থাকে সৎ মার অত্যাচারের বেদনাঘন কাহিনি ।

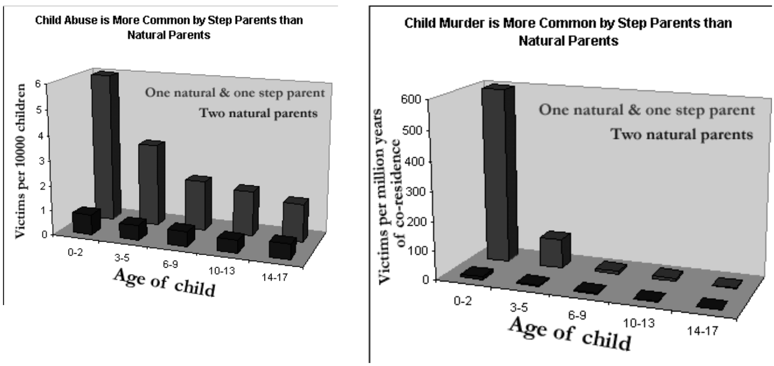
ছোটবেলায় রুশদেশীয় উপকথার খুব মজার মজার বই পড়তাম। আশি আর নব্বই দশকের সময়গুলোতে চিকন মলাটে বাংলায় রাশিয়ান গল্পের (অনুবাদ) অনেক বই পাওয়া যেত। আমি সবসময়ই তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতাম নতুন নতুন গল্পের বই পড়ার আশায়। প্রতি বছর জন্মদিনের সময়টাতে তৃষ্ণা যেন বেড়ে যেত হাজারগুণে। কারণ, জানতাম কেউ না কেউ রুশদেশীয় উপকথার বই নিয়ে আসবে উপহার হিসেবে। অবধারিতভাবে তাই হতো। এমনি একটি জন্মদিনে একটা বই পেয়েছিলাম 'বাবা ইয়াগা' (Baba Yaga) নামে। গল্পটা এরকম—এক লোকের স্ত্রী মারা গেলে লোকটি আবার বিয়ে করে। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছিল এক ফুটফুটে মেয়ে। কিন্তু সৎ মা এসেই মেয়েটির উপর নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করে। মারধোর তো ছিলই, কীভাবে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায় সেটারও পাঁয়তারা চলছিল। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে ছলচাতুরি করে সৎমা তার বোনের বাসায় পাঠানোর নানা ফন্দি-ফিকির করে যাচ্ছিল। সৎমার বোন আসলে ছিল এক নরখাদক ডাইনি। যাহোক, গল্পে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—কোনো রকমে মেয়েটি নিজেকে ঘোর দুর্দৈব থেকে বাঁচাতে পেরেছিল, আর মেয়েটির বাবাও বুঝে গিয়েছিল তার নতুন স্ত্রীর প্রকৃত রূপ। শেষমেষ গুলি করে তার স্ত্রীকে হত্যা করে মেয়েকে

ডাইনির খপ্পর থেকে রক্ষা করে তার বাবা।

আমি জার্মান ভাষাতেও এ ধরনের একটি গল্প পেয়েছি যার ইংরেজি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায় 'জুপিটার ট্রি' নামে। সেখানে ঘটনা আরও ভয়ানক। সৎমা তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৎ ছেলেকে জবাই করে হত্যা করার পর দেহটা হাঁড়িতে জ্বাল দিয়ে রেঁধে খেয়ে ফেলে। আর হাড়গোড়গুলো পুঁতে ফেলে বাসার পাশে এক জুপিটার গাছের নীচে। তারপর সৎমা নির্বিঘ্নে ঘুমাতে যায় সব ঝামেলা চুকিয়ে। কিন্তু জুপিটার গাছের নীচে পুঁতে রাখা ছেলেটার হাড়গোড় থেকে গভীর রাতে জন্ম হয় এক মিষ্টি গলার গায়ক পাখির। সেই পাখি তার কণ্ঠের জাদুতে সৎমাকে সম্মোহিত করে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে আর শেষ পর্যন্ত উপর থেকে পাথর ফেলে মেরে ফেলে। এখানেই শেষ নয়। পাখিটি তারপর অলৌকিকভাবে সেই আগেকার ছেলেতে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তার বাবার সাথে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে থাকে।

রুশ দেশের কিংবা জার্মান দেশের উপকথা স্রেফ উদাহরণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আসলে এধরনের গল্প কিংবা উপকথা সব সংস্কৃতিতেই কমবেশি পাওয়া যায়। এমনকি আমাদের সংস্কৃতিতেও রূপকথাগুলোতে অসংখ্য সুয়োরানি, দুয়োরানির গল্প আছে, এমনকি বড় হয়েও দেখেছি বহু নাটক সিনেমার সাজানো প্লট যেখানে সৎমা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে একটি ছোট্ট মেয়ের বা ছেলের। নিশ্চয় মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করেছে—কেন সবদেশের উপকথাতেই এ ধরনের গল্প ছড়িয়ে আছে? আসলেই কী এ ধরনের গল্পগুলো বাস্তব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, নাকি সেগুলো সবই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা? পশ্চিমে ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকানো যাক। আমেরিকার মতো জায়গায় বিবাহবিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি, স্টেপ বাবা কিংবা স্টেপ মা'র ব্যাপারটা একেবারেই গা সওয়া হয়ে গেছে, দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটাও এখানে খুব সাধারণ। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই সমস্ত অগ্রসর সমাজে সৎঅভিভাবক কর্তৃক শিশু নির্যাতনের মাত্রা কম হবে। সত্যিই তা কম, অন্তত আমাদের মতো দেশগুলোর তুলনায় তো বটেই। কিন্তু ড্যালি এবং উইলসন তাদের

গবেষণায় দেখালেন, এমনকি পশ্চিমেও সৎঅভিভাবক (step parents) কর্তৃক শিশু নির্যাতনের মাত্রার চেয়ে জৈবঅভিভাবক (biological parent)-দের দ্বারা শিশু নির্যাতনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, এমনকি অগ্রসর সমাজে সৎঅভিভাবকদের দ্বারা শিশু নির্যাতন কম হলেও জৈব অভিভাবকদের তুলনায় তা আসলে এখনও অনেক বেশিই। যেমন, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, আমেরিকার আধুনিক সমাজেও জৈব অভিভাবকদের দ্বারা শিশু নির্যাতনের চেয়ে সৎ অভিভাবক কর্তৃক শিশু নির্যাতন অন্তত ১০০ গুণ বেশি। কানাডায় জরিপ চালিয়েও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। সেখানে স্বাভাবিক অভিভাবকের তুলনায় সৎঅভিভাবকদের নির্যাতনের মাত্রা ৭০ গুণ বেশি পাওয়া গেল।



চিত্র: মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সৎঅভিভাবক কর্তৃক শিশু নির্যাতনের মাত্রার চেয়ে জৈবঅভিভাবকদের দ্বারা শিশু নির্যাতনের মাত্রা সবসময়ই তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়।

আসলে বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে তাই পাওয়ার কথা। জৈব অভিভাবকেরা তাদের জেনেটিক সন্তানকে খুব কমই নির্যাতন বা হত্যা করে, কারণ তারা সহজাত কারণেই নিজস্ব জিনপুল তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের চেয়ে রক্ষায় সচেষ্ট হয় বেশি, কিন্তু সৎঅভিভাবকদের ক্ষেত্রে যেহেতু সেই ব্যাপারটি ‘জেনেটিকভাবে’ সেভাবে নেই, অনেকাংশেই সামাজিকভাবে আরোপিত, সেখানে নির্যাতনের মাত্রা অধিকতর

বেশি পাওয়া যায়। ব্যাপারটা শুধু মানুষ নয়, অন্য প্রাণিজগতের ক্ষেত্রেও খুব প্রবলভাবে দৃশ্যমান। আফ্রিকার বনভূমিতে সিংহদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে একটি পুরুষ সিংহ যখন অন্য সিংহকে লড়াইয়ে পরাজিত করে গোত্রের সিংহীর দখল নেয়, তখন প্রথমেই যে কাজটি করে তা হলো সে সিংহীর আগের বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলে। আফ্রিকার সেরেঙ্গিটি প্লেইনে গবেষকদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ সিংহসাবক তার বৈপিত্রের খপ্পরে পড়ে মারা যায়[203]। একই ধরনের ব্যবহার দৃশ্যমান গরিলা, বাঘ, চিতাবাঘ, বেবুন প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যেও। এখন মানুষও যেহেতু অন্য প্রাণীদের মতো বিবর্তনের বন্ধুর পথেই উদ্ভূত হয়েছে, তাই তার মধ্যেও সেই ‘পশুবৃত্তি’র কিছুটা ছিটেফোঁটা থাকার কথা। অনেক গবেষকই মনে করেন, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তা পাওয়া যাচ্ছে। মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসনের উপরের পরিসংখ্যানগুলো তারই প্রমাণ। ডেভিড বাস তার 'দ্য মার্ডারার নেক্সট ডোর' বইয়ে সেজন্যই বলেন[204] -

> Put bluntly, a stepparent has little reproductive incentive to care for a stepchild. In fact, a stepparent has strong incentives to want the stepchild out of the way. A stepfather who kills a stepchild prevents that child's mother from investing valuable resources in a rival's offspring. He simultaneously frees up the mother's resources for investigating in his own offspring with her.

এই ব্যাখ্যা থেকে অনেকের মনে হতে পারে যে বৈপিত্রের হাতে শিশু হত্যাটাই বুঝি 'প্রাকৃতিক' কিংবা অনেকের এও মনে হতে পারে যে, সৎ অবিভাবকদের কুকর্মের বৈধতা অবচেতন মনেই আরোপের চেষ্টা হচ্ছে বুঝি। আসলে তা নয়। সিংহর ক্ষেত্রে যেটা বাস্তবতা, মানবসমাজের ক্ষেত্রেও সেটা হবে তা ঢালাওভাবে বলে দেওয়াটা কিন্তু বোকামি। আর মানবসমাজ এমনিতেই অনেক জটিল। জৈব তাড়নার বিপরীতে কাজ

---

[203] Martin Daly and Margo Wilson, The Truth about Cinderella: A Darwinian View of Parental Love, Yale University Press.

[204] David M. Buss, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill, Penguin Books, 2005, p 177.

করতে পারার বহু দৃষ্টান্তই মানবসমাজে বিদ্যমান; যেমন পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান না নেওয়া, অনেকের সমকামী প্রবণতা প্রদর্শন, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, কিংবা আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত, সন্তানদের পাশাপাশি মা বাবার প্রতি ভালোবাসা, পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা, সন্তান থাকার পরেও আরও সন্তান দত্তক দেয়া, আবার পরের ছেলে কেষ্টর মায়ায় কাদম্বিনীর গৃহত্যাগ (শরৎচন্দ্রের মেজদিদি গল্প দ্র.) সহ বহু দৃষ্টান্তই সমাজে আমরা দেখি যেগুলোকে কেবল জীববিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে বিচার করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিশ্ব আর সিন্ডারেলা আর সুয়োরানির যুগে পড়ে নেই; নারীরা আজ বাইরে কাজ করছে, ভিক্টোরীয় সমাজের তুলনায় তাদের ক্ষমতায়ন এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সম্পর্কগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে বিবাহবিচ্ছেদ যেমন বেড়েছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠছে 'স্টেপ ড্যাড' আর 'স্টেপ মম'-এর মতো ধারণাগুলো। এমনকি সমকামী দম্পতিদের দত্তক নেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বহু পরিবারেই দেখা যায় জৈব অভিভাবক না হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের সাথে অভিভাবকদের সুসপম্পর্ক গড়ে উঠাতে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর বৈপিত্রের দ্বারা সন্তান হত্যার পেছনে আদি জৈবিক প্রভাব যদি কিছু মানবসমাজে থেকেও থাকে, সেটার বিপরীত প্রভাবগুলোও 'প্রাকৃতিক'ভাবে অঙ্কুরিত হতে হবে জিনপুলের টিকে থাকার প্রয়োজনেই। সেজন্যই দেখা যায় বিবাহবিচ্ছিন্ন একাকী মা (single mother) যখন আরেকটি নতুন সম্পর্কে জড়ান, তখন তার প্রাধান্যই থাকে তার সন্তানের প্রতি তার প্রেমিকের মনোভাবটি কী রকম সেটি বুঝার চেষ্টা করা। কোনো ধরনের বিরূপতা লক্ষ করলে কিংবা অস্বস্তি অনুভব করলে সম্পর্কের চেয়ে সন্তানের মঙ্গলটাই মুখ্য হয়ে উঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার নতুন পুরুষটি প্রাথমিকভাবে ততটা বাঞ্ছিত না হলেও যদি কোনো কারণে সন্তানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে, তবে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে মার কাছে অগ্রগামিতা পেতে বাড়তি দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেন তিনি। আবার সম্পর্ক তৈরির পরে কখনো সখনো ঝগড়াঝাটি হলে স্থায়ীভাবে অযাচিত টেনশনের দিকে যেন ব্যাপারটা চলে না যায়, সেটিও থাকে সম্পর্কের

অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এগুলো সবকিছুই তৈরি হয় টিকে থাকার জন্য বিবর্তনীয় টানাপোড়নের নিরিখে।

কেন দাগি অপরাধীদের প্রায় সকলেই পুরুষ ?

মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন তাদের বইয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়ে মানবসমাজ আসলে একগামী ছিল না, বরং সেসময় পুরুষেরা ছিল বহুগামী। মানবসমাজ ছিল পলিজাইনাস (polygynous) যেখানে শক্তিশালী কিংবা ক্ষমতাশালী পুরুষেরা একাধিক নারীকে বিয়ে করতে পারত, কিংবা তাদের দখল নিতে পারত[205]। পলিজাইনাস সমাজে কিছু সৌভাগ্যবান পুরুষ তাদের অতুলনীয় শক্তি আর ক্ষমতার ব্যবহারে অধিকাংশ নারীর দখল নিয়ে নিত, আর অধিকাংশ শক্তিহীন কিংবা ক্ষমতাহীন পুরুষদের কপালে থাকত অশ্বডিম্ব! যত খারাপই লাগুক, এটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা। নারীর দখল নেওয়ার জন্য পুরুষে পুরুষে একসময় প্রতিযোগিতা করতে হতো; আর এই প্রতিযোগিতা বহুক্ষেত্রেই 'শান্তিময়' ছিল না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা রূপ নিত রক্তাক্ত সংঘাতে, আর তার পরিণতি হতো হত্যা আর অপঘাতে। পুরুষেরা সম্পদ আহরণ করত কিংবা লড়াই আর যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করত মূলত নারীদের আকর্ষণের জন্য। যারা সম্পদ আহরণে আর শক্তি প্রদর্শনে ছিল অগ্রগামী তারা দখল নিতে পারত একাধিক নারীর। সম্পদ আর নারী নিয়ে এই প্রতিযোগিতার কারণেই সমাজের পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার চর্চার (সংঘাত, খুন, ধর্ষণ, অস্ত্রবাজি, গণহত্যা প্রভৃতি) প্রকাশ ঘটেছিল। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, পুরুষালি সহিংসতার বড় একটা উৎস আসলে নিহিত সেই চিরন্তন 'ব্যাটেল অব সেক্স'-এর মধ্যেই। এমনকি আধুনিক কালে ঘটা বিভিন্ন অপরাধ এবং ভায়োলেন্সগুলোকেও বহু সময়েই এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

---

[205] Margo Wilson and Martin Daly, পূর্বোক্ত, pp 137-161

জীববিজ্ঞানের চোখে পুরুষালি সহিংসতা

মানবসমাজে পুরুষরা কেন নারীদের চেয়ে অধিকতর সহিংস তার খুব সহজ ব্যাখ্যা আছে জীবজ্ঞানে। আগের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে খুব হাল্কাভাবে আভাস দেয়া হয়েছিল। প্রাকৃতিকভাবেই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর প্রকৃতি আলাদা। পুরুষের স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় হাজার হাজার, আর সেতুলনায় ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় কম। ডিম্বাণুর আকার শুক্রাণুর চেয়ে বড় হয় অনেক। অর্থাৎ, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে স্পার্ম সহজলভ্য, তাই কম দামি, আর সে তুলনায় ডিম্বাণু অনেক মূল্যবান। 'স্পার্ম অনেক সহজলভ্য' বলেই (সাধারণভাবে) পুরুষদের একটা সহজাত প্রবণতা থাকে বহু সংখ্যক জায়গায় তার প্রতিলিপি ছড়ানোর। একজন পুরুষ তার সারা জীবনে অসংখ্য নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে পারে, অপরদিকে একজন নারী বছরে জন্ম দিতে পারে কেবল একটি সন্তানেরই। মূলত নারী পুরুষের যৌনতার পার্থকের কারণেই পুরুষরা মূলত নারীর চেয়ে সহিংস হয়ে বেড়ে ওঠে। কেবল মানুষ নয় মূলত সকল স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেই এই ধারা খুব প্রবলভাবেই বিদ্যমান। জীববিজ্ঞানীরা জৈবিকভাবে নারী পুরুষদের মধ্যকার যৌনতার পার্থক্যকে অনেক সময় 'ফিটনেস ভ্যারিয়েন্স' (Fitness varience) এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যৌনতার পার্থক্যের কারণেই পুরুষদের ফিটনেস ভ্যারিয়েন্স নারীর চেয়ে বেশি[206]। আর তা ছাড়া, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়ে মানবসমাজ আসলে একগামী ছিল না, বরং সেসময় পুরুষেরা ছিল বহুগামী। এখনও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানবসমাজ মনোগেমাস নয়, বরং *মাইল্ডলি পলিজাইনাস*[207]। মনোগেমাস প্রজাতিতে নারী পুরুষের আকার আয়তন সমান হয়, অনেক সময় পার্থক্য করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। যেমন পেঙ্গুইনের ক্ষেত্রে। নারী পেঙ্গুইন আর পুরুষ পেঙ্গুইনের আকার একেবারে সমান সমান। কিন্তু যে সমস্ত প্রজাতিতে পুরুষে পুরুষে প্রতিযোগিতা হয় নারীর দখল নেওয়ার জন্য সেখানে পুরুষের দৈহিক আকার নারীর চেয়ে বড় হয় । যেমন গরিলার ক্ষেত্রে একটি পুরুষ গরিলার গড়পড়তা ওজন হয় ৪০০ পাউন্ড, অপর দিকে নারী গরিলার মাত্র ২০০ পাউন্ড। অর্থাৎ, পুরুষ গরিলা ওজনে নারী গরিলার চেয়ে

---

[206] Fitness variance is the difference between the "winners" and "loosers" in the reproductive game – how much more reproductively successful the "winners" are compared to the "losers". Because anisogamy and internal gestation, men have much greater fitness variance than women.

[207] Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, Newyork, Aldine Transaction, 1986.

শতকরা একশ ভাগ বেশি থাকে। এখন মানবসমাজের দিকে তাকালে আমরা কি দেখি? গড়পড়তা একটি পুরুষের ওজন মোটামুটি ১৯০ পাউন্ড, আর নারীর ওজন ১৬০ পাউন্ড, অর্থাৎ গড়পড়তা পুরুষের ওজন নারীর চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশি। পুরুষদের দৈহিক আকার মেয়েদের চেয়ে বেশি হওয়া, শক্তিমত্তা এবং আপার বডি ম্যাস—সব কিছুই প্রমাণ করে বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমায় সম্ভবত খুব ভায়োলেন্ট পুরুষ-পুরুষ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। এ ধরনের সমাজে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব হয়, হয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার কারণেই বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার চর্চার (আধুনিক মানবসমাজে সংঘাত, খুন, ধর্ষণ, অস্ত্রবাজি, গণহত্যা প্রভৃতি হচ্ছে কিছু উদাহরণ) প্রকাশ ঘটে। জীববিজ্ঞান থেকে কিছু উলটো (ব্যতিক্রমী) উদাহরণ হাজির করেও যৌনতার সাথে আগ্রাসনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যায়। কিছু মাছ আর পাখি আছে যেখানে পুরুষেরা নারীদের মতোই নয় মাস ধরে যে গর্ভধারণের সমতুল্য কিছু নমুনা প্রদর্শন করে থাকে। যেমন, মাছের ক্ষেত্রে কিছু পুরুষ মাছ নিজেদের মুখে ডিম নিয়ে বসে থাকে যতক্ষণ না তা থেকে বাচ্চা বের হয়। কিছু পুরুষ পাখি আছে যারা একই রকমভাবে 'ফার্টিলাইজড এগ' বহন করে। সে ধরনের প্রজাতিগুলোতে নারীদের 'ফিটনেস সিলিং' অনেক বেশি থাকে পুরুষদের তুলনায়। কারণ এখানে নারীরা বোহেমিয়ানভাবে ইচ্ছেমত 'ঘুরে ফিরে' বেড়াতে পারে, আর পুরুষেরা 'গর্ভবতী' থাকে (আক্ষরিক অর্থে নয়) অনেকটা সময় জুড়ে আর বাচ্চার তদারকের একটা বড় দায়িত্ব পালন করে। এই ধরনের প্রজাতিতে নারীরা অধিকতর সহিংস, আগ্রাসী এবং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে থাকে[208]। এই 'ব্যতিক্রমী উদাহরণ'গুলো থেকেও স্পষ্ট হয় যে, মূলত যৌনতার পার্থক্য তথা ফিটনেস ভ্যারিয়েন্সের কারণেই প্রাণিজগতে লিঙ্গভিত্তিক আগ্রাসনের পার্থক্য সূচিত হয়।

আধুনিক বিশ্বেও পুরুষেরা সম্পদ আহরণের জন্য, ক্যারিয়ারের জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য মেয়েদের তুলনায় অধিকতর বেশি শক্তি এবং সময় ব্যয় করে। কারণ এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করে অধিকসংখ্যক নারীর দৃষ্টি, এবং সময় সময় তাদের অর্জন এবং প্রাপ্তি। অর্থাৎ, একটা সময় পুরুষেরা নারীর দখল নিতে নিজেদের মধ্যে শারীরিক

[208] Tim Clutton-Brock, Sexual Selection in Males and Females, Science 21 December 2007

প্রতিযোগিতা আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজেদের নিয়োজিত রাখত, এখন সেটা পরিণত হয়েছে অর্থ, বৈভব, ক্যারিয়ার তৈরির লড়াইয়ে। বিত্তশালী ছেলেরা বিএমডাব্লু কিংবা রোলসরয়েসে চড়ে বেড়ায় নিজেদের বৈভবের মাত্রা প্রকাশ করতে, কিংবা হাতে ফ্যাশানেবল মোভাডো ঘড়ি কিংবা ব্র্যান্ডনেমের কেতাদুরস্ত কাপড় পরিধান করে, যার মাধ্যমে 'শো অফ' করে নিজেকে অন্য পুরুষদের চেয়ে 'যোগ্য' হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়। শুধু কেতাদুরস্ত কাপড়, গাড়ি কিংবা ঘড়ি নয়—কথাবার্তা, চালচলন, স্মার্টনেস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি সবকিছুকেই পুরুষেরা ব্যবহার করে নারীকে আকর্ষণের কাজে। সেজন্যই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অর্থ-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতায় বলীয়ান পুরুষেরাই বেশি পরকীয়ায় বেশি আসক্ত হন (এ নিয়ে সামনে আরও আলোচনা আসবে)। যৌনতার এই ধরনের পার্থক্যের কারণেই পুরুষেরা সামগ্রিকভাবে অধিকতর বেশি ঝুঁকি নেয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম, পেশা কিংবা খেলাধুলায় (কার রেসিং, বাঙ্গি জাম্পিং কিংবা কিকবক্সিং) জড়িত হয় বেশি, একই ধারায় অপরাধজগতেও তারা প্রবেশ করে অধিক হারে। এর সত্যতা মিলে সহিংসতা নিয়ে গবেষকদের বাস্তব কিছু পরিসংখ্যানেও। সাড়া বিশ্বে যত খুন-খারাবি হয় তার শতকরা ৮৭ ভাগই হয় পুরুষের দ্বারা[209]। আমেরিকার মধ্যে চালানো জরিপে পাওয়া গেছে যে শতকরা ৬৫ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ দ্বারা পুরুষ হত্যার ঘটনা ঘটে। শতকরা ২২ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের হাতে নারী হত্যার ঘটনা ঘটে। খুন-খারাবির ১০ ভাগ ক্ষেত্রে নারী হত্যা করে পুরুষকে, আর মাত্র ৩ ভাগ ক্ষেত্রে নারী হত্যা করে নারীকে[210]। সারা বিশ্বে পুরুষদের হাতে পুরুষদের হত্যার হার আরও বহুগুণে বেশি পাওয়া গেছে ভিন্ন কিছু পরিসংখ্যানে। যেমন, ব্রাজিলে শতকরা ৯৭ ভাগ ক্ষেত্রে, স্কটল্যান্ডে ৯৩ ভাগ ক্ষেত্রে, কেনিয়ায় ৯৪ ভাগ ক্ষেত্রে, উগান্ডায় ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রে এবং নাইজেরিয়ায় ৯৭ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক পুরুষের হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে[211]। এর মাধ্যমে পুরুষ-পুরুষ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং জিঘাংসার বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক বলে প্রমাণিত

---

[209] David M. Buss, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill, Penguin Books, 2005

[210] David M. Buss, The Murderer Next Door, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

[211] Margo Wilson and Martin Daly, পূর্বোক্ত।

হয়।

গড়পড়তা নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম ঝুঁকি নেয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী এনি ক্যাম্পবেল (Anne Campbell) মনে করেন, অনর্থক ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারগুলো মেয়েদের জন্য কোনো রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস প্রদান করে না[212]। আদিম কাল থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করার চেয়ে মেয়েরা বরং সন্তানদের দেখভাল করায় অর্থাৎ জিনপুল রক্ষায় নিয়োজিত থেকেছে বেশি। অনেক গবেষকই মনে করেন, মেয়েরা যে কারণে পুরুষদের মতো ঘন ঘন সঙ্গী বদল করে না, ঠিক সেকারণেই তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও জড়িত হয় কম, কারণ, বিবর্তনগত দিক থেকে সেগুলো কোনো প্রজননগত উপযোগিতা (reproductive benefit) প্রদান করে না। এ কারণেই মেয়েদের মানসজগৎ কম প্রতিযোগিতামূলক এবং সর্বোপরি কম সহিংস হিসেবে গড়ে উঠেছে। যে কোনো সংস্কৃতি খুঁজলেই দেখা যাবে, নৃশংস খুনি বা সিরিয়াল কিলার পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে একেবারেই কম, ঠিক যে কারণে পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি মেয়েদের মধ্যে কম থাকে পুরুষের তুলনায়।

কেন ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বেশি পরকীয়ায় আসক্ত হয়?

বিল ক্লিন্টন ২৪ বছর বয়স্ক মনিকা লিউনেস্কির সাথে নিজের অফিসে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর। ১৯৯৮ সালের ২১ শে জানুয়ারি তা মিডিয়ার প্রথম খবর হিসেবে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে যায়।

212 Anne Campbell, Staying Alive: Evolution, Culture, and Women's Intrasexual Aggression, Behaviour and Brain Sciences, v.22 , pp203-52



চিত্র: মনিকা লিউনস্কি এবং বিল ক্লিন্টন

অনেকেই অবাক হলেও অবাক হননি ডারউইনীয় ইতিহাসবিদ লরা বেটজিগ (Laura Betzig)। তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিবিদদের কিংবা প্রভাবশালী চালচিত্র নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছিলেন[213, 214]। খবরটা শোনার পর তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই ছিল, "কী, বলেছিলাম না?"[215]। তার এহেন প্রতিক্রিয়ার কারণ আছে। তিনি বহুদিন ধরেই বলার চেষ্টা করছিলেন যে, ইতিহাসে প্রভাবশালী এবং প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরা তাদের 'বৈধ' স্ত্রীর পাশাপাশি সব সময়ই চেষ্টা করেছে অধিক সংখ্যক নারীর দখল নিতে এবং তাদের গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে। ইতিহাসে রাজা বাদশাহদের রঙ-বেরঙের জীবনকাহিনি পড়লেই দেখা যাবে, কেউ রক্ষিতা রেখেছেন, কেউ দাসীর সাথে সম্পর্ক করেছিলেন, কেউ বা হারেম ভর্তি করে

[213] Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A cross cultural correlation of conflict asymmetry, hierarchy, and degree of polygyny. Ethology and Sociobiology, 3: 209-221, 1982.

[214] Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, Newyork, Aldine Transaction, 1986.

[215] Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008

রেখেছিলেন অগণিত সুন্দরী নারীতে। সলোমনের নাকি ছিল তিনশো পত্নী, আর সাত হাজার উপপত্নী। মহামতি আকবরের হারেমে নাকি ছিল ৫০০০-এর ওপর নারী। ফিরোজ শাহ নাকি তার হারেমে প্রতিদিন তিনশ নারীকে উপভোগ করতেন। মরোক্কান সুলতান মৌলে ইসমাইলের হারেমে দুই হাজারের উপরে নারী ছিল, এবং ইসমাইল সাহেব বৈধ অবৈধ সব মিলিয়ে এক হাজারের উপর সন্তান-সন্ততি তিনি পৃথিবীতে রেখে গেছেন[216]। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার, দ্বিগবিজয়ী আলেকজান্ডার কিংবা চেঙ্গিসখান (এবং তার বংশধরদের) নারী-লালসার কথাও সর্বজনবিদিত। তাদের সন্তান-সন্তদিদের সংখ্যাও অসংখ্য[217]। এর মাধ্যমে একটি নির্জলা সত্য বেরিয়ে আসে, ইতিহাসের ক্ষমতাশালী পুরুষেরা তাদের প্রজননগত সফলতার (reproductive success) মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল বহুনারীর দখলদারিত্বকে। আজকে আমরা যতই 'মনোগামিতা'র বিজয়কেতন উড়াই না কেন, পুরুষের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে বহুগামিতার প্রকাশ ঘটে বহু ক্ষেত্রেই খুব অনিবার্যভাবে। কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায়, মানসিকভাবে বহুগামী পুরুষেরা নারীদের আকর্ষণ এবং ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে পারে যদি তাদের হাতে পর্যাপ্ত যশ, প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা থাকে।

---

[216] Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, পূর্বোক্ত।

[217] চেঙ্গিস খান যুদ্ধ জয়ের সময় ক্ষমতার দাপটে পুরো অঞ্চলের এত নারীদের ভোগ করেছে যে এখন এশিয়া মাইনরের আটভাগের একভাগ জনপুঞ্জে নাকি এখনো চেঙ্গিসের জিনের রুট ট্র্যাক করা যায় (রেফারেন্স—Hillary Mayell, Genghis Khan a Prolific Lover, DNA Data Implies, National Geographic News, February 14, 2003) । চেঙ্গিস খানের মতো তার বংশধরেরাও ছিল নারীলিপ্সায় অনন্য। চেঙ্গিস খানের বংশধররা জাপান সাগর থেকে শুরু করে রাশিয়ার হার্টল্যান্ড এমনকি বেশ একটা লম্বা সময় বাগদাদ পর্যন্ত সব জায়গাতেই শাসন করেছে। তার নাতি কুবলাই খানের হাতে তার সাম্রাজ্য আরও বড় হয়েছিল। চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে তুসির নাকি ৪০ টা ছেলে ছিল, আর তার নাতি কুবলাই খান নাকি তার হারেমে প্রতি বছর ৩০টা করে কুমারী যোগ করত। আমাদের উপমহাদেশে মোঘল সম্রাটরাও সব চেঙ্গিস খানের বংশধর। তাদের প্রত্যেকের হারেমেই শ শ কখনও বা হাজার হাজার নারী থাকত। তাই শুধু চেঙ্গিস খান নয়, তার সুযোগ্য বংশধরদেরদেরও 'কৃতিত্ব' আছে এশিয়া মাইনরের ৮% জনসংখ্যার মধ্যে চেঙ্গিসের জিন পাওয়ার ক্ষেত্রে।



চিত্র: শোয়ার্সনেগার এবং তার স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক এখন কেবলই স্মৃতি।

আমি যখন এ বইয়ের জন্য এই অংশটি তৈরি করছি, তখন এ মুহূর্তে দুটি ঘটনা নিয়ে আমেরিকান মিডিয়া তোলপাড়। একটি হচ্ছে প্রভাবশালী ফরাসি অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ এবং রাজনীতিবিদ, আইএমএফ-এর প্রধান ডমেনিক স্ট্রাউস কান আমেরিকায় এসে হোটেলে থাকাকালীন অবস্থায় হোটেলের এক পরিচারিকাকে (ক্লিনার) যৌননির্যাতন করে গ্রেফতার হয়েছেন। ডমেনিক স্ট্রাউস কান বিবাহিত এবং চার সন্তানের পিতা। তাকে আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। এই ডমেনিক স্ট্রাউস কান যখন হোটেলে এই বিদঘুটে ঘটনা ঘটিয়ে বমাল আমেরিকা ত্যাগ করছিলেন, তখন তাকে প্লেন থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ডমেনিক স্ট্রাউসের এই নিন্দনীয় ঘটনায় যখন মিডিয়া ব্যতিব্যস্ত, ঠিক একই সময় দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা চলে এল মিডিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতপূর্ব গভর্নর এবং খ্যাতিমান অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার এবং তার স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে গেছে। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল দুজনের রাজনৈতিক মনোমালিন্যতার কারণেই কিংবা বনিবনা হচ্ছে না বলেই বুঝি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সম্পর্কের ইতি টানতে চাইছেন তারা। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মিডিয়ায় চলে আসল আসল খবর। আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার বিবাহিত

সম্পর্কের বাইরে তার বাসার গৃহপরিচারিকার সাথে যৌনসম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয় তাদের এই সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে একটি সন্তানও জন্মেছিল ১৪ বছর আগে। আর সেই সন্তানটি জন্মেছিল তার এবং তার স্ত্রী মারিয়ার ছোট সন্তানের জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে।

এ দুটি ঘটনা নতুন করে পুরনো ধাঁধাটিকে সামনে নিয়ে এল। কেন ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বেশি পরনারীতে আসক্ত হয়, কেন অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি বাড়ার সাথে সাথে তাদের অনেকেরই বেলাল্লাপনা পাল্লা দিয়ে বাড়ে? তারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন, সমাজ এবং সম্মান নিয়ে তাদের চলাফেরা করতে হয় অহর্নিশি, তাদেরই বরং মান সম্মানের ব্যাপারে অনেক সচেতন থাকার কথা। তা না হয়ে উলটোটাই কেন ঘটতে দেখা যায়? কেন বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা সামান্য একটি 'এফেয়ার' করতে গিয়ে এমন সব ঝুঁকি নেন, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ডেকে আনে? ব্যাপারটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্বনামখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন এই সপ্তাহে একটি কভারস্টোরি করেছে তাদের পত্রিকায়— 'Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs' নামের উত্তেজক একটি শিরোনামে—



চিত্র: টাইম ম্যাগাজিনের এ সপ্তাহের (৩০ মে, ২০০১) ইস্যুর প্রচ্ছদ

টাইম ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ন্যান্সি গিবসের এ প্রবন্ধে খুব স্পস্ট করেই বলা হয়েছে[218] —

> মনোবিজ্ঞানের একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে যারা মূলত শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকেন, তাদের মধ্যেই পরকীয়ার সম্ভাবনা বেশি। ক্ষমতা কেবল একা আসে না, ক্ষমতার সাথে সাথে দুটি জিনিস অনিবার্য ভাবে চলে আসে—সুযোগ এবং আত্মবিশ্বাস। বলাবাহুল্য, সুযোগ আর আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা বহুসময়ই সমাজে পরিস্ফুট হয় যৌনতার মাধ্যমে। যদি প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা যৌনতার সুযোগকে অপরিবর্তনীয়ভাবে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে, বহু পুরুষই তার সদ্ব্যবহার করে। বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরা বলেন, হঠাৎ আসা ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি অনেক সময়ই মানুষের আত্মসংযমের দেওয়ালকে অকেজো করে সামাজিকীকরণের স্তরকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলতে পারে।’

এটি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ যে, সমাজের যে অভিব্যক্তিগুলো ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানীরা দেখবার চেষ্টা করছিলেন বিগত কয়েক বছর ধরে, তার প্রতিফলন আমরা ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি পপুলার মিডিয়াতেও। কিছুদিন আগ পর্যন্ত ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে বাইরে রেখেই কাজ করতেন সমাজবিজ্ঞানীরা এবং নৃতত্ত্ববিদেরা। এখন সময় পাল্টেছে। লরা বেটজিগ, নেপোলিয়ন চ্যাংনন, ডেভিড বাস, মার্টিন ড্যালি, মার্গো উইলসন সহ বহু বিজ্ঞানীদের ক্রমিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে যে ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে আর বাইরে রাখা যাচ্ছে না, সেটা সমাজ বিজ্ঞানই হোক, নৃতত্ত্বই হোক, কিংবা হোক নিরস ইতিহাস বিশ্লেষণ। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণেও ডারউইন চলে আসছে অবলীলায়। টাইম ম্যাগাজিনে ন্যান্সি গিবসের প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরদের কাজের উল্লেখ তারই একটি শক্তিশালী প্রমাণ। টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ন্যান্সি গিবসের সেই সম্পাদকীয়তে একটি চার্টও সংযোজিত হয়েছে, ‘দ্য মিসকন্ডাক্ট ম্যাট্রিক্স’ নামে। সেই চার্টটি দেখলেই পাঠকেরা বুঝবেন, কেবল বিল ক্লিন্টনকে দিয়েই

[218] Nancy Gibbs, Men Behaving Badly: What is it about Power that Makes Men crazy? (Cover Story: Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs) Times, May 30, 2011 Issue.

আমেরিকায় নারী লোলুপতা কিংবা পরকীয়ার অধ্যায় শুরু হয়নি, শুরু হয়েছিল বহু আগেই।

আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের দাসীর সাথে সম্পর্ক করে 'অবৈধ' সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। আমেরিকার বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ডেমক্রেটিক দলের অন্যতম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন এডোয়ার্ডস এবং তার ক্যাম্পেইনের ভিডিও-ক্যামেরাম্যান হান্টারের সাথে অবৈধ সম্পর্কের খবর ফাঁস হয়ে গেলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এর আগে একই ধরনের কাজ,



চিত্র: টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মিসকন্ডাক্ট ম্যাট্রিক্স - আমেরিকায় ক্ষমতাধর মানুষদের নারীলোলুপতার চালচিত্র

অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে ফেলে পরনারীর পেছনের ছুটেছিলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন ম্যাকেইন কিংবা নিউইয়র্কের গভর্নর রুডি জুলিয়ানি। তারা অবশ্য নিজের প্রেমিকাকে পরে বিয়ে করে নিজের অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ করতে পেরেছেন জনগণের সামনে। আগামী ২০১২-এর নির্বাচনেও রিপাবলিকান পদপ্রার্থী হিসেবে আছেন ভুতপূর্ব হাউজ-স্পিকার নিউট গিংরিচ, যিনি ইতোমধ্যেই তিনটি বিয়ে করেছেন, প্রতিবারই স্ত্রী থাকা অবস্থায় অপর নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, এবং শেষমেষ পুরনো স্ত্রীকে ছেড়ে নতুন প্রেমিকাকে ঘরে তুলেছেন। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা ছিল না, যদি না ফাঁস হয়ে যেত যে, তিনি যে সময়টাতে ক্লিটননের অবৈধ কুকর্মের বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার ছিলেন, এবং ক্লিন্টনের ইম্পিচমেন্টে মূল উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই গিংরিচ নিজেই তখন অ্যাফেয়ার করে বেড়াচ্ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের ছোট এক হাউজ অব রিপ্রেসেন্টেটিভ স্টাফের সাথে। অবশ্য এগুলো কোনোটাই আমেরিকার রাজনীতিতে তাদের ফেরৎ আসতে তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ তারা সকলেই তাদের নিজেদের দাবিমত ‘পূর্বের ভুল হতে শিক্ষা নিয়েছেন’। যা হোক, টাইমের ‘দ্য মিসকন্ডাক্ট ম্যাট্রিক্স’-এ আছে থমাস জেফারসন থেকে শুরু করে জন এফ জেনেডি, বিল ক্লিন্টন, এলিয়ট স্পিটজার, আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার, জন এডওয়ার্ডস, নিউট গিংরিচ, উডি এলেন, মাইক টাইসন, রোমান পোলান্সকি, টেড হ্যাগার্ড, টাইগার উডস-সহ বহু রথী-মহারথীদের নাম যারা ক্ষমতা, যশ আর প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখরে বসে পরকীয়ায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলেন।

আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা বিত্তশালীরা কীভাবে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তিকে নারীলোলুপতার উপঢৌকন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা পুরুষেরা নয়, অর্থ বিত্ত বৈভবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে সাধারণ পুরুষেরাও কীভাবে আকর্ষণীয় নারীর দখলে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে তা চোখ-কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করলে এর সত্যতা মিলে।

বিত্তশালীরা যে কাজটি বাংলাদেশে করেছেন সে ধরনের কাজ পশ্চিমা বিশ্বে

পুরুষেরা বহু দিন ধরেই করে আসছেন। পাশ্চাত্যবিশ্বকে 'মনোগোমাস' বা একগামী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, খেয়াল করলে দেখা যাবে সেখানকার পুরুষেরা উদার বিবাহবিচ্ছেদ আইনের (Liberal divorce laws) মাধ্যমে[219] একটার পর একটা স্ত্রী বদল করেন। ব্যাপারটাকে অনেকেই 'সিরিয়াল পলিগামি'[220] (তারা আইনকানুনের বাধ্যবাধকতার কারণে একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারেন না, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে একের পর এক সঙ্গী পরিবর্তন করেন) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সিএনএন এর প্রাইম টাইম নিউজ হোস্ট ল্যারি কিং ইতোমধ্যেই আটটি বিয়ে (সিরিয়ালি) করেছেন। আমাদের বিবর্তনের পথিকৃৎ সুদর্শন রিচার্ড ডকিন্সও তিনখানা বিয়ে সেরে ফেলেছেন সিরিয়ালি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যেও এ ধরনের উদাহরণ দেয়া যাবে। যেমন— হলিউডের একসময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অধুনা পরলোকগত এলিজাবেথ টেলর (যিনি আটবার সঙ্গীবদল করেছেন), কিন্তু তারপরেও পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় যে, পশ্চিমা বিশ্বে প্রভাবশালী পুরুষেরাই সাধারণত খুব কম সময়ের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ, 'সিরিয়াল পলিগামি'র চর্চা পুরুষদের মধ্যেই বেশি, এবং ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি অর্জনের সাথে সাথে সেটা পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

পুরুষের স্ট্যাটাস এবং বহুগামিতার সম্পর্ক

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ধনী-গরিব সকলেই তো পরকীয়া করে। বস্তিবাসী দিনমজুর রিক্সাওয়ালা রহিমুদ্দিন যেমনি করে, তেমনি করে বিল

---

219 অনেকে আপত্তি করতে পারেন এই বলে যে, পশ্চিমের বিবাহবিচ্ছেদ আইনকে সত্যিই আমাদের দেশের চেয়ে উদার বলা যায় কি না তা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্তত যারা সেখানে বিবাহবিচ্ছেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তাদের অনেকেই বলবেন, আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে পুরুষদের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। অ্যালিমোনি, চাইল্ডকেয়ার সংক্রান্ত আইনগুলি অনেকক্ষেত্রেই পুরুষদের বিপক্ষেই যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাও যদি হয়, পশ্চিমা বিশ্বে প্রভাবশালী পুরুষেরা কঠিন বিবাহবিচ্ছেদ আইন থাকা সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী সিরিয়ালি গ্রহণ করার দিকে লালায়িত হওয়ার মধ্যেও এই সত্য প্রস্ফুটিত হয় যে, বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী পুরুষেরা 'সিরিয়াল পলিগামি'র চর্চা অধিকহারে করে থাকেন।

220 Quoted from Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: "Contemporary westerners who live in nominally monogamous societies that nonetheless permit divorce are therefore in effect polygynous; they practice serial polygamy."

ক্লিন্টনও। তাই ক্ষমতাশালী হলেই বেশি পরকীয়া করবে, তা সত্য নয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যাপারটা আমার আলোচনার উপজীব্য তা হলো— ব্যাপকহারে নারীলোলুপতা বাস্তবায়িত করতে হলে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া চাই। অর্থাৎ, ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে কিংবা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে সেই 'পুরুষালি লালসা' পরিস্ফুটনের সুযোগ থাকে বেশি, ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই। আকবরের পক্ষেই সম্ভব ছিল ৫০০০ নারীর হারেম পোষার, কিংবা সুলতান মৌলে ইসমাইলের পক্ষেই সম্ভব ছিল ১০৪২জন সন্তান-সন্ততি ধরাধামে রেখে যাওয়ার, সহায়সম্বলহীন রহিমুদ্দিনের পক্ষে নয়। এখন বিবর্তনের যাত্রাপথের এই সিমুলেশনগুলো বার বার করা হলে দেখা যাবে, সম্পদের সাথে মেটিং স্ট্রাটিজির একটা সম্পর্ক বেড়িয়ে আসছে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বহু সমাজে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বহুগামিতায় যেমন আসক্ত হতে চায়, তেমনি আবার মেয়েরা উঁচু স্ট্যাটাসের পুরুষদের 'মেটিং পার্টনার' হিসেবে পছন্দ করে। এর সত্যতা ভেনিজুয়ালার আদিম ইয়ানোমামো (Yanomamo), প্যারাগুয়ের আহকে (Aché), বৎসোয়ানার কাঙ (!Kung) এর মতো আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজগুলোতে যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনি তা পাওয়া গেছে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন দেশেই। যেমন, তাইওয়ানের মেয়েরা মেয়েদের স্ট্যাটাসের চেয়ে ছেলেদের স্ট্যাটাসকে ৬৩% বেশি গুরুত্ব দেয়, জাম্বিয়ায় সেটা ৩০% বেশি, জার্মানিতে ৩৮% বেশি, ব্রাজিলে ৪০% বেশি ইত্যাদি[221]। আমেরিকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালানো বিভিন্ন সমীক্ষা থেকেও দেখা গেছে মেয়েরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলেদের সামাজিক পদমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে[222, 223]। তাই সম্পদ আহরণ, আর স্ট্যাটাসের সাথে পুরুষ নারীর মেটিং স্ট্র্যাটিজির জোরালো সম্পর্ক আছে বলেই বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। অর্থাৎ, বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায় দেখলে দেখা যাবে, সমাজের প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরাই বহু এবং কাঙ্ক্ষিত নারীর দখল নিতে পেরেছে কিংবা পারছে, আবার অন্য দিকে নারীরাও প্রভাবশালী পুরুষদের মেটিং পার্টনার হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইছে। ইতিহাস নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করলেও সেটার সত্যতাই খুঁজে পাওয়া যায়।

---

221 David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003

222 M. C Langhorne and Paul F Secord, Variations in marital needs with age, sex, marital status, and regional location, The Journal of Social Psychology, Vol 41, p 19-37, 1955.

223 D.M.Buss & D.P.Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, p 204-232, 1993.

সেজন্যই পুরুষেরা ধন সম্পদ আহরণে, কিংবা নিজের খ্যাতি যশ, ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য নিরন্তর প্রতিযোগিতা করে, নারীরাও অন্যদিকে এ ধরনের যশস্বী প্রতিপত্তিশালী লোকজনকে আকর্ষণীয় মনে করে।

ক্ষমতা বাড়িয়ে অধিক নারীর দখল নেওয়া সম্ভবত পুরুষদের মেটিং স্ট্র্যাটিজি ছিল বরাবরই। যারা এই স্ট্রাটিজিতে সফল হয়েছে, তারাই অধিক হারে নারীর দখল নিতে পেরেছে, আর বহু সন্তান-সন্ততি রেখে গেছে। যেমন মৌলে ইসমাইল এক হাজারের উপর সন্তান সন্ততি রেখে গিয়েছিলেন হারেমের অসংখ্য নারীর গর্ভে গর্ভসঞ্চারের মাধ্যমে। চেঙ্গিস খান আর বংশধরেরা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধজয়ের পরে এমনই ধর্ষণ করেছিলেন যে, এশিয়ার প্রায় ৮% জনসংখ্যার মধ্যে তাদের জিন ট্র্যাক করা যায় এখনও। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু যে স্ট্র্যাটিজিগুলো ক্ষমতাবান পুরুষেরা একসময় ব্যবহার করেছিল তাদের প্রজননগত সফলতা ত্বরান্বিত করতে, সেগুলোর ছাপ আধুনিক সমাজেও পাওয়া যায়। সেজন্যই আদিম শিকারি-সংগ্রাহক ট্রাইব থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার, চেঙ্গিসখান থেকে আধুনিক সমাজের বিল ক্লিন্টন, ডমেনিক স্ট্রাউস কান, আর আর্নল্ড শোয়ার্সনেগারদের মতো ক্ষমতাশালীদের আচরণে এটাই বোঝা যায় যে ক্ষমতার সাথে বহুগামিতার জোরালো সম্পর্ক অতীতেও ছিল, এখনও আছে।

একটি ব্যাপারে এখানে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উপরের আলোচনা থেকে কেউ যদি ধরে নেন, ক্ষমতাশালী হলেই সবাই পরকীয়ায় আসক্ত হবেন কিংবা নারীলোলুপ হয়ে যাবেন, তা কিন্তু ভুল হবে। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের নামে যে রকম নারী কেলেঙ্কারীর অপবাদ ছিল, বাংলাদেশের অন্য অনেক রাষ্ট্রপতিরদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। অথচ সকলেই ছিলেন একইরকমভাবেই বাংলাদেশের ক্ষমতার শীর্ষে। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে বিল ক্লিন্টন মনিকার সাথে যা করেছেন বুশ কিংবা ওবামা তা করেননি। ক্ষমতা থাকলেই কেউ এরশাদের মতো নারীলোলুপ হয় না, খুব সত্যি কথা। কিন্তু এরশাদ সাহেবের মতো নারীলোলুপতা বাস্তবায়িত করতে হলে বোধ করি রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া চাই। অর্থাৎ, ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে কিংবা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে সেই ‘পুরুষালি

লালসা' পুরিস্ফুটনের সুযোগ থাকে বেশি, ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই। আকবরের পক্ষেই সম্ভব ছিল ৫০০০ নারীর হারেম পোষার, কিংবা সুলতান মৌলে ইসমাইলের পক্ষেই সম্ভব ছিল ১০৪২জন সন্তান-সন্ততি ধরাধামে রেখে যাওয়ার; সহায়সম্বলহীন রহিমুদ্দিনের পক্ষে নয়। সেজন্যই সাতোসি কানাজাওয়া তার বইয়ের 'গাইস গন ওয়াইল্ড' অধ্যায়ে বলেছেন—

> Powerful men of high status throughout the history attained very high reproductive success, leaving a large number of offspring (legitimate or otherwise), while countless poor men in the country died mateless and childless. Moulay Ismail the Bloodthirsty stands out *quantitively*, having left more offspring than anyone else on record, but he was by no means *qualitatively* different from other powerful men, like Bill Clinton.

বিভিন্ন ধর্মীয় চরিত্র এবং ধর্ম প্রচারকদের জীবনী বিশ্লেষণ করলেও এই অনুকল্পের সত্যতা মিলবে। পদ্মপুরাণ অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজার এক শ। এদের সকলেই যে গোপবালা ছিলেন তা নয়, নানা দেশ থেকে সুন্দরীদের সংগ্রহ করে তার 'হারেমে' পুরেছিলেন কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষমতার আস্ফালনে। হিন্দু ধর্মের ক্ষমতাবান দেবচরিত্রগুলো—ইন্দ্র থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যভিচারী; ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ মুনিঋষিরা যে ছিল কামাসক্ত, বহুপত্নীক এবং অজাচারী—এগুলো তৎকালীন সাহিত্যে চোখ রাখলেই দেখা যায়। এই সব মুনিঋষিরা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি আর জাত্যাভিমানকে ব্যবহার করতেন একাধিক নারীদখলের কারিশমায়। ইসলামের প্রচারক মুহম্মদ যখন প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন ছিল না, তিনি খাদিজার সাথে সংসার করেছিলেন। খাদিজা ছিলেন বয়সে মুহম্মদের ১৫ বছরের বড়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মুহম্মদ অর্থ, বৈভব এবং সমরাঙ্গনে অবিশ্বাস্য সফলতা অর্জন করার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সি সুন্দরী নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মহানবির বয়স ছিল ৪৯। সেই ৪৯ থেকে ৬৩ বছর

বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে হলেও ১১ টি বিয়ে করেন[224]। এর মধ্যে আয়েশাকে বিয়ে করেন আয়েশার মাত্র ৬ বছর বয়সের সময়। এ ছাড়া তার দত্তক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন (সে সময় আরবে দত্তক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মুহম্মদ আল্লাহকে দিয়ে কোরানের ৩৩ : ৪, ৩৩ : ৩৭, ৩৩ : ৪০ সহ প্রভৃতি আয়াত নাজিল করিয়ে নেন); এ ছাড়া ক্রীতদাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন (সে সময় তিনি হাফসাকে ওমরের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে[225]) যা হাফসা এবং আয়েশাকে রাগান্বিত করে তুলেছিল; যুদ্ধবন্দি হিসেবে জুয়ারিয়া এবং সাফিয়ার সাথে সম্পর্ক পরবর্তীতে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন পথে নারীর দখল নিতে মুহম্মদ আগ্রহী হয়েছিলেন তখনই যখন তার অর্থ প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে।

প্রভূত ক্ষমতা এবং যশ মানুষকে অনৈতিক করে তোলে। কিংবা কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়—অনৈতিকতা এবং ভোগলিপ্সাকে চরিতার্থ করতে পারে মানুষ, যদি তার হাতে প্রভুত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। এটা বুঝতে কারো রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। সেজন্যই টাইম ম্যাগাজিনের আলোচিত ‘Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs’ নামের সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করেছেন ন্যান্সি গিবস—

> ক্ষমতাধর মানুষেরা ভিন্নভাবে ঝুঁকি নিতে চায় অনেকটা নার্সিসিস্টদের মতোই। তারা মনে করতে শুরু করে সমাজের সাধারণ নিয়মকানুনগুলো আর তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে তারা। আর মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে সে সময় তাদেরকে ঘিরে থাকে তার পরম হিতৈষী অনুরাগী, স্তাবক আর কর্মীরা, যারা নিজেদের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে

[224] ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর ‘Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad’ গ্রন্থে প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণীর উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে ১৬ জনকে তিনি বিবাহের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেন, এ ছাড়া তিনি সম্পর্ক করেছিলেন ২ জন দাসী এবং অন্য ৪ জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল।

[225] William Muir, 'Life of Mahomet' Vol.IV Ch.26 pp. 160-163

ক্ষমতাধারী মানুষটিকে রক্ষা করে যায়, তার করা অপরাধকে ঢেকে রাখতে চায়, আর তার অনৈতিক ব্যাপার স্যাপারগুলোকে নানাভাবে ন্যায্যতা দিতে সচেষ্ট হয়'।

লর্ড একটন বহু আগেই বলে গিয়েছিলেন – 'Absolute power corrupts absolutely'। এই ব্যাপারটা এতোটাই নির্জলা সত্য যে এ নিয়ে কেউ আলাদা করে চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু কেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রায়ই নিরঙ্কুশ দুর্নীতির জন্ম দেয়, কেন তৈরি করে এরশাদের মতো লুলপুরুষ? এগুলোর উত্তর সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যজনকভাবে লুকিয়ে রয়েছে সমাজ এবং ইতিহাসের বিবর্তনবাদী বিশ্লেষণের মধ্যেই।

তাহলে নারীদের পরকীয়ার জৈবিক ব্যাখ্যা কী?

নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই যেমন একগামিতা দৃশ্যমান, তেমনি দৃশ্যমান বহুগামিতাও। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই লংটার্ম বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক করার মনোবাসনা যেমন আছে, তেমনি সুযোগ এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় উঠে আসে শর্টটার্ম বা স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কের মনোবাঞ্ছাও। পুরুষের মধ্যে বহুগামিতা বেশি, কারণ অতীতের শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে শক্তিশালী এবং প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরা যেভাবে নারীর দখল নিত, সেটার পর্যাক্রমিক ছাপ এখনও ক্ষমতাশালী পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করলে পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে নারীরা পরকীয়া করে না, কিংবা তাদের মধ্যে বহুগামিতা নেই। এই অধ্যায়ের আগের অংশে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, প্রভাবশালী কিংবা ক্ষমতাশালী পুরুষেরা যেমন পরকীয়া করতে উন্মুখ থাকে, তেমনি, ক্ষমতাশালী কিংবা প্রভাবশালী পুরুষের স্ট্যাটাস আবার নারীর কাছে পছন্দনীয়। কোনো নারীর বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে যদি তার প্রেমিকের পদমর্যাদা বা স্ট্যাটাস ভালো হয়, কিংবা প্রেমিক দেখতে শুনতে অধিকতর সুদর্শন হয়, কিংবা যে সমস্যাগুলো নিয়ে একটি নারী তার পার্টনার কিংবা স্বামীর সাথে অসন্তুষ্ট, সেগুলোর সমাধান যদি তার প্রেমিকের মধ্যে খুঁজে পায়, নারী

পরকীয়া করে। তাই আমেরিকায় আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার, নিউট গিংরিচ, বিল ক্লিন্টন কিংবা বাংলাদেশে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কিংবা হুমায়ূন আহমদে যখন পরকীয়া করতে চেয়েছে, তারা সেটা করতে পেরেছে, কারণ নারীরাও তাদের মতো যশস্বী কিংবা 'হাই স্ট্যাটাসের' কেউকেটাদের সাথে সম্পর্ক করতে প্রলুব্ধ হয়েছে। নারীর আগ্রহ, অনুগ্রহ কিংবা চাহিদা ছাড়া পুরুষের পক্ষে পরকীয়া করা সম্ভব নয়, এটা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলেছি লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটিজি নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছে। বহু কারণেই এটি নারী পরকীয়া করতে পারে, আগ্রহী হতে পারে বহুগামিতায়। নারীর পরকীয়ার এবং বহুগামিতার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুকল্প বা হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেছেন বিজ্ঞানীরা, এর মধ্যে রয়েছে—রিসোর্স হাইপোথিসিস, জেনেটিক হাইপোথিসিস, মেট সুইচিং হাইপোথিসিস, মেট স্কিল একুজেশন হাইপোথিসিস, মেট ম্যানুপুলেশন হাইপথিসিস ইত্যাদি[226]। দু-একটি বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জৈবিক কারণেই অসতর্ক কিংবা অপরিকল্পিত যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে (casual sex) নারীরা পুরুষদের মতো প্রজননগত উপযোগিতা পায় না। তারপরেও নারীরা পরকীয়া করে, কারণ নারীদের ক্ষেত্রে বহুগামিতার একটি অন্যতম উপযোগিতা হতে পারে, সম্পদের তাৎক্ষণিক যোগান। শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, খাদ্যের বিনিময়ে তারা পুরুষ শিম্পাঞ্জিকে যৌনতা প্রদান করে থাকে। গবেষকেরা লক্ষ করেছেন, নারী শিম্পাঞ্জিরা সেই সব পুরুষ শিম্পাঞ্জিদের প্রতিই যৌনতার ব্যাপারে থাকে সর্বাধিক উদার যারা খাদ্য যোগানের ব্যাপারে কোনো কৃপণতা করে না। শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে কোনো কিছু সত্য হলে মানবসমাজেও সেটা সত্য হবে, এমন কোনো কথা নেই অবশ্য। কিন্তু তারপরেও বিজ্ঞানীরা আমাজনের মেহিনাকু (Mehinaku) কিংবা ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের (Trobriand Island) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের

---

[226] D.M. Buss, Human Mating Strategies, Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.

মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সেখানেও পুরুষেরা নারীদের জন্য (অনেকটা শিম্পাঞ্জিদের সমাজের মতোই) রকমারি খাদ্য, তামাক, বাদাম, শঙ্খের মালা, বাহুবন্ধনী প্রভৃতি উপঢৌকন সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, আর বিনিময়ে নারীরা যৌনতার অধিকার বিনিময় করে। যদি কারো কাছ থেকে উপঢৌকনের যোগান বন্ধ হয়ে যায়, তবে নারীরাও সে সমস্ত পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক বন্ধ করে দেয়[227]। সম্পদের যোগানের সাথে যে নারীর যৌনতা প্রদানের একটা অলিখিত সম্পর্ক আছে, তা জানার জন্য অবশ্য আদিম সমাজে যাওয়ার দরকার নেই। আধুনিক সমাজেও সেটা লক্ষ করলে পাওয়া যাবে। সবচেয়ে চরম উদাহরণটির কথা আমরা সবাই জানি—পতিতাবৃত্তি। নারী যৌনকর্মীরা অর্থসম্পদের বিনিময়ে যৌনতার সুযোগ করে দেয় পুরুষদের—এটা সব সমাজেই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা থেকে পুরুষদের বহুগামী চরিত্রটি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি হয় আর্থিক লাভের জন্য নারীর যৌনতা বিক্রির সম্পর্কটিও[228]। যৌনকর্মী শুধু নয়, আমেরিকায় সাধারণ মেয়েদের মধ্যে গবেষণা করেও দেখা গেছে, যে সমস্ত নারীরা শর্ট টার্ম বা স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছুক, তারা আশা করে যে, তার প্রেমিক অর্থ কড়ির দিক থেকে কোনো কৃপণতা দেখাবে না, অনেক ধরনের দামি উপহার সামগ্রী উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে আসবে, বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হবে, নিয়মিতভাবে ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে তাকে আপ্যায়ন করবে, এবং সর্বোপরি যে কোনো ধরনের সম্পদের বিনিয়োগে থাকবে উদার[229]। কৃপণ স্বামীকে যাও বা মেয়েরা কিছুটা হলেও সহ্য করে, অ্যাফেয়ারে আগ্রহী কৃপণ যৌনসঙ্গীকে কখনোই নয়। অ্যাফেয়ার বা পরকীয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের কৃপণতা মেয়েদের কাছে গ্রহণীয় কিংবা পছন্দনীয় নয়, কারণ তারা সঙ্কেত পেতে শুরু করে যে, তার সঙ্গীটি হয়তো ভবিষ্যতেও তার জন্য সম্পদ বিনিয়োগে সে রকমভাবে আগ্রহী নয়। এই মানসিক অভিরুচিগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়,

[227]Bronisław Malinowski, The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia, London, 1929

[228] N. Burley, & R. Symanski. Women without: an evolutionary and cross- cultural perspective on prostitution. In R. Symanski, The immoral landscape. Toronto: Butterworths, 1981.

[229] D. M. Buss, & D. P. Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, p 204–232,1993.

সম্পদের তাৎক্ষণিক আহরণ নারীদের ক্ষেত্রে এক ধরনের অভিযোজনজনিত উপযোগিতা দিয়েছে, যা নারীরা অনেক সময় পরকীয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায়।

নারীদের পরকীয়ার ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় প্যাটার্ন পাওয়া গিয়েছে, যেটা পুরুষদের থেকে কিছুটা আলাদা। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নতুন সঙ্গীর সাথে অপরিকল্পিত যৌনসম্পর্কের (casual sex) মাধ্যমে নারীরা সঙ্গীটিকে ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে মূল্যায়ন করে নিতে চায়। সে জন্যই এমনকি স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বহুগামী, বোহেমিয়ান ধরনের ছেলের সাথে সম্পর্ক করতে নারীরা প্রাথমিকভাবে অনিচ্ছুক থাকে; অতীতে যদি পুরুষটির বহু নারীর সাথে সম্পর্ক কিংবা আসক্তি থেকে থাকে, তা নারীটির কাছে এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সংকেত নিয়ে উপস্থিত হয়। এর কারণ, স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কে জড়ালেও তার অবচেতন মনে থাকে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা, যার নিরিখেই সে সাধারণত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে থাকে। তার সঙ্গীর বহুগামিতা কিংবা অতীতে বহু নারীর প্রতি আসক্তির অর্থ তার চোখে হয়ে ওঠে তার সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার নিয়ামক। অর্থাৎ, সে ধরে নেয় এ ধরনের পুরুষেরা 'ভবিষ্যৎ স্বামী' হিসেবে উপযুক্ত নয়। মোটা দাগে, ভবিষ্যৎ স্বামীর মধ্যে যে গুণাবলিগুলো প্রত্যাশা করে, ঠিক সেগুলোই একটি নারী তার যৌনসঙ্গীর মধ্যে খুঁজতে চায়[230]। দুটি ক্ষেত্রেই মেয়েরা চায় তার পুরুষ সঙ্গী হবে দয়ালু, রোমান্টিক, সমঝদার, দুর্দান্ত, স্বাস্থ্যবান, রসিক, বিশ্বস্ত এবং সম্পদের বিনিয়োগের ব্যাপারে থাকবে উদার। সেজন্যই বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী ডেভিড বাস তার 'বাসনার বিবর্তন' (The Evolution Of Desire) বইয়ে বলেন[231],

> উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের অভিরুচির এই অপরিবর্তনীয়তা ইঙ্গিত করে যে, নারীরা অনিয়মিত যৌনসঙ্গীকে হবু স্বামী হিসেবেই দেখে এবং সেজন্য দুইক্ষেত্রেই বেশি পদপর্যাদা আরোপ করে।

---

[230] David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003

[231] "The constancy of women's preferences in both scenarios is consistent with the theory that women see casual mates as potential husbands and thus impose high status for both", quoted from David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003, p 88.

বহু সমাজে আবার দেখা গেছে, যে সমস্ত সমাজে সহিংসতা খুব বেশি, নারীরা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক করে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা চিন্তা করে। স্বামীর বাইরে গোত্রের অন্য কোনো পুরুষের সাথে যদি নারীর কোনো 'বিশেষ বন্ধুত্ব' গড়ে উঠে তবে সে স্বামী বাইরে থাকলে বা অন্য কোনো সময়ে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে। এ ব্যাপারটা সাধারণভাবে প্রাণিজগতের মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন, সাভানা বেবুনদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বারবারা স্মুটস সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই ধরনের বেবুনদের সমাজে একটি নারী বেবুনের সাথে প্রাথমিক বা মূলসঙ্গীর বাইরেও একজন বা দুজন সঙ্গীর সাথে 'বিশেষ ধরনের' সম্পর্ক গড়ে উঠে, এবং সেই সঙ্গী বা সঙ্গীরা অন্য বেবুনদের উত্যক্ত করার হাত থেকে নারী বেবুনটিকে রক্ষা করে[232]। 'পর-পুরুষের' সাথে যৌনতার বিনিময়ে মূলত জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নারী বেবুনটি। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী রবার্ট স্মিথ তার একটি গবেষণাপত্রে বলেন[233] —

> প্রাথমিক সঙ্গীটি সবসময় নারী বেবুন কিংবা তার সন্তানের পাশে থেকে থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না। তার অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো পুরুষের সাথে নারীটির 'বিশেষ কোনো সম্পর্ক' থাকলে তা তার বেঁচে থাকায় বাড়তি উপযোগিতা নিয়ে আসে। এভাবে নারীটি অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে নিজের এবং নিজের সঙ্গীর জিন রক্ষা করার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্ট্র্যাটিজি তৈরি করে।

এ ধরনের স্ট্র্যাটিজি মানবসমাজে বর্তমানে খুব বেশি দৃশ্যমান না হলেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আদিম শিকারি সংগ্রাহক কিছু সমাজে যেখানে নারীদের উপর পুরুষালি সহিংসতা, আগ্রাসন, ধর্ষণ খুবই বেশি, সেখানে নারীরা এ ধরনের 'অতিরিক্ত যুগল বন্ধনের' মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে[234]।

---

[232] Barbara B. Smuts, Sex and Friendship in Baboons, Harvard University Press, 1999

[233] R. L. Smith, (Ed.) Sperm Competition and the Evolution of Animal Mating Systems. Academic Press, New York. 688 pp, 1984.

[234] B. Smuts, Male aggression against women: An evolutionary perspective. Human Nature 3:1-44,1992.

সঙ্গী রদবদল বা 'মেট সুইচিং'ও হতে পারে আরেকটি বড় কারণ যার কারণে একটি নারী পরকীয়া করতে পারে। স্পটেড স্যান্ড পাইপার (বৈজ্ঞানিক নাম Actitis macularia) নামে আমেরিকার মিনেসোটার হ্রদে দৃশ্যমান এক ধরনের পাখিদের মধ্যে সঙ্গী রদবদলের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে। জীববিজ্ঞানী মার্ক কলওয়েল এবং লিউস ওরিং প্রায় চার হাজার ঘণ্টা ধরে এই পাখিদের জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ ধরনের পাখিদের মধ্যে সঙ্গী রদবদল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা[235]। সঙ্গী রদবদলের মাধ্যমে বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে আরও আকর্ষণীয় সঙ্গীকে খুঁজে নেয় একটি নারী স্পটেড স্যান্ড পাইপার। মানবসমাজেও কিন্তু এ ব্যাপারটি লক্ষ করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে অন্য কাউকে অধিকতর আকর্ষণীয়, সুদর্শন কিংবা কাঙ্ক্ষিত মনে হলে, কিংবা বর্তমান সঙ্গীর স্ট্যাটাসের চেয়ে উঁচু সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন কেউ তার সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলে নারী তার সাথেও পরকীয়ায় জড়াতে করতে পারে। পরকীয়া করতে পারে যদি নারীর বর্তমান সঙ্গী যদি অসুস্থ হয়, পঙ্গু হয়, শারীরিকভাবে অক্ষম হয়, যুদ্ধাহত হয় কিংবা মুমূর্ষু হয়। বাংলাদেশে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের চাঞ্চল্যকর মুনীর-খুকুর পরকীয়া আর তাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক রীমা হত্যাকাণ্ডের কথা নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। মধ্যবয়সি খুকু পরকীয়া প্রেম শুরু করেছিলেন ড. মেহেরুন্নেসার পুত্র মুনীরের সাথে। খুকুর স্বামী ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অসুস্থ। স্বামীর এ শারীরিক পরিস্থিতি খুকুকে চালিত করেছিল মুনীরের সাথে পরকীয়ায় জড়াতে, আর প্ররোচিত করেছিল মুনীরকে রীমা হত্যায়। কাজেই নারী শুধু পরকীয়া করে না, প্রয়োজনে পরকীয়ার কারণে হত্যায় প্ররোচনা দেওয়া শুধু নয়, নিজ হাতে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। কিছুদিন আগে পরকীয়ার কারণে আয়শা হুমায়রা কীভাবে তার নিজের সন্তান সামিউলকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে লাশ ফ্রিজবন্দি করে পরে বাইরে ফেলে দিয়েছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ

[235] M.A. Colwell, & L.W. Oring. Extra-pair mating in the spotted sandpiper: A female mate acquisition tactic. Animal Behavior 38:675-684, 1989.

বিবরণ দিনের পর দিন ধরে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরকীয়ার কারণে মায়ের নিজ সন্তান হত্যা হয়তো খুব চরম এবং ব্যতিক্রমী উদাহরণ, কিন্তু আকর্ষণীয় সঙ্গীর জন্য বর্তমান সঙ্গীকে ত্যাগ, কিংবা স্বামীর তুলনায় আরও 'উৎকৃষ্ট' কারো সাথে লুকিয়ে ছাপিয়ে পরকীয়া তা নয়। এ ব্যাপারটা সব সময়ই এবং সব সমাজেই ছিল। পয়সাওয়ালা কিংবা সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, আকর্ষণীয়, মনোহর কিংবা উঁচু পদমর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীর জন্য পুরাতন সঙ্গীকে ত্যাগ মেয়েদের মধ্যে এক সময় একধরনের অভিযোজনগত উপযোগিতা দিয়েছিল, অন্তত হেলেন ফিশারের মতো নৃতত্ত্ববিদেরা তাই মনে করেন[236]। সেই আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজের কথা চিন্তা করুন, যেখানে একটি নারীকে 'বিয়ে করতে' হয়েছিল এক দুর্বল শিকারিকে যার চোখের দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ, শিকারে অযোগ্য এবং স্বভাবে কাপুরুষ। এ ধরনের সম্পর্কে থাকা নারীরা মানসিক অতৃপ্তি মেটাতে হয়তো পরকীয়া শুরু করেছিল সুস্থ সবল, স্বাস্থ্যবান তরুণ কোনো সাহসী শিকারির সাথে—'মিস্টার গুড জিন' পাওয়ার এবং ভবিষ্যত সন্তানের মধ্যে তা রেখে যাওয়ার প্রত্যাশায়। ভালো জিনের জন্য সঙ্গীবদলের ব্যাপারটি যদি আদিম শিকারি সংগ্রাহক পরিস্থিতিতে নারীদের একধরনের স্ট্র্যাটিজি হয়ে থাকে, তবে সেটি এখনকার সময়েরও বাস্তবতা হতে পারে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। i¨vwÛ থর্নহিলের একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এই 'গুড জিন' অনুকল্পের সত্যতা পাওয়া গিয়েছে[237]। গবেষণায় দেখা গেছে নারীরা যখন পরকীয়া করে তখন প্রতিসম চেহারার প্রতি আকর্ষিত হয় বেশি[238]। প্রতিসম চেহারা সবসময়ই একটি ভালো 'ফিটনেস মার্কার' হিসেবে বিবেচিত। প্রেমিকের চেহারা প্রতিসম হওয়া মানে—তার প্রেমিকের চেহারা আকর্ষণীয়, তার শরীরের গঠন উন্নত, সে পুরুষালি, বুদ্ধিদীপ্ত,

---

[236] Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray, Ballantine Books 1994

[237] S.W. Gangestad, R. Thornhill, The evolutionary psychology of extra-pair sex: The role of fluctuating asymmetry. Evolution and Human Behavior 18: 69—88, 1997.

[238] "Women choose symetrical men as affair partmers more than asymetrical men" - quoted on Randi Thornhil's most important finding, (Ref. David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003)

চৌকষ, স্বাস্থ্যবান এবং রোগজীবাণু থেকে মুক্ত[239]। তাই যে নারী স্বামীকে রেখে প্রতিসম বৈশিষ্ট্যের প্রেমিকের পেছনে ছুটছে, তার 'প্রস্তর যুগের মস্তিষ্ক' আসলে প্রকারান্তরে 'ভালো জিন' নিজ সন্তানের জন্য নিশ্চিত করে রাখতে চাইছে।

ভালো জিনের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পরকীয়া করার এই জেনেটিক হাইপোথিসেরই আরেকটি প্রচলিত রূপ হচ্ছে 'জোশিলা পোলা' বা 'সেক্সি সন' অনুকল্প। এই অনুকল্পটি **১৯৭৯** সালে প্রস্তাব করেছিলেন কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী প্যাট্রিক ওয়েদারহেড এবং রালি রবার্টসন। এই অনুকল্প অনুযায়ী মনে করা হয় যে, সুদর্শন পুরুষের সাথে নারী পরকীয়া করে কিংবা স্বল্পমেয়াদি যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে কারণ, অবচেতন মনেই তার মাথায় থাকে যে, তার সন্তানও হয়ে উঠবে ঠিক একই রকম মনোহারী গুণাবলির অধিকারী। পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা তার সন্তানের এই প্রীতিকর বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হবে, ফলে যাদের মধ্যে এই গুণাবলিগুলোর অভাব রয়েছে তাদের তুলনায় তার সন্তান অনেক বেশি প্রজননগত সফলতা অর্জন করতে পারবে। বেশ কিছু সাম্প্রতিক জরিপে এই তত্ত্বের স্বপক্ষে কিছুটা হলেও সত্যতা মিলেছে। দেখা গেছে, নারীরা যখন পরকীয়ায় আসক্ত হয় তখন তাদের একটা বড় চাহিদা থাকে স্বামীর চেহারার চেয়ে প্রেমিকের চেহারা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে হবে[240]।

শুধু ভালো জিন, ভালো চেহারা বা ভালো সন্তানের জন্যই নয়, নারীরা আরও বহু কারণেই পরকীয়া করতে পারে। সামাজিক স্ট্যাটাস তার মধ্যে একটি। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন বিবাহিত নারী যখন অন্য কোনো পুরুষের সাথে পরকীয়া করে, সেই পুরুষের স্ট্যাটাস, প্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি তার বর্তমান স্বামীর

---

[239] R. Thornhill and S.W. Gangestad, Do women have evolved adaptation for extra-pair copulation? Pp. 341-368 in Evolutionary Aesthetics, K. Grammer and E. Voland, eds. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2003.

[240] Douglas T Kenrick, Gary E Groth, Melanie R Trost and Edward K Sadalla, Integrating evolutionary and social exchange perspectives on relationships: Effects of gender, self-appraisal, and involvement level on mate selection criteria, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 64(6), Jun 1993, 951-969.

চেয়ে অনেক বেশি থাকে[241]। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং ২০১২ সালের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী (পরে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন থেকে সরে দাঁড়ানো) ডোনাল্ড ট্রাম্প বছর খানেক আগে এক অপরিচিত মডেল মার্থা মেপেলের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়লে রাতারাতি মার্থা মেপল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। মিডিয়ার পাবলিসিটি তো ছিলই, সাথে সাথে নানা ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ, গণ্যমান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদা ভোগ করতে থাকেন। বাংলাদেশেও এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন জিনাত মোশারফসহ বহু নারীর সাথে পকীয়ায় মত্ত ছিলেন, তখন সে সমস্ত নারীরাও রাতারাতি বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে গিয়েছিলেন। এ সমস্ত নারীরা এমন সব মহলে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কিংবা সভায় প্রবেশ করতেন অবলীয়ায়, যেগুলোতে সাধারণ মানুষদের জন্য প্রবেশ ছিল অকল্পনীয়। প্রেমের অর্থনীতির বাজারে কোনো কেউকেটা বা বিখ্যাত লোক যখন কোনো পরিচিত নারীর সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়, তখন সে যত অখ্যাতই আগে থাকুক না কেন, মানুষ ভেবে নেয় নারীটি নিশ্চয় 'স্পেশাল'। সে রাতারাতি চলে আসে আলোচনা আর ক্ষমতার কেন্দ্রে। নারীটি পায় নতুন পরিচিতি, আর সামাজিক এবং বন্ধুমহলে ঘটে তার 'স্ট্যাটাসের উত্তরণ'।

যে কারণেই নারী পরকীয়া করুক না কেন, প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ সারা ব্ল্যাফার হার্ডি মনে করেন যে, নারী-পরকীয়ার ব্যাপারটা মানবেতিহাসের সূচনা থেকেই এমনভাবে জড়িত ছিল যে, সেটাকে অস্বীকার করা বোকামিই[242]। অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেখানে নারীরা বহুগামী। হার্ডি তার গবেষণাপত্রে শিম্পাঞ্জিদের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন যে, বহুগামিতার মাধ্যমে নারী শিম্পাজিরা ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে—এক, অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করে সদ্যজাত সন্তানকে কেউ ঈর্ষার বশবর্তী

[241] R. R. Baker,, &, M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity. London: Chapman & Hall, 1995.

[242] Sarah Blaffer Hrdy, Empathy, Polyandry, and the Myth of the Coy Female, in Ruth Bleier, ed., Feminist Approaches to Science, New York: Pergamon, pp. 119-146, 1986

হয়ে হত্যা করবে না, আর দুই—সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে গোত্রে এক ধরনের 'ধোঁয়াশা' তৈরি করা; যার ফলে সকল পুরুষ শিম্পাঞ্জিই নিজেকে তার অনাগত সন্তানের পিতা ভেবে নারী এবং শিশুটিকে রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবে।

হার্ডি মনে করেন শিম্পাঞ্জির জন্য যে ব্যাপারটি সত্য, মানুষের বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমাতেও সে ব্যাপারটা কিছুটা হলেও প্রায় একই রকমভাবে সত্য হতে পারে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষের অণ্ডকোষ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, পুরুষের অপেক্ষাকৃত বড় শুক্রাশয় এটাই ইঙ্গিত করে যে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নারীরা একগামী নয়, বরং বহুগামীই ছিল। একই অধ্যায়ে নারী বহুগামিতার আরও একটিও বড় সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কীলকাকৃতি হওয়ার এবং সঙ্গমকালীন সময়ে উপর্যুপরী লিঙ্গাঘাতের মধ্যেও। সঙ্গীর যদি একই সময়ে আর কারো সাথে সঙ্গমের সম্ভাবনা না থাকত তবে এগুলো একটি পুরুষের পুরুষাঙ্গের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শরীরে জায়গা করে নিত না। বহু মানুষের শুক্রাণুর প্রতিযোগিতায় সঙ্গীর গর্ভে নিজের সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিত করতেই এই শারীরিক বৈশিষ্ট্য আর প্রক্রিয়াগুলো পুরুষের দেহে তৈরি হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আরও দেখেছিলাম যে, দম্পতিদের দীর্ঘদিন আলাদা করে রেখে তারপর সঙ্গমের সুযোগ করে দিলে পুরুষের বীর্য প্রক্ষেপণের হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন পৃথক থাকাকালীন সময়ে স্ত্রীর পরকীয়ার সম্ভাবনার থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারটা ঘটে বলে মনে করা হয়। শুধু পুরুষের দেহে নয়, পরকীয়ার এবং বহুগামিতার বহু আলামত লুকিয়ে আছে নারীর নিজের দেহেও। অর্গাজম বা চরম পুলক এমনি একটি বৈশিষ্ট্য। রবিন বেকার এবং মার্ক বেলিসের যুগান্তকারী একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে সমস্ত নারীরা পরকীয়ায় জড়িত থাকে তারা চরম পুলক লাভ করে বেশি এবং তারা পরকীয়ার সময় তাদের স্বামী বা নিয়মিত সঙ্গীর

চেয়ে অনেক বেশি শুক্রাণু যোনিতে ধারণ করে রাখে[243]। অর্গাজম সংক্রান্ত এ ব্যাপারটিও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এ তো গেল জীববিজ্ঞানের কথা। এর বাইরে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য অনুসন্ধান করলেও আমরা দেখতে পাই মানবসমাজে নারীর কামস্পৃহা কখনোই কম ছিল না। বরং নারীর কামস্পৃহা বেশি বলেই নারীকে 'ছিনাল', 'মাগি', 'খানকি', 'বেশ্যা', 'কামুকী', 'কামার্ত', 'নটিনী', 'রাক্ষুসী' প্রভৃতি নানা শব্দ তৈরি করতে হয়েছে পুরুষতন্ত্রকে, এবং কামুক নারীকে বশীভূত রাখতে তৈরি করেছে নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের দেওয়াল। হিন্দু পুরাণ এবং সাহিত্যে আমরা দেখেছি কীভাবে সুপুরুষ রামচন্দ্রকে দেখে রাবণের বোন শূপর্ণখা কামার্ত হয়ে পড়েছিল, কিংবা মহাভারতে সুঠামদেহী অর্জুনকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েছিল নাগ রাজকন্যা উলুপী, তাকে সরাসরি দিয়েছিল দেহমিলনের প্রস্তাব[244] —

> হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরন্য অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

মহাভারতের বহু নারী চরিত্রই বহুচারিণী এবং বহুগামিনী। পাঁচ স্বামী নিয়ে ঘর করা দ্রৌপদী তো আছেনই, তার পাশাপাশি সত্যকামের মাতা জবালা, পাণ্ডব জননী কুন্তী থেকে শুরু করে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী, রম্ভা সকলেই ছিলেন বহুপুরুষাসক্ত। কামাসক্ত নারীর উদাহরণ এবং তাদেরকে অবদমনের নানা পদ্ধতি অন্য ধর্মগুলোতেও আছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বহু মুসলিম দেশে আধুনিক যুগেও নারী খৎনা নামের একটি কুৎসিৎ রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা হয়, যাতে নারীর কাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে পুরুষেরা। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাথমিক উৎসগুলো

---

[243] R. R. Baker, &, M. A. Bellis, Human sperm competition: Ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm, Animal Behavior, 46, 887–909.

[244] মহাভারত, আদিপর্ব, ২১৪ অধ্যায়

অনুসন্ধান করলেও দেখা যায়, তালমুদিক লেখকেরা স্ত্রীকে কামাসক্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর আদর্শ স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিত সঙ্গমের মাধ্যমে স্ত্রীর কামকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ইতিহাস এবং সভ্যতার এই বিশ্লেষণমূলক উদাহরণগুলো থেকে মনে হয়, নারীর কামাসক্তির ব্যাপারটা পুরুষদের জানা ছিল সবসময়ই। নৃতাত্ত্বিক সারা ব্ল্যাফার হার্ডি সেজন্যই মনে করেন, শিম্পাঞ্জিদের মতো মানুষও যখন বনে জঙ্গলে থাকত, মূলত গাছ গাছালিই ছিল বসতি, তখন শিম্পাঞ্জিদের মতো আমাদের নারীরাও ছিল বহুগামী। তারাও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে বহু পুরুষের সাথে 'বিশেষ সম্পর্ক' তৈরি করত, তারাও সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করতে চাইতো বেঁচে থাকার এবং নিজ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনেই। কিন্তু অরণ্য পর্বের পরে যখন মানুষ যখন প্রায় চার মিলিয়ন বছর আগে তৃণভূমিতে নেমে আসে, এবং যুগল বন্ধনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্থ হয়ে যায়, তখন থেকেই নারীর যৌনতাকে অবদমিত করা হয়। আর ব্যাপারটা আরও ত্বরান্বিত হয় মানুষ যখন পৌঁছোয় কৃষিপর্বে, তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। একসময় ওই সম্পদ অধিকারে চলে আসে গোত্রপতিদের; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী, উদ্ভাবন ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানার। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, পুরুষ সৃষ্টি করে পিতৃতন্ত্রের প্রথা, নারী পরিণত হয় পুরুষের সম্পত্তিতে। আগেই আমরা জেনেছি— যেহেতু পিতৃতন্ত্রের মূল লক্ষ্য থাকে 'সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তান উৎপাদন' সেজন্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জৈবিক এবং সামাজিক কারণেই বহুগামী স্ত্রীকে 'হুমকি' হিসেবে দেখা হয়। স্ত্রী বহুগামী হলে তার প্রভাব পড়ে ভূ-স্বামীর জমি-জমা, অর্জিত সম্পত্তিতে, তার সামাজিক পদপর্যাদায়। সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজে আসলে নারীকে যাচাই করা হয় দুটি বৈশিষ্টের নিরিখে—এক, নারী তার বাপের বাসা থেকে যৌতুক, ডাউরি প্রভৃতি নিয়ে এসে স্বামীর সম্পত্তিতে কতটা মূল্যমান যোগ করতে পারবে, আর দুই—তার শারীরিক

সৌন্দর্য আর শরীর-স্বাস্থ্য (গর্ভ) স্বামী এবং তার পরিবারের বীজ বপন এবং তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা উপযুক্ত। তাই দেখা যায় বহু কৃষিভিত্তিক সমাজে পুরুষের বহুগামিতার ব্যাপারে আইনকানুন শিথিল হলেও নারী বহুগামিতাকে সব সময়ই অধিকতর নিন্দনীয়ভাবে দেখা হয়; এমনকি বহুগামী স্ত্রীকে শারীরিক নিগ্রহ এমনকি হত্যা করা হলেও খারাপ চোখে দেয়া হয় না। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস অববাহিকায় গড়ে উঠা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে জানা যায়, সেখানে সাধারণভাবে মনে করা হতো নারীরা স্বামীর 'অনুগামী' থাকবে, তারা চিরকাল থাকবে স্বামীর সাথে একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল। পুরুষেরা কিন্তু তা নয়। তার ছিল বহুগামী। আর পুরুষের বহুগামিতাকে ততটা খারাপ চোখে দেখা হতো না। দেখা হতো মেয়েদেরটাই। যে সসমস্ত স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত না থেকে পরকীয়ায় মত্ত হতো, তাদের নাক কেটে ফেলা হতো। চীন জাপান এবং ভারতের অনেক জায়গাতেই পুরুষের পতিতাবৃত্তি, রক্ষিতা রাখা কিংবা গণিকা সম্ভোগ প্রভৃতিকে 'এডাল্ট্রি' হিসেবে গণ্য করা হয় না, কিন্তু বহু জায়গায় এখনও বহুগামী নারীকে বেত্রাঘাত আর পাথর ছুঁড়ে হত্যার বিধান প্রচলিত আছে। এমনকি পশ্চিমেও বিংশ শতাব্দীর আগে নারীদের বহুগামিতার কারণে স্বামীর বা পরিবারের আগ্রাসন থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো শক্ত রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ছিল না। বরং অবাধ্য, বহুগামী আর কামার্ত স্ত্রীকে নিগ্রহ, নির্যাতন আর হত্যাকে পরোক্ষভাবে উদযাপনই করা হতো সামাজিকভাবে। পরবর্তীকালের নারীবাদী আন্দোলন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক আইন কানুনের প্রবর্তন নারীদের এই নিগ্রহ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে।

বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মানব প্রজাতি শতকরা একশ ভাগ একগামিতার জন্য কিংবা শতভাগ বহুগামিতা—কোনোটির জন্যই বিবর্তনগতভাবে অভিযোজ্য হয়নি। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা যেমন গরিলাদের মতো হারেম করে চলা আকবর বাদশাহর সন্ধান পাই তেমনি আবার সন্ধান পাই একদ্বারপত্নীক বহু মানুষেরই। এরশাদের মতো লুলপুরুষও আবার সমাজে কম নেই।

নারীদের ক্ষেত্রেও মহাভারতের দ্রৌপদি থেকে শুরু করে ক্লিওপেট্রা, কিংবা অধুনা ব্রিটনি স্পিয়ার্স, প্যারিস হিল্টন কিংবা লিজ টেলর পর্যন্ত বহুগামী নারীর সন্ধানও খুঁজলেই পাওয়া যাবে, যেমনি পাওয়া যাবে সীতার মতো কেবল একস্বামী নিয়ে মত্ত কঠোর অনুরাগী স্ত্রীও। পাওয়া যাবে ছল-চাতুরি প্রতারণাপ্রবণ কিংবা কামকাতুরা নারীর দৃষ্টান্তও। সেজন্যই হেলেন ফিশার তাঁর “প্রেমের বিশ্লেষণ” (Anatomy of Love) বই এ লিখেছেন[245] —

> এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যে মেয়েরা যৌনতার ব্যাপারে লাজুক ছিল কিংবা তারা গোপন যৌন অভিযান এড়িয়ে চলে। বরং পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মিশ্র প্রজনন কৌশল প্রদর্শন করে; একগামিতা এবং বহুগামিতা দুটোই আমাদের স্বভাবজাত অভ্যাস।

বয়সের দোষ!

জৈবিকভাবে পুরুষেরা যে নারীদের তুলনায় অধিকতর সহিংস—এটা আমরা আগের বিভিন্ন আলোচনা থেকে জেনেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, পুরুষেরা সব বয়সেই একইরকম সহিংসতা প্রদর্শন করে? না তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ভায়োলেন্স ব্যাপারটা পুরুষদের মধ্যে সার্বজনীন হলেও এর ব্যাপ্তি বয়সের সাথে ওঠানামা করে। যে কোনো দেশেই দেখা গেছে গড়পরতা সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড এবং সহিংসতা পুরুষেরা করে থাকে যখন তাদের বয়স থেকে পনেরো থেকে উনত্রিশের মধ্যে[246]। তারপর যত বয়স বাড়তে থাকে সহিংসতা কমে আসে। এমনকি সিরিয়াল কিলাররাও একটা নির্দিষ্ট বয়েসের পরে সেভাবে আর হত্যা করে না। এর কারণটাও স্পষ্ট। কারণ এই বয়সের পরিসীমাতেই পুরুষেরা রিপ্রোডাক্টিভ কম্পিটিশনের চূড়ায় থাকে। আমেরিকায় করা সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পনেরো বছর বয়সের দিকে যখন

---

[245] Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray, Ballantine Books, 1994

[246] Alfred Blumstein, Youth Violence, Guns, And The Illicit-Drug Industry, Journal of Criminal Law and Criminology (Northwestern), Guns and Violence Symposium, vol 86, no. 1, 1995:10

ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্তি শুরু হয় তখনই খুন-খারাবির হার বাড়তে থাকে, বিশ বছরের দিকে একদম শীর্ষে পৌঁছায় এবং ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত খুন-খারাবি চলতেই থাকে[247]। খুন-খারাবির শিকার যারা হন, তারাও বেশি হন বিশ বছর বয়সের দিকেই। দেখা গেছে প্রতি বছরে আমেরিকায় প্রতি এক লক্ষ জনে খুনের হার দশ থেকে চৌদ্দ বছরে যেখানে মাত্র ১.৬, কিন্তু পনেরো থেকে উনিশ বছরের সময় সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ এ, আর বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সে তা ১৭.৮[248]। তারপর পঁচিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সের পরিসীমায় তা দাঁড়ায় ১৬.৩; বত্রিশ থেকে চৌত্রিশে ১৩.৯; আর পঁয়ত্রিশ উনচল্লিশ বছরের মধ্যে ১২। সেজন্যই ডেভিড বাস তার 'মার্ডারার নেক্সট ডোর' গ্রন্থে বলেছেন[249],

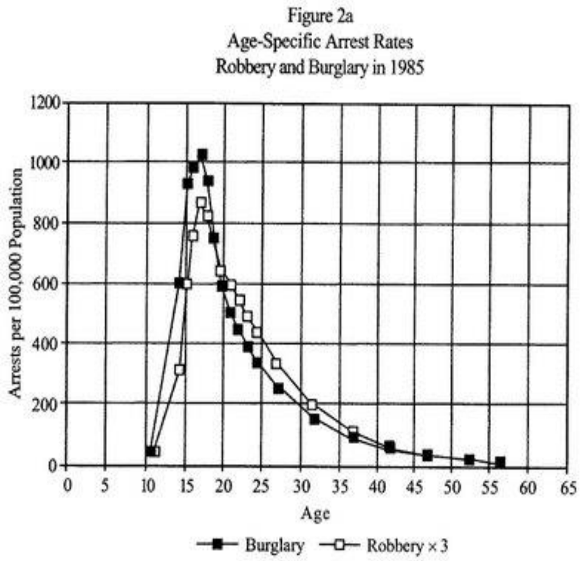
> এই সংখ্যাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষেরা যে সময়টাতে প্রজননগত প্রতিযোগিতার সময়ে প্রবেশ করে, সেই সময়েই খুন-খারাবির প্রকোপ নাটকীয় ভাবে বেড়ে যায়।

আমরা বাংলাদেশে আমাদের বাপ-দাদাদের ঘাড়ত্যাড়া আর রগচটা ছেলেপিলেদের দিকে দেখিয়ে বলতে শুনেছি—‘তরুণ বয়স তো, তাই ছেলের রক্ত গরম। দেখবেন বয়স হলে রক্তও ঠান্ডা হয়ে আসবে’। উনারা হয়তো চারপাশের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলেন। আসল কারণ হলো, যৌনতার প্রতিযোগিতাসূচক ব্যাপারগুলো যখন কমে আসে, তখন এমনিতেই সহিংসতা আর সেভাবে ব্যবহারে প্রকাশিত হয় না। এটাকেই হয়তো চলতি কথায় ‘রক্ত ঠান্ডা’ হয়ে যাওয়া বলে ভেবে নেওয়া হয়।

ব্যাপারগুলো ‘কমন সেন্স’ হিসেবে জানা ছিল অনেক আগে থেকেই কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কোনো গবেষণা ছিল না। ১৯৮৩ সালে দুই গবেষক ট্রাভিস হির্শি এবং মাইকেল গডফ্রেসন “Age

247 John M. MacDonald, The Murderer and His Victim, Charles C. Thomas, Publisher Ltd, 1986
248 David Lester, Questions and Answers about Murder, Charles Press Pubs, 1991
249 David M. Buss, The Murderer Next Door, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

and Explanation of Crime” নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখালেন বয়স এবং অপরাধপ্রবণতার এই ধারাটি সংস্কৃতি নির্বিশেষে একইরকম পাওয়া যাচ্ছে[250]। অর্থাৎ, যে কোনো সংস্কৃতিতেই দেখা যায় বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায় যৌবনের প্রারম্ভে, বিশ থেকে ত্রিশের দশকের সময়টায় তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর মধ্যবয়সে তা আনুভূমিক হয়ে যায়। নীচের রেখচিত্রটি দেখলে ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে—



চিত্র : ট্রাভিস হির্শি এবং মাইকেল গডফ্রেসন তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায় যৌবনের প্রারম্ভে, বিশ বছরের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর মধ্যবয়সে তা আনুভূমিক হয়ে যায়।

দু-চারটি ক্ষেত্রে এই গ্রাফের ব্যতিক্রম পাওয়া গেলেও সার্বজনীনভাবে এই গ্রাফের গড়নের সাথে প্রায় সকল অপরাধ-বিশেষজ্ঞই এখন একমত পোষণ করেন[251,252]।

---

250 Travis Hirschi and Michael Gottfredson, Age and the Explanation of Crime, American Journal of Sociology, v89 n3 p552-84 Nov 1983

251 Alfred Blumstein, পূর্বোক্ত।

252 Margo Wilson and Martin Daly, পূর্বোক্ত।

অপরাধপ্রবণতা আর প্রতিভা কি তবে এক সূত্রে গাঁথা?

এই অংশের শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন। কোথায় অপরাধপ্রবণতা আর কোথায় প্রতিভা! কোথায় বাগেররহাট আর কোথায় সদরঘাট! কিন্তু বাগেরহাট থেকে সদরঘাট যাওয়ার রাস্তা যেমন একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়, তেমনি অনেক গবেষক মনে করেন অপরাধপ্রবণতার সাথেও প্রতিভার একটা অলিখিত সম্পর্কও পাওয়া যাবে একটু নিবিষ্ট মনে খুঁজলেই। আগের অংশেই অপরাধ প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায় যৌবনের প্রারম্ভে, বিশ থেকে ত্রিশের দশকের সময়টায় তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর মধ্যবয়সে তা আনুভূমিক হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন ঠিক একই ধারা পাওয়া যাচ্ছে বয়স এবং মানব প্রতিভার মধ্যেও। বিভিন্ন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পীদের জীবনী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অধিকাংশরই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে যৌবনের প্রারম্ভেই, আর যৌবনের শেষ হতে না হতেই অতিদ্রুত প্রতিভার মৃত্যু ঘটে যায়। আসলে বয়স হলে প্রতিভাধরদের মাথা যে আগের মতো কাজ করে না, এর অনেক উদাহরণই তুলে ধরা যায়। পল ম্যাকার্টনি সেই কবে বিটলসের সময় জনপ্রিয় ছিলেন, ব্যতিক্রমধর্মী বহু গান লিখে সংগীতপিপাসুদের পাগল করে দিয়েছিলেন ষাট-সত্তুরের দশকে। অবধারিতভাবে তিনি তখন ছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে। তার পর বহু বছর পার হয়েছে, গঙ্গা যমুনা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে, তিনি একটিও 'জনপ্রিয় সংগীত' দর্শকদের জন্য লিখতে পারেননি। তার অধিকাংশ সময় এখন নাকি ছবি আঁকাতেই কেটে যায়। বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ, আলোর বিচ্ছুরণসহ তার সফল এবং বিখ্যাত আবিষ্কারগুলো তরুণ বয়সেই করে ফেলেছিলেন। আরও পরিষ্কার করে বললে তার ২৪ বছর বয়সের মধ্যেই। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনীর দিকে তাকাই। তার প্রায় সবগুলো আবিষ্কারই হয়েছে তাঁর 'বিস্ময় বছর' যাকে আমরা অভিহিত করি Annus Mirabilis হিসেবে—সেই বছরটিকে কেন্দ্র করে। সে বছরের প্রথমভাগে আইনস্টাইন প্রকাশ করেছিলেন ব্রাউনীয় গতির উপর একটা

গবেষণাপত্র—যেটি সে সময় দিয়েছিল অণুর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ, বানিয়েছিলেন আলোর কনিকা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আর সে সময়েই প্রকাশ করেছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি (Special Theory of relativity)। তার বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ সেসময় বাজারে এসেছিল একটি অতিরিক্ত (সংযোজনী) তিন পৃষ্ঠার পেপার হিসেবে। একটি পেপারের জন্য আবার পরবর্তীতে পেয়েছিলেন নোবেল। তখন তার বয়স চল্লিশও পেরোয়নি। মূলত সার্বিক অপেক্ষিক তত্ত্ব (General Theory of Relativity) আবিষ্কারের পর আইনস্টাইন আরও পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু আর কোনো বড় ধরনের আবিষ্কার করতে পারেননি। মূলত মধ্যবয়স থেকে শুরু করে বার্ধক্যের পুরোটা সময় জুড়েই আইনস্টাইন চেষ্টা করেছেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রমাণ করতে আর প্রকৃতি জগতের বলগুলোকে একটিমাত্র সুতায় গাঁথতে। তার সেই উচ্চাভিলাসী চেষ্টা কিন্তু সফল হয়নি। বরং জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারার গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী'তে পরিণত হন[253]। বিজ্ঞানীদের প্রতিভা আর বয়সের সম্পর্ক নিয়ে আইনস্টাইন নিজেই করে গেছেন মজার এক উক্তি[254] —

> যে ব্যক্তি ত্রিশ বছর বয়সের আগে বিজ্ঞানে কোনো অবদান রাখতে পারেনি, সে আর কখনোই পারবে না।

আইনস্টাইনের এই উক্তির সত্যতা আমরা পাই শুধু তার নিজের জীবনেই নয় পাশাপাশি বহু প্রতিভাধরদের জীবনেই। গণিত এবং পদার্থিবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোকে বহুদিন ধরেই ‘ইয়ং ম্যান্স গেম’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[255]। গণিতবিদ জন ফন নিউম্যান গণিতে যে অবিস্মরণীয় অবদানগুলো রেখে গেছেন, তার প্রায় সবগুলোই ২৫ বছর বয়সের মধ্যে। এর পর থেকে শুরু হয়েছিল মূলত

---

[253] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৬)

[254] A person who has not made his great contribution to science before the age of thirty will never do so. - Albert Einstein (Brodetsky, 1942, p. 699)

[255] Mukerjee, M. Explaining everything. Scientific American, 274, 88–94, 1996.

প্রতিভার পতন[256]। জেমস ওয়াটসন যে ডিএনএ তথা যুগল সর্পিলের রহস্যভেদ করার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তিনিও তা করেছিলেন ২৫ বছর বয়সে (সেই আবিষ্কারটির জন্য ওয়াটসন পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। তারপর থেকে যত দিন গেছে তার ক্যারিয়ারে আর কোনো সফলতার পালক যোগ করতে পারেননি। এধরনের অনেক উদাহরণই দেয়া যায়। বিল গেটস তরুণ বয়সে 'কম্পিউটার উইজার্ড' বালক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, আজকে প্রৌঢ় বয়সে তিনি হাতে কলমে প্রোগ্রামিং টোগ্রামিং বাদ দিয়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করছেন।

বিভিন্ন সময়ে গবেষকেরা বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বয়স এবং তাদের জীবনের সাফল্যমণ্ডিত স্বর্ণালি সময়গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এইচ. সি. লেহমান ১৯৫৩ সালেই তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছিলেন দুনিয়ার অধিকাংশ সফল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোই মূলত তরুণ বিজ্ঞানীরা করেছিলেন, বয়স্ক বিজ্ঞানীরা নয়[257]।

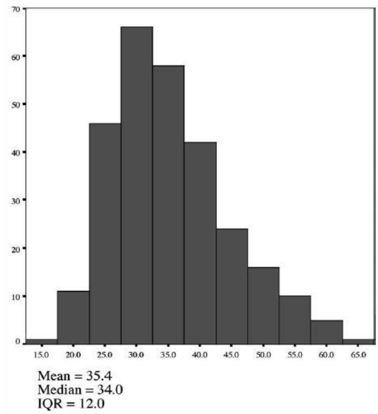


Fig. 1. The age of peak scientific achievement, 280 scientists.

চিত্র: সাতোশি কানাজাওয়া সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের জীবন নিয়ে গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই তাদের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায় যৌবনের

[256] W. Poundstone, Prisoner's dilemma. New York: Anchor, 1992, p 16.
[257] H. C. Lehman, Age and achievement. Princeton: Princeton University Press, 1953.

প্রারম্ভে, ত্রিশ বছরের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর তারপরে তা একেবারেই আনুভূমিক হয়ে যায়।

১৯৭৯ সালে এস. কোল[258] এবং ১৯৯১ সালে লেভিন এবং স্টিফেন তাদের গবেষণায় আলাদাভাবে দেখিয়েছেন যে, পিএইচডি করার সময় এবং তার পর-পরই বিজ্ঞানীদের উৎপাদন- শীলতা এবং কর্মমুখরতা হু-হু করে বাড়তে থাকে, আর তারপর থেকেই আবার তা লক্ষণীয়ভাবে কমে আসতে থাকে[259]। ২০০৩ সালে সাতোশি কানাজাওয়া ২৮০ জন প্রোথিতযশা সমসাময়িক বিজ্ঞানীর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখান যে, বয়স-অপরাধ রেখচিত্রের মতোই (আগের অংশে আলোচিত) প্রতিভার ক্ষেত্রেও বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছয় যৌবনের প্রারম্ভে, ত্রিশ বছরের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর তারপরে তা একেবারেই আনুভূমিক হয়ে যায়। তার গবেষণাপত্র থেকে পাওয়া ফলাফল নীচে রেখচিত্রের সাহায্যে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো—

অধ্যাপক কানাজাওয়া তার ফলাফল সম্পর্কে গবেষণাপত্রে বলেছেন এভাবে[260]

> Fig presents the distribution of the peak age among the 280 scientists in my sample. It is apparent from the histogram that scientific productivity indeed fades very rapidly with age. Nearly a quarter (23.6%) of all scientists makes their most significant contribution in their career during the five years around age 30. Two-thirds (65.0%) will have made their most significant contributions before their mid-thirties; 80% will have done so before their early forties.

বয়সের সাথে প্রতিভার প্যাটার্নটি শুধু বিজ্ঞানে নয়, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত কিংবা খেলাধুলার ক্ষেত্রগুলোতেও একই রকম পাওয়া গেছে। যদিও সাহিত্যের সাথে হার্ডকোর গণিত/ বিজ্ঞানের একটু পার্থক্য আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বহু

---

[258] S. Cole, Age and scientific performance. American Journal of Sociology, 84, 958–977, 1979.

[259] S. G. Levin, & , P. E. Stephan, Research productivity over the life cycle: Evidence for academic scientists. American Economic Review, 81, 114–132, 1991.

[260] Satoshi Kanazawa, Why productivity fades with age: The crime–genius connection, Journal of Research in Personality 37, 257–272, 2003

সাহিত্যিকদেরই প্রতিভার চূড়া স্পর্শ করে মধ্যবয়সে এসে (৪০ থেকে ৫০ বছর বয়েসের মধ্যে) এবং অধিকাংশ সাহিত্যিকেরাই অল্প বয়সে ফুরিয়ে যান না, বরং বহুদিন ধরে সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন[261]। রবীন্দ্রনাথ তার বার্ধক্যে এসেও অবলীলায় কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস লিখেছেন তরুণ-সাহিত্যিকদের সাথে পাল্লা দিয়ে। শওকত ওসমান, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমানসহ অনেকেই থাকবেন উদাহরণে। পাশ্চাত্যেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। মার্ক টোয়েন কিংবা আলফ্রেড হিচককের মতো সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীরা জীবনের প্রান্তসীমাতে এসেও আমাদের জন্য অসাধারণ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন। অবশ্য বিপরীত উদাহরণও খুঁজলে পাওয়া যাবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র ২১ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণের আগেই তার সমস্ত ক্ষুরধার কবিতাগুলো লিখে ফেলেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী কবিতাটি লেখেন তার মাত্র ২৩ বছর বয়সে। আসলে নজরুলের সকল সাহিত্যকর্মই তরুণ বয়সের প্রতিভার বিচ্ছুরণ। ১৯৪২ সালে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হবার পরে পরবর্তী দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কোনো সাহিত্যচর্চা করতে পারেননি, বরং একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন, এবং সেভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিমেও এ ধরনের উদাহরণ আছে। প্রথম জীবনে অত্যন্ত সফল সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রতিভার স্ফুরণ আর সেভাবে দেখা যায়নি। এমনি একজন আমেরিকান সাহিত্যিক ছিলেন জে. ডি. স্যালিঙ্গার (J. D. Salinger), যিনি তরুণ বয়সে The Catcher in the Rye উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ তিন দশক ধরে আক্ষরিক অর্থে কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে ফলাফল যা-ই পাওয়া যাক না কেন, গড়পড়তা রেখচিত্রের আকার এবং ট্রেন্ড মোটামুটি একইরকম

---

[261] গবেষক ডেভিড গ্যালেনসনের মতে পদার্থবিজ্ঞান এবং গনিতের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে যারা গবেষনা করেন তারা মুলতঃ 'কনসেপচুয়াল ইনোভেটর' (Conceptual innovators), আর শিল্প সাহিত্য নিয়ে সৃষ্টির খেলা যারা খেলেন তারা 'এক্সপেরিমেন্টাল ইনোভেটর' (experimental innovators)। তিনি তার গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, 'কনসেপচুয়াল ইনোভেটর'রা তাদের জীবনের প্রাথমিক সময়ে বা তরুণ বয়সেই সবচেয়ে বেশি প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটান, আর অপরদিকে 'এক্সপেরিমেন্টাল ইনোভেটর'রা ঘটান জীবনের মধ্যবয়সে বা শেষদিকে।

পাওয়া গেছে। সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর এবং সাহিত্যিকদের বয়স-প্রতিভার তুলনামুলক রেখচিত্র নীচে দেওয়া হলো—

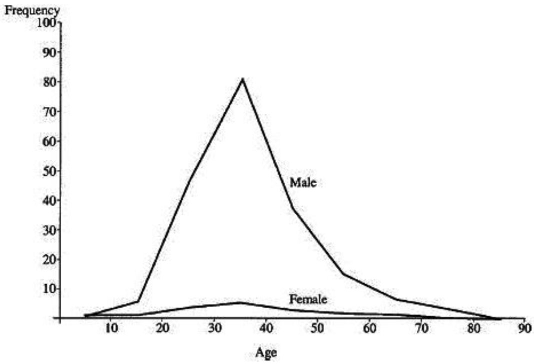


Fig. 2. The age–genius curve among jazz musicians. *Source*: Miller (1999).

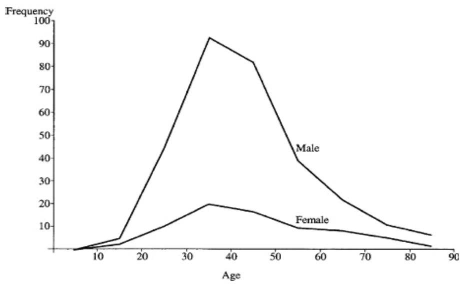


Fig. 3. The age–genius curve among painters. *Source*: Miller (1999).

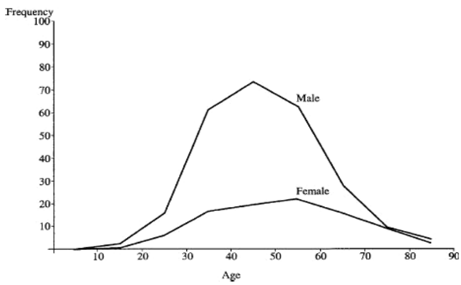


Fig. 4. The age–genius curve among authors. *Source*: Miller (1999).

চিত্র: সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর এবং সাহিত্যিকদের বয়স-প্রতিভার তুলনামূলক রেখচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তারা প্রায় একই ধরনের প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

উপরের রেখচিত্রগুলো নিয়ে খুব বেশি জটিল আলোচনায় না ঢুকেও কেবল সাদা চোখেই বলে দেয়া যায় যে, বয়স-অপরাধ রেখচিত্রের (age-crime curve) সাথে বয়স-প্রতিভা রেখচিত্রের (age-genius curve) অদ্ভুত ধরনের মিল পাওয়া যাচ্ছে। দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা যায় মূলত বয়ঃসন্ধির পর থেকেই গড়পড়তা এ বৈশিষ্ট্যগুলোর স্ফুরণ ঘটতে থাকে, শীর্ষে পৌঁছয় যৌবনের প্রারম্ভে, আর মধ্যবয়সের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। হয়তো সাধারণ পাঠকদের কাছে পুরো ব্যাপারটি কাকতালীয় মনে হতে পারে, কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন জৈববৈজ্ঞানিক কারণেই এদের মধ্যে একটা অলিখিত সম্পর্ক থেকে যায়।

আমরা আগের আলোচনা থেকে কিছুটা আলামত পেয়েছি যে, বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টির সময় থেকেই সবার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, তারা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, কারো কারো মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, কারো বা মধ্যে প্রতিভা। জৈবিকভাবে চিন্তা করলে, বয়ঃসন্ধির আগে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কোনো প্রজননগত উপযোগিতা নেই। কারণ সেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে প্রজননগত সফলতায় স্থানান্তরিত করা সেই সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল স্পর্শ করার সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক অভিব্যক্তিগুলো যেন ধাবমান অশ্বের মতোই দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। যখন থেকে দেহ সর্বপোরি প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে তখন থেকেই প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র (সেটা সহিংসতাই হোক, অথবা হোক বিশেষ দিকে প্রতিভাময় দীপ্তি) স্ফুরিত হতে থাকে তীব্র বেগে। মধ্যবয়সের পর সেই আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে আসে জৈবিক নিয়মেই। অর্থাৎ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী[262]—

> অপরাধপ্রবণতা আর মেধা দুটোই আসলে তারুণ্যের প্রতিযোগিতামুলক অভিব্যক্তির ফসল, আদিম শিকারি-সংগ্রাহক পরিস্থিতিতে যার চূড়ান্ত নিয়ামক ছিল প্রজননগত সাফল্য। এই ধারার প্রভাব আজকের সমাজেও একটু চেষ্টা করলেই লক্ষ করা

[262] Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008

যাবে। মারামারি কাটাকাটি এবং সহিংসতায় কম পরিমাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বরং বহু পুরুষ তার উদ্দীপনাকে কাজে লাগায় প্রতিভার নান্দনিক (কেউ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কেউ সংগীত সাধনা, কেউ খেলাধুলা, কেউ শিল্প সাহিত্যসৃষ্টি, কেউবা অর্থোপার্জন) বিকাশে। আসলে এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে সে নিশ্চিত করে অধিক নারীর দৃষ্টি, এবং সময় সময় তাদের অর্জন এবং প্রাপ্তি।

প্রতিভা ব্যাপারটাকে কেবল সঙ্গমী মননের অভিব্যক্তি ভাবতে হয়তো অনেকেরই মন সায় দেবে না। কিন্তু আমরা আগের অংশের আলোচনায় দেখেছি যে, অর্থ-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতায় বলীয়ান পুরুষেরাই বেশি পরকীয়ায় আসক্ত হন। আমরা দেখেছি যে, কেতাদুরস্ত কাপড়চোপড়, দামি গাড়ি, বাড়ি, ঘড়ি এমনকি কথাবার্তা, চালচলন, স্মার্টনেস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি সবকিছুকেই পুরুষেরা ব্যবহার করে নারীকে আকর্ষণের কাজে। তাহলে প্রতিভাই বা তালিকা থেকে বাদ যাবে কেন? নিজের প্রতিভাকে কীভাবে নারীদের আকর্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ বিজ্ঞানী সম্রাট আলবার্ট আইনস্টাইন। প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী শুধু বিজ্ঞানের জগতেই অসাধারণ ছিলেন না, নারীলিপ্সায়ও ছিলেন অনন্যসাধারণ। মেরী, মিলেইভা, এলসা, আইলস্, বেটি নিউম্যান, মার্গারেট লেনবাখ, টনি মেন্ডেল, হেলেন ডুকাস—কত নারী যে এসেছে তার জীবনে, কোনো ইয়ত্তা নেই। একবার আবার একই সাথে প্রেম করেছেন মা (এলসা) এবং মেয়ের (আইলস) সাথে একই সময়ে, এমন উদাহরণও আছে। আইনস্টাইনের প্রেমময় জীবন নিয়ে ড. প্রদীপ দেব একবার একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন মুক্তমনায় ‘প্রেমিক আইনস্টাইন’ শিরোনামে[263]। সেই প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন কীভাবে নিজের প্রতিভা, যশ এবং খ্যাতিকে আইনস্টাইন প্রতিটি ক্ষণে ব্যবহার করেছেন নারীদের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে।

---

[263] প্রদীপ দেব, প্রেমিক আইনস্টাইন, মুক্তমনা



চিত্র: আইনস্টাইন, শ্রোডিংগার কিংবা টাইগার উডসসহ বহু প্রতিভাধরদের জীবন পর্যলোচনা করলেই দেখা যাবে, তারা তাদের স্বীয় প্রতিভার মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন একাধিক নারীর সঙ্গ এবং সান্নিধ্য।

একাধিক নারীপ্রীতির ব্যাপারটা শুধু আইনস্টাইনের একচেটিয়া ছিল ভাবলে ভুল হবে। বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাই নিজের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন নারীসঙ্গ কামনায়, কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে—অনেক সময় নারীসঙ্গের মাধ্যমে। অরভিন শ্রোডিংগারের নাম আমরা প্রায় সবাই জানি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কেউ পড়ে থাকলে তিনি শ্রোডিংগারের সমীকরণ পড়েছেনই। শ্রোডিংগার গত হয়েছেন সেই কবে, কিন্তু ‘শ্রোডিংগারস ক্যাট’ জীবিত না মৃত—এতদিন বাদেও পদার্থবিজ্ঞানের জগতে দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, সেই নোবেল বিজয়ী শ্রোডিংগার তার জগদ্বিখ্যাত তরঙ্গ সমীকরণটি তৈরি করেছিলেন যখন তিনি তার এক রক্ষিতাকে নিয়ে নির্জনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। একটিমাত্র রক্ষিতা থাকলে তাও না হয় কথা ছিল, তিনি আবার পুরোটা সময়েই আরেক নারীর সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন, যিনি তার এক বন্ধু আর্থার মার্চের (Arthur March) স্ত্রী। আর এগুলোর বাইরে তার নিজের স্ত্রী তো ছিলই।

বিজ্ঞানীদের বাইরে প্রতিভাধর কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, আর খেলোয়াড়দের মধ্যে নারীলিপ্সার ব্যাপারটা এতটাই প্রকাশ্য যে এটা নিয়ে আলদা করে কিছু লেখার কোনো মানে হয় না। তারপরেও কিছু মজার ব্যাপার উল্লেখ করতেই হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী

পাবলো পিকাসোর কথা আমরা সবাই জানি। তিনি তার কর্মবহুল জীবনে ১৪৭,৮০০টির মতো নান্দনিক চিত্রকলা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সংখ্যায় এবং সৌকর্যে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন তার সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের। সংখ্যার ব্যাপারটিই এখানে মুখ্য নয়, যেটা সবচেয়ে গণ্য হিসেবে পিকাসোর ক্ষেত্রে উঠে এসেছিল তা হলো—তিনি কেবল একই ধরনের ছবি একঘেয়েভাবে এঁকে যাননি। সবসময়ই ছবি নিয়ে পুরনো প্রথা ভেঙে নতুন ধারা এবং রীতি তৈরি করেছেন নিজস্ব আমেজে। পিকাসোর জীবনের নীল যুগ, গোলাপী যুগ, কিউবিস্ট যুগ, সারেলিস্ট যুগ—প্রভৃতি যুগস্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান হয়ে আছে। সেটা থাকুক—তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা পিকাসোর কর্মময় জীবন আর চিত্রকল্পের ধারাগুলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক একটি ব্যাপার লক্ষ করলেন—তার প্রতিটি সৃজনশীল যুগ তৈরি হয়েছিল একেকজন নতুন রক্ষিতাকে ঘিরে[264]। বলাবাহুল্য পিকাসো এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু নন। মোজার্ট, লুইস ক্যারল, রুশো, দালি, ফিটজেরাল্ড, জেমস জয়েস, নীটসে, দান্তে প্রমুখ প্রতিভাধরদের জীবনের সাথে নারীসঙ্গ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকের বিরুদ্ধে আছে বিকৃত যৌনরুচির অভিযোগও। সেগুলোতে না হয় নাইবা গেলাম এখানে। আর খেলোয়াড়দের মধ্যে? এই তো কিছুদিন আগেই (ফেব্রুয়ারি, ২০১০) প্রতিভাধর গলফ খেলোয়াড় ‘বিবাহিত’ টাইগার উডসের প্রায় একডজন ‘পরনারীর’ সাথে যৌন সম্পর্ক থাকার কেলেঙ্কারি নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। এর আগে বিখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়ার ম্যাজিক জনসন সারা জীবনে ১০০০ জন নারীকে তার বিছানায় নিতে পেরেছেন—এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে পত্রপত্রিকার শিরোনাম হয়েছিলেন। প্রকাশ্যে এসব কিছু থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে, খ্যাতিমানদের প্রতিভা, অপরাধীদের সহিংসতা এবং তাদের প্রজননগত চাহিদা বা সাফল্য এ সবকিছুই হয়তো আসলে একসূত্রে বাঁধা।

[264] Douglas T. Kenrick, Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature, Basic Books, 2011

এই অধ্যায়ের উপরের দিকের একটি অংশে (কেন ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বেশি পরকীয়ায় আসক্ত হয়?) যে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে সেই সতর্কবাণী কিন্তু এখানেও প্রযোজ্য। উপরের আলোচনা থেকে কেউ যদি ধরে নেন, প্রতিভাধর হলেই সবাই স্ত্রীকে ফেলে পরকীয়ায় কিংবা পরনারীতে আসক্ত হবেন কিংবা নারীলোলুপ হয়ে যাবেন, তা কিন্তু ভুল হবে। বহু প্রতিভাধরেরাই কিন্তু নারীলোলুপ নন। প্রতিভা নারীলিপ্সার কারণ নয়, বড়জোর বলা যায় কারো কারো ক্ষেত্রে একটা অচেতন বৈবর্তনিক কৌশল। জিওফ্রি মিলার, ম্যাট রিডলী, সাতোসি কানাজাওয়া সহ অনেক বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীই প্রতিভা, চৌকষতা, বুদ্ধিমত্তা—এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে যৌনতার নির্বাচন বা সেক্সুয়াল সিলেকশনের ফল বলে রায় দিয়েছেন। প্রতিভার উদ্ভব আর বিকাশে যৌনতার নির্বাচন ব্যাপারটা কাজ করে থাকলে বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত হবার ব্যাপারটিও অবধারিতভাবেই বিবর্তনের ইতিহাসে কাজ করেছিল। আদিম সমাজে হয়তো প্রতিভার নির্বাচন কাজ করত খুব ছোট স্কেলে। যে ব্যক্তি তার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে নিখুঁত এবং ধারালো অস্ত্র বানাতে পেরেছিল এবং গোত্রকে দিয়েছিল অধিক শিকার এবং মাংসের নিশ্চয়তা, তারা হয়ে উঠেছিল গোত্রের হার্টথ্রব। এ ধরনের প্রতিভাধর আদিম প্রকৌশলীরা নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল অধিক মাত্রায়। ফলে তারা শয্যাসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। একইভাবে পুরুষেরাও নারীদের বিভিন্ন প্রতিভাকে নির্বাচিত করেছিল, করেছিল বুদ্ধিমত্তা, স্মার্টনেস এবং সর্বোপরি সৌন্দর্যকেও। সেজন্যই নারীরা আজও সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন থাকে (বিলিয়ন ডলারের কসমেটিক্স ইন্ডাস্ট্রি মূলত এই চাহিদাকে মূল্য দিয়েই টিকে আছে), কারণ পুরুষেরা সুন্দরী নারীর প্রতি লালায়িত হয়।

তবে আধুনিক সমাজে প্রতিভার সমীকরণটা অনেক জটিল হয়ে গেছে। এটা ঠিক প্রতিভাধরদের পুরুষদের প্রতিভা কেবল নারীদের আকর্ষণের জন্য—এটা ঢালাওভাবে বলা ঠিক নয়, কিংবা আরও ভালোভাবে বললে ‘পলিটিকালি কারেক্ট’ নয়, কিন্তু

বিবর্তনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ‘দৃষ্টি আকর্ষণের’ ব্যাপারটা একেবারে ফেলে দেয়া যাবে না। আর অনেক প্রতিভাধর পুরুষেরা যে নিজেদের প্রতিভাকে নারীলিপ্সার কাজে ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন, সেটা আমার এ লেখার উদাহরণগুলোতেই বোধ করি স্পষ্ট করা হয়েছে। শক্তিমত্তার পাশাপাশি আজ পুরুষদের বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা দিয়ে নারীরা আকৃষ্ট হন, (এটা বৈবর্তনিক প্রবৃত্তির কারণেই অনেক সময় ঘটে, ব্যক্তিবিশেষের সচেতন ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপারটি এখানে মুখ্য নয়), যার কারণে বহু নারীই প্রতিভাবানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হবার পরে তা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনার উপরেই থেকে যায় অবশ্য। এর একটি চমৎকার উদাহরণ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর প্রতিভাময় জীবন। দুরারোগ্য মোটর নিউরোন রোগে আক্রান্ত এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর কেবল মস্তিষ্কইটাই কর্মক্ষম এবং তিনি ডান হাতের দু আঙুল ছাড়া আর কিছু নাড়াতে পারেন না, তারপরেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই বিজ্ঞানী স্বীয় প্রতিভায় আকর্ষণ করতে পেরেছেন একাধিক নারীকে, এবং বর্তমানে তৃতীয় স্ত্রীর সাথে সুখী জীবনযাপন করছেন।

আরেকটি ব্যাপারও পরিষ্কার করা প্রয়োজন। উপরের আলোচনা থেকে কেউ যদি ধরে নেন, প্রতিভা কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়া, সেটাও ভুল একটি উপসংহারে পৌঁছানো হবে। প্রতিভা শুধু ছেলেদেরই থাকে না, থাকে মেয়েদেরও। আর মেয়েদের প্রতিভার ব্যাপারটাও কিন্তু একইভাবে যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়েছিল, এবং হয়েছিল একইভাবে পুরুষদের জৈবিক চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে। তবে কিছু ক্ষেত্রে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা প্রতিভার বিকাশে নারী পুরুষে। বহু প্রতিভাধর পুরুষের প্রতিভা যেমন স্বতঃস্ফুর্তভাবে নারী সঙ্গ পেয়ে বিকশিত হয়েছিল, নারীদের ক্ষেত্রে প্যাটার্নটি ঠিক সেরকম নয়। নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিভাময় মুহূর্তের সূচনা ঘটে যখন সে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে জড়ায় বা জড়ানোর আভাস পায়[265]। বিখ্যাত কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর কথা বলা যায় এ প্রসঙ্গে।

[265] Douglas Kenrick, Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature, Basic Books , 2011

গবেষকেরা বলেন, তার প্রতিভার দীপ্তি শিখর স্পর্শ করেছিল যখন তিনি রবার্ট ব্রাউনিং এর কাছ থেকে প্রেমের সাড়া পেয়েছিলেন, এবং দীর্ঘমেয়াদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে যাচ্ছিলেন। 'পর্তুগিজের সনেট', যাকে সমালোচকেরা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনোনীত করেছেন, সে সময়েরই লেখা! অবশ্য চেষ্টা করলে যে এই ধারার ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না যে তা নয়। তসলিমা নাসরিনের কথাই ধরা যেতে পারে। তসলিমা তার যৌবনে বহু পুরুষের সান্নিধ্যেই এসেছেন, আর দশটা মেয়ের তুলনায় অনেক বেপরোয়া জীবন অতিবাহিত করেছেন, ঠিক সেসময়ই তার কলম থেকে বেরিয়েছিল ক্ষুরধার লেখনীগুলো—পত্রিকার কলাম, গল্প, উপন্যাস আর কবিতা। তার মানে এই নয় যে, মেয়েরা কেবল শান্ত, সুন্দর এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে থাকলেই কেবল ভালো লিখতে পারে। SÅvবিক্ষুব্ধ সময়েও দুর্দান্ত লেখা বেরিয়ে আসে, নারী পুরুষ সবারই। যদিও তসলিমাকে নিয়ে গবেষণারত কোনো গবেষক আমাদের দেখিয়ে বলতেই পারেন, তার অনিন্দ্যসুন্দর এবং কালজয়ী কবিতাগুলোর বেশিরভাগই তসলিমা লিখেছিলেন, যখন তিনি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে দীর্ঘমেয়াদি রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন, তা সেই সম্পর্কে যতই টানাপোড়েনের আলামত থাকুক না কেন।

পোলার বিয়া দাও –মাথা ঠান্ডা হইবো

আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের এলাকার ঘাড়ত্যাড়া আর রগচটা ছেলেপিলেদের দিকে দেখিয়ে বলতে শুনেছি—'তরুণ বয়স তো, তাই ছেলের রক্ত গরম। দেখবেন বয়স হলে রক্তও ঠান্ডা হয়ে আসবে'। বয়োজ্যেষ্ঠদের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে এই অধ্যায়ের 'বয়সের দোষ' অংশে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি আরেকটি কথাও বাংলাদেশে খুব শোনা যায়। বিশেষ করে উড়নচণ্ডি ছেলের উন্মাদনা যখন অসহীয় পর্যায়ে চলে যায়, তখন প্রায়ই অন্য অভিভাবকেরা ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতাকে উপদেশ দেন—'পোলার বিয়া দিয়া দাও, মাথা ঠান্ডা হইবো'। সব ক্ষেত্রে যে উপদেশ কাজ করে তা নয়, বরং অনেক সময় অযাচিতভাবে আরেকটি নিরীহ মেয়ের

জীবন নষ্ট করা হয়। গ্রামের দিকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ‘পাগল চিকিৎসার’ দাওয়াই হিসেবে পাগলের বিয়ে দেয়াটা খুবই জনপ্রিয়। ছোটবেলায় শুনেছিলাম, আমাদের গ্রামের 'দীনু পাগলা' নামে বদ্ধ উন্মাদকে একবার জোর করে মমতাজ বেগমের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপর দেখা গেল পাগলামি তো কমেইনি, বরং বউয়ের জীবনও দীনু পাগলা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শেষমেষ শুনেছিলাম দীনুকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে নাকি ‘পাগলের বউ’ মমতাজ বেগম কাজের সন্ধানে বের হতো।

কিন্তু কথা হচ্ছে মেয়ের জীবন নষ্ট করা সংক্রান্ত এই ক্ষতিকর ব্যাপারগুলো জানা সত্ত্বেও কেন অভিভাবকেরা অনেক সময়ই ছেলের পাগলামি সারানোর জন্য বিয়ের দাওয়াই বাতলে দেন? কারণ হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে তারা লক্ষ করেছেন আসলেই বিয়ে দিলে ছেলের ‘মাথা ঠান্ডা হয়’ (অবশ্য দীনু পাগলার মতো বদ্ধ উন্মাদ—যাদের পাগলা গারদে রেখে চিকিৎসা প্রয়োজন, তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না)! একটি উদাহরণ দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। মুক্তমনায় জাহেদ আহমদ নামে আমাদের এক বন্ধু লেখালিখি করতেন, শুধু লেখালিখি নয়—এক সময় আমাদের সাইটে ছিলেন খুবই সক্রিয়, মুক্তচিন্তা এবং মানবতার প্রসারে ছিলেন অন্তপ্রাণ। গত বছর জোর করে বড়ভাই তার ‘পাগলামি সারানোর’ জন্য বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর থেকেই জাহেদ দেখি উধাও! ঘর সংসার করে নিপাট ভালো মানুষ হয়ে গেছেন। হয়েছেন স্ত্রীর অনুগত আদর্শ স্বামী। চাকরি-বাকরি, ঘর সংসার, সপ্তাহান্তে বউকে নিয়ে মল-এ ঘরাঘুরি, কিংবা নির্জনে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা। মুক্তচিন্তা আর মানবতাভিত্তিক সমাজ গড়ার ‘পাগলামি’ মাথা থেকে বিদায় হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

আসলে বিয়ের পরে ‘জাহিদ পাগলা’র মতো কারো কারো মাথা ঠান্ডা হবার ব্যাপারটি কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আগেই আভাস দেয়া হয়েছে যে, পুরুষেরা তাদের অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, প্রতিভাসহ অনেক কিছুই বিনিয়োগ করে মূলত নারীকে আকর্ষণের কাজে। পুরুষদের

অপরাধপ্রবণতা কিংবা তাদের পাগলামিকেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিয়ের পরে পুরুষেরা আগের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয় না। এমনকি দাগি অপরাধীদেরও অপ্রাধপ্রবণতা কমে আসে বিয়ের পরে, বহুক্ষেত্রে অপরাধজগৎ থেকে অবসর নেয় বহু অপরাধী[266]। এর কারণ হচ্ছে, বিয়ের পর নারীকে আকর্ষণের সেই প্রবৃত্তিগত তাড়না সে আর সেভাবে অনুভব করে না, স্বাভাবিকভাবেই এধরনের চাহিদা অনেক কমে আসে। বিবাহিত পুরুষদের অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ একেবারে বাদই দিয়ে দেয়; ফলে প্রতিভার স্ফুরণ হোক, অপরাধ প্রবণতা হোক, কিংবা হোক কোনো নির্দোষ পাগলামি—সবই কমে আসে। সেটাকেই বোধ হয় সাধারণ চোখে 'পাগলা মাথা'কে 'ঠান্ডা করে' বলে ধরে নেওয়া হয়। আমেরিকায় গাড়ির ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বেশ কিছু জরিপে দেখা গেছে যে, বিবাহিত চালকেরা অবিবাহিত চালকদের চেয়ে অনেক কম দুর্ঘটনায় পতিত হয়। বলাই বাহুল্য, বিবাহিত ড্রাইভাররা অবিবাহিতদের চেয়ে অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং আগ্রাসী ড্রাইভিং করে বলেই তারা তুলনামূলকভাবে কম দুর্ঘটনার শিকার হয়।

পুরুষদের প্রতিভার জ্যোতি কি বিয়ের পরে কমে আসে?

নচিকেতার একটা গান আছে—

> জনতা জনার্দন শুনে হবেন বড় প্রীত
> পুরুষ মানুষ দু'প্রকারের, জীবিত ও বিবাহিত।
> পুরুষ মানুষ বেঁচে থাকে বিয়ে করার আগে গো
> বিবাহিত পুরুষ মানে প্রকারন্তরেতে মৃত—
> পুরুষ মানুষ দু'প্রকার, জীবিত ও বিবাহিত। ...

বিবাহিত মানে যে প্রকারান্তরে মৃত—উপরে আমাদের বন্ধু জাহেদের ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাহেদ বিয়ের পর লেখালিখি একদমই ছেড়ে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে ঘোর

---

[266] Criminologists have long known that criminals tend to "settle down" and desist (stop committing crime) once they get married, while unmarried criminals continue their criminal careers.

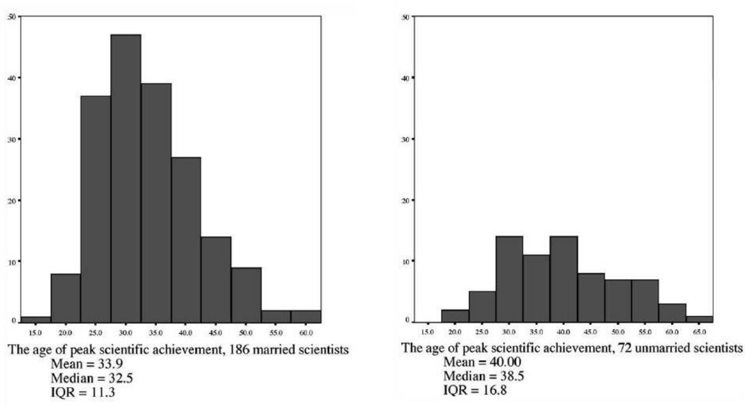
সংসারী। লেখক লেখা ছেড়ে দিলে তো এক অর্থে প্রতিভার সমাপ্তি, আর সমাপ্তি মানেই প্রকারান্তরে মৃত, কী বলেন! তবে সবাই যে বিয়ে করে জাহেদের মতো মৃত হয় তা নয় অবশ্য, আমার মতো 'অর্ধমৃত' হয়েও বেঁচে থাকে অনেকে!

আসলে যে কারণে বিয়ের পর 'পাগল-ছাগলদের মাথা ঠান্ডা হয়', ঠিক একই কারণে প্রতিভার স্ফুরণও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এটাকে হালকা কথা বলে উড়িয়ে দিলে কিন্তু ভুল হবে। আমরা আগের একটি অংশে বিজ্ঞানীদের *বয়স-প্রতিভা* রেখচিত্রের (age-genius curve) সাথে পরিচিত হয়েছি। আমরা সেখানে দেখেছি যে, যৌবনের পরে বয়সের সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের প্রতিভা প্রদর্শনের হার কমতে থাকে। তবে একটি জায়গায় একটু ব্যতিক্রম পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী যদি অবিবাহিত হন, তবে তার প্রতিভা বয়সের সাথে সাথে অন্য সবার মতোই সামান্য কমে আসলেও তা লোপ পায় না, বরং প্রতিভার ঝিলিক কম বেশি বিচ্ছুরিত হতে থাকে পুরো জীবনকাল জুড়েই। উদাহরণ চান? হাতের সামনেই একটা বিখ্যাত উদাহরণ আছে—স্যার আইজ্যাক নিউটন। চিরকুমার এই বিজ্ঞানীকে নিয়ে আমরা আগেও দু'চারটি কথা বলেছি।

তার সফল এবং বিখ্যাত আবিষ্কারগুলো তরুণ বয়সেই (চব্বিশ বছরের মধ্যেই) করে ফেললেও এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তার প্রতিভা কিন্তু লোপ পায়নি। ত্রিশ বছর বয়সে রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন, ৪৪ বছর বয়েসের সময় তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের জন্য রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন (সেখানেই তিনি মাধ্যাকর্ষণ সূত্র এবং তিনটি গতিসূত্রের ব্যাখ্যা প্রথমবারের মতো হাজির করেছিলেন), ৬২ বছর বয়সে প্রকাশ করেন অপটিক্স। অপ্টিক্সের তৃতীয় সংস্করণ নিউটন প্রকাশ করেছিলেন ৮৪ বছর বয়সে, মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে। পঁচাশি বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো জীবনকাল জুড়েই নিউটন কর্মক্ষম ছিলেন—গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, এমনকি জীববিজ্ঞানসহ এমন কোনো শাখা নেই নিউটনের পাদস্পর্শে ধন্য হয়নি। নিউটন যে এত কর্মক্ষম একটা সময়

অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন-এর একটা কারণ অনেকেই মনে করেন—তিনি অবিবাহিত ছিলেন; ফলে ‘প্রকারান্তরে মৃত’ হবার হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

ব্যাপারটি কিন্তু কেবল নিউটনের ক্ষেত্রেই সত্য বলে ভাবলে ভুল হবে। গবেষকেরা দেখেছেন যে, অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ (৫০%) ক্ষেত্রে অবিবাহিত বিজ্ঞানীরা তাদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলো যেমন জীবনের প্রাথমিক সময়ে (বিশ বছর বয়সের দিকে) করেন, ঠিক তেমনি পুনর্বার সেরকম কিছু করে দেখাতে পারেন যখন বয়স পঞ্চাশ পেরোয়, কিন্তু বিবাহিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে ধরনের সফলতার হার শতকরা মাত্র ৪.২ ভাগ[267]। নীচে গবেষণাপত্র থেকে বিবাহিত এবং অবিবাহিত বিজ্ঞানীদের সফলতার একটা তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো—



চিত্র- বিবাহিত এবং অবিবাহিত বিজ্ঞানীদের প্রতিভা স্ফুরনের তুলনামূলক রেখচিত্র।

গ্রাফগুলোর ট্রেন্ড দেখলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বিবাহিত বিজ্ঞানীরা আসলে ‘প্রকারান্তরে মৃত’!

[267] Satoshi Kanazawa, Why productivity fades with age: The crime–genius connection, Journal of Research in Personality 37, 257–272, 2003

অবশ্য এ ধরনের ট্রেন্ডের ফলাফল যাই হোক এর কারণ নিয়ে বিতর্ক করার সুযোগ আছে পুরোমাত্রায়। 'কমন সেন্স' থেকেই বোঝা যায় যে, পেশার বাইরেও বিবাহিত বিজ্ঞানীদের বড় একটা সময় সংসার, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ-করাসহ আনুষঙ্গিক পার্থিব কাজে ব্যয় করতে হয়। আর আধুনিক বিশ্বে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও কিন্তু নিজস্ব ক্যারিয়ার থাকে। ফলে গৃহস্থালির কাজগুলো প্রায়শই স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি করে নিতে হয়; আর এগুলো করতে গিয়ে তাদের একাডেমিক গবেষণার সময় কমে আসে। অবিবাহিত বিজ্ঞানীরা যেহেতু পুরোটা সময় এসমস্ত ঝুটঝামেলা থেকে মুক্ত থাকেন সেহেতু তারা গবেষণায় প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ এবং সময় পান বেশি। কাজেই প্রতিভা লোপের ব্যাপারটা কতটা জৈবিক আর কতটা সামাজিক—তা নিয়ে সন্দেহ কিংবা বিতর্ক করার যথেষ্টই অবকাশ আছে। তারপরেও বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত কিছু গবেষক দেখিয়েছেন যে, সত্তুরের দশকে কিংবা তার আগে মেয়েদের খুব একটা 'নিজস্ব ক্যারিয়ার' ছিল না। সে সময় গৃহস্থালির কাজগুলো মূলত মেয়েরাই করত। ফলে বিবাহিত পুরুষ বিজ্ঞানীদের তেমন একটা বাচ্চাকাচ্চা ঘর-সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। কিন্তু তারপরেও বিবাহিত বিজ্ঞানীদের প্রতিভার স্ফুরণে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পাওয়া যায়নি। ভিক্টোরীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হোক, আর আধুনিক জেন্ডার সচেতন সমাজ হোক, ট্রেন্ড একটাই—বিয়ের পর একইভাবে প্রতিভার স্ফুরণ কমে আসে প্রায় একই ধারায়।

কেন বুড়োভামদের মধ্যে স্ত্রী হত্যার প্রকোপ বেশি?

আমরা আগের কিছু অধায়ের আলোচনা থেকে জেনেছি যে, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অনুকল্প অনুযায়ী যৌনতা সংক্রান্ত হিংসা কিংবা ঈর্ষার ব্যাপারটি আসলে জৈবিকভাবে পুরুষদের মধ্যে অঙ্কুরিত। এর পেছনের কারণটি নিয়ে বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে (সখি, ভালোবাসা কারে কয়?) কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানেও সঙ্গত কারণে কিছুটা পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে। আমরা জানি যে, পুরুষেরা কেবল সঙ্গম করেই খালাস, আর ওদিকে গর্ভধারণ এবং বাচ্চা প্রসবের পুরো প্রক্রিয়াটা নারীদের

নিজেদের মধ্যেই ধারণ করতে হয়, পুরুষদের কোনো ভূমিকা থাকে না। ফলে একটি সন্তান জন্মানোর পরে পুরুষরা নিজেদের পিতৃত্ব নিয়ে কখনোই 'পুরোপুরি' নিশ্চিত হতে পারে না (আধুনিক ডিএনএ টেস্ট আসার আগে সেটা প্রযুক্তিগতও সম্ভব ছিল না)। কিন্তু একজন মাকে যেহেতু গর্ভধারণ করতে হয় এবং শারীরিকভাবে বাচ্চার জন্ম দিতে হয়, প্রত্যেক মা-ই জানে যে সেই তার সন্তানের মা। অর্থাৎ, পিতৃত্বের ব্যাপারটা শতভাগ নিশ্চিত না হলেও মাতৃত্বের ব্যাপারটা নিশ্চিত। ফলে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো—পুরুষেরা মূলত 'সেক্সুয়ালি জেলাস' হিসেবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠেছে।

তরুণদের মধ্যে সহিংসতা এমনিতেই বেশি। সাদা চোখে মনে হতে পারে যে তারাই বেশি স্ত্রীদের উপর নির্যাতন করবে, কিংবা রাগের মাথায় স্ত্রীদের হত্যা করবে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই ভবিষ্যদ্বাণীর সপক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী মার্গো উইলসন অনেক আগেই অভিমত দিয়েছিলেন, তরুণদের মধ্যে সহিংসতা বেশি হলেও যৌনতার ঈর্ষার কারণে বয়স্ক ব্যক্তিদের ঢের বেশি তরুণী স্ত্রীদের হত্যা করার কথা। কারণ তরুণী স্ত্রীরা প্রজননগতভাবে অনেক বেশি আক্রমণ্য এবং অরক্ষিত থাকে। তারা তাদের স্বামীদের চেয়ে প্রজননগত দিক থেকে অনেক উর্বর, এবং তাদের পরকীয়ার সম্ভাবনাও থাকে বেশি। বয়োবৃদ্ধ স্বামীরাও সেটা খুব ভালো করেই জানে। তাই তারা থাকে স্ত্রীদের প্রতি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। তাদের এই শকুনাচরণ খুব সহজেই সহিংসতায় রূপ নিতে পারে কোনো ধরনের পরকীয়ার আলামত পেলে কিংবা এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক সন্দেহের বশে। এ নিয়ে পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেল সমাজবিজ্ঞানীরা নন, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী মার্গো উইলসনই সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। যেমন ক্যানাডায় গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, মধ্যবয়সি পুরুষেরা (৪৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সের পরিসীমায়) স্বামীরা যদি সদ্য তরুণী নারীকে (১৫ থেকে ২৫ বছরের পরিসীমায়) বিয়ে করে, তবে তাদের জন্য স্ত্রী হত্যার প্রকোপ তরুণ স্বামীদের তরুণী স্ত্রী (যারা উভয়েই ১৫ থেকে ২৫ বছরের পরিসীমায় রয়েছেন)

হত্যার চেয়ে *ছয়গুণ বেশি* পাওয়া গেছে[268]। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানকে যারা মিথ্যা প্রতিপাদনযোগ্য নয় কিংবা পরীক্ষণযোগ্য নয় বলে মনে করেন, তারা এ গবেষণাটির কথা স্মরণ রাখতে পারেন।

এই গবেষণার উপসংহার থেকে জানা যায়, যদিও একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক ব্যক্তি একজন পঁচিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তির চেয়ে কম সহিংস এবং কম অপরাধপ্রবণ (বয়স বনাম অপরাধপ্রবণতার রেখচিত্রটি স্মরণ করুন), কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সি ব্যক্তি যদি পঁচিশ বছর বয়স্ক নারীকে বিয়ে করেন, তার স্ত্রীকে প্রহার, নির্যাতন এবং হত্যার সম্ভাবনা একজন পঁচিশ বছর বয়সি স্বামীর চেয়ে (যার সমবয়সি স্ত্রী রয়েছে) বেশি। যৌনতার ঈর্ষা তাদের বেশি থাকার কারণেই এটি ঘটে বলে মনে করা হয়।

কেন সারা পৃথিবী জুড়ে জাতিবিদ্বেষ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার রয়েই যাচ্ছে?

সংখ্যালঘুরা সর্বত্রই সংখ্যালঘু। হিন্দুরা বাংলাদেশে যে যন্ত্রণায় থাকেন, ঠিক একই ধরনের যন্ত্রণা হয়তো একটি মুসলিমও ভোগ করেন অন্য কোনো রাষ্ট্রে। ৯/১১ এর ঘটনার পরে নির্বিচারে মুসলিমদের গায়ে সন্ত্রাসের ট্যাগ লাগিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে আমেরিকা সহ অনেক রাষ্ট্রেই। অনেক নিরপরাধীকেও জেল-জরিমানা খাটতে হয়েছে প্রমাণ ছাড়াই, কেবল সন্দেহের ফলশ্রুতিতে। বাংলাদেশেও সংখ্যালঘুদের উপর আগ্রাসন প্রবল। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বেছে বেছে হিন্দুবাড়িগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। পূর্ণিমা রানির মতো বহু কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার প্রথম ৯২ দিনের মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের ঘটনা, এবং পরবর্তী তিনমাসে প্রায় ১০০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ

268 M Wilson, M Daly, C Wright Uxoricide in Canada: demographic risk patterns. Canadian Journal of Criminology 35: 263-291, 1993

ছিল হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ২০০১ সালের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বাংলাদেশে ১৯৪১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের অব্যবহিত পরে তা শতকরা ২২ ভাগে এসে দাঁড়ায়। এরপর থেকেই সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় দেশটিতে ক্রমশ হিন্দুদের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৬১ সালে ১৮.৫% , ১৯৭৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সালে ১২.১%, এবং ১৯৯১ সালে ১০% এ এসে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে হিন্দুদের শতকরা হার কমে ৮ ভগের নীচে নেমে এসেছে বলে অনুমিত হয়।

শুধু হিন্দুদের ওপরেই নয়, বাঙালিরা আবার একজোট হয়ে চাকমা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রজাতিসত্তাগুলোর উপর আগ্রাসন এবং নিপীড়ন চালিয়েছে নিজ দেশে। স্বাধীনতার পরপরই আমাদের বাংলাদেশের স্থপতি শেখমুজিব পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'তোরা সব বাঙালি হইয়া যা'। যে দেশটি দীর্ঘ নয় মাসের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তুচ্ছ করে স্বাধীন হয়েছিল, তার নির্বাচিত প্রতিনধি, স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার মুজিব সেই একই পাকিস্তানি কায়দায় সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল তুলে দিলেন সংখ্যালঘু পাহাড়িদের উপর, অস্বীকার করলেন আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়টুকু। তার পরে জেনারেল জিয়া তার রাজত্বকালে পার্বত্য চটগ্রামে ৪ লাখ বাঙালিকে পুনর্বাসনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কিছু অংশকে খাগড়াছড়ি জেলা শহরের ৩ মাইল দক্ষিণে ভুয়াছড়ি মৌজায় একটি চাকমা গ্রামের পাশে বসান হয়েছিল । সেই থেকে শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি কায়দায় পাহাড়িদের সংস্কৃতির উপর বাঙালি আগ্রাসন। ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল গভীর রাতে সেই গ্রামের সেটেলার বলে কথিত উদ্বাস্তু বাঙালিরা সেনা ক্যাম্পের কিছু সেনা সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে পাশের চাকমা গ্রামে গিয়ে লুটপাট কর, এরপর করে অগ্নিসংযোগ। সেই একই বছর আগাস্ট মাসে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার মহালছড়ি বাজারের দোকানি এবং মহালছড়ি ইউনিয়নের উদ্বাস্তু বাঙালিরা আবারো আদিবাসিদের বাড়িঘরে লুটপাট চালায়, এরপর

বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৯টি গ্রামের ৩৫০টির ও অধিক বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মহালছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিনোদ বিহারী খীসা যিনি সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা ২টি বৌদ্ধ মন্দির পুড়িয়ে দেয়, ২টি বৌদ্ধ মন্দির তছনছ করে এবং মুল্যবান ধাতুর তৈরি ৪টি বুদ্ধ মূর্তি লুট করে নিয়ে যায়; মা-মেয়ে সহ ৮ জন মহিলা এবং একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে ধর্ষণ করে। এদের মধ্যে কয়েকজন গণধর্ষণের শিকার হয়। ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত খাগড়াছড়ি সদর থানার ২টি ইউনিয়নে এবং মহালছড়ি উপজেলার ২টি ইউনিয়নে মোট ১৪টি গ্রামের ১৩৩ ব্যক্তির এবং একটি স্কুলের ৩৯৯.২২ একর জমি সেটেলার বাঙালিরা ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। তাছাড়া রাঙামাটির বুড়িঘাটে ১০জন আদিবাসির ২৫ একর জমি সন্ত্রাসী বাঙালিরা দখল করে নিয়েছে। এগুলো পত্রিকাতেই এসেছে। তবে পত্রিকায় যা এসেছে তা মহাসমুদ্রের মাঝে এক দু-ফোঁটা জলবিন্দু ছাড়া কিছু নয়। হাজারো কান্না, কষ্ট আর হতাশ্বাসের কথা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। কেন এই জাতিসত্তার বিরোধ? কেন এই অন্তহীন সংঘাত?

সংখ্যালঘুত্ব, জাতিসত্তার সংঘাত প্রভৃতি নিয়ে তো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অনেক দেয়া হয়েছে। আমি এই বইয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মতামত দেয়ার প্রচেষ্টা নিব। এ ব্যাখ্যাগুলো এরকমভাবে আগে কোথাও দেয়া হয়নি। হয়তো পাঠকেরা কিছু নতুনত্ব খুঁজে পেতে পারেন।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী, আমরা জাতীয়তাবোধে কিংবা দেশপ্রেমে কিংবা জাতিগত ভাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হই খুব সহজ কারণে, এবং সেই কারণটি নিহিত আছে (রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির পাশাপাশি) জীববিজ্ঞানে। প্রতিটি মানুষ, যতই উদার হোক না কেন, খুব স্বার্থপরভাবেই প্রথমে নিজের সন্তান এবং পরিবারের (ছেলে মেয়ে, ভাই বোন, বউ, বাবা মা) মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারটা অবার আগে দেখে। এটা জানা কথাই। কারণ, জেনেটিকভাবে চিন্তা করলে তারাই

একটি মানুষের সবচেয়ে ‘আপন জন’, তাই সবচেয়ে কাছের জিনপুলকে সে রক্ষা করতে চায়, তারপরে একটু দূরের (যেমন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী) এবং এ ব্যাপারটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত। এগুলো আমাদের সমাজে হরহামেশাই দেখি। ঠিক আমরা যে কারণে সন্তান কিংবা পিতামাতা এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য জৈবিক তাড়না অনুভব করি, ঠিক একই কারণে স্বজাতিমোহেও উদ্বুদ্ধ হই। ‘স্বজাতি’ ব্যাপারটা আর কিছুই নয় আমাদের ‘এক্সটেন্ডেড জেনোটাইপের’ দ্বারা নির্ধারিত ‘এক্সটেন্ডেড পরিবার’ (extended family)। বিবর্তনের মূল কাজই হচ্ছে যত বেশি সংখ্যক প্রতিলিপি তৈরি করা আর ‘নিজস্ব’ জিনপুলকে রক্ষা করে চলা। কাজেই বিবর্তনে আমাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টাই ‘অধিক হারে’ উপযোগিতা পাবে, যেটি সদৃশ কিংবা কিংবা সমরূপ জিনকে রক্ষা করে চলবে। জোসেফ এম হুইটমেয়ার নামের এক বিজ্ঞানী এ নিয়ে গবেষণা করছিলেন বহুদিন ধরেই। তিনি বলেন, গাণিতিকভাবে এটি দেখানো যায় যে, একটি জিন সেই দিকেই ঝুঁকে পড়বে কিংবা টিকে থাকার উপযোগিতা দেখাবে যেখানে এটার বাহক, বা তার সন্তান সন্ততি কিংবা নাতিপুতির সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ কিংবা সম্ভাবনা থাকবে[269] । হুইটমেয়ারের যুক্তি হলো, এথনিক গ্রুপগুলো আসলে পরস্পরের সম্পর্কিত 'বর্ধিত পরিবার' (extended family) বই কিছু নয়, কারণ তাদের দূরবর্তী সদস্যদের মধ্যে ভবিষ্যতে সম্পর্কের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

ঠিক এই কারণেই সম্ভবত বাঙালি আমেরিকায় পাড়ি দিয়েও বাঙালি কমিউনিটি খুঁজে ফেরে, অফিসেও দেখা যায় ভারতীয়রা একসাথে নিজেরা লাঞ্চে যায়, চৈনিকেরাও তাদের স্বজাতি খুঁজে ফেরে। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, ‘বর্ধিত পরিবার’ হিসেবে বিবেচনা করে জিনপুল রক্ষার প্রচেষ্টা।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মানুষ আসলে জন্মগতভাবেই কিছু না কিছু সাম্প্রদায়িক বা রেসিস্ট মনোভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন শুনতে)।

---

[269] Whitmeyer Joseph M. 1997. “Endogamy as a Basis for Ethnic Behavior.” Sociological Theory 15 2: 162-178.

নিজের সম্প্রদায়কে সবার আগে ভালোবাসা মানুষের মজ্জাগত, তাই স্বভাবগতভাবেই কিছুটা হলেও সাম্প্রদায়িক বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে সামাজিকীকরণ, শিক্ষা, সুগুণের চর্চার মাধ্যমে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, তবে অনেকেই পারেন না সেটাও কিন্তু দেখি। অনেক সময় একভাবে সাম্প্রদায়িকতা অস্বীকার করলেও আবার ভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িকতার উদ্‌গীরণ ঘটে। কিছু উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই আছে। আমরা **১৯৭১** সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়েছিলাম রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে। আমরা অস্বীকার করতে পেরেছিলাম জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে। অনেকেই একাত্তুরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ফসল হিসেবে দেখেন। ভালো কথা। কিন্তু সেই 'অসাম্প্রদায়িক' আমরাই আবার দেশপ্রেমের মোহে উজ্জীবিত হয়ে চাকমাদের উদ্বাস্তু করেছি, গৃহহীন করেছি, তাদের গায়ে 'পাকিস্তানি কায়দায়' লেবাস লাগিয়েছি রাষ্ট্রদ্রোহিতার। পাকিস্তানি কায়দায় ধর্ষণ, অত্যাচার কোনো কিছুই বাদ দেইনি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া গেলেও জৈববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উহ্যই ছিল। এদিক থেকে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা খুব সহজ। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা সহজেই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি, একসাথে যুদ্ধ করতে পেরেছি কারণ আমরা বাঙালি জাতি নিজেদের একটি 'বর্ধিত পরিবার' বলে ভাবতে পেরেছি, আমরা বাঙালিরা জেনেটিকভাবে পাকিস্তানিদের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমরাই আবার চাকমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, কারণ চাকমারা আবার জেনেটিকভাবে আমাদের থেকে একটু দূরের। এই ক্ষেত্রে বর্ধিত পরিবার-এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া দেশপ্রেমই রূপ নিয়েছিল অন্ধ স্বজাতি মোহে, যা চাকমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রয়োগ করতে বাধেনি। এ ধরনের অনেক উদাহরণই দেয়া যায়, বইয়ের আকারের কথা মনে রেখে একটি উদাহরণেই আপাতত সীমাবদ্ধ রইলাম।

এখন কথা হচ্ছে, এই সংঘাত দূর করার উপায় কী? যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জাত্যাভিমানী প্রবণতা নিয়ে জন্মাই, এবং বড় হয়ে বিভিন্ন পরিবেশে

এবং সময়ে এর পরিস্ফুটন ঘটে, আমরা হয়তো কখনোই এ ধরনের সংঘাত পুরোপুরি দূর করতে পারবো না। কিন্তু পুরোপুরি দূর না করতে পারলেও কমিয়ে আনতে পারি, সেটা কিন্তু ঠিক। শিক্ষা, মানবিকতার চর্চা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি মানসজগৎ-কে ঋদ্ধ করতে পারে সেগুলো আমরা জানি। নিজের জগতে কূপমণ্ডূক হয়ে না পড়ে থেকে যদি আমরা ভিন্ন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি, নিজেদের মনের দুয়ার উদার করতে পারি—অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সাম্প্রদায়িকতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। তারপরেও ব্যাপারগুলো আরোপিত। জেনেটিক ব্যাপারটায় আসলে কোনো প্রভাব ফেলছে না সেভাবে। জেনেটিকভাবে তৈরি রেসিজম কমাতে হলে একভাবেই আমরা তা কমাতে পারি। জোসেফ এম হুইটমেয়ার-এর গাণিতিক মডেল বলছে—সমাধান হচ্ছে 'ক্রস কালচারাল ইন্টারম্যারেজ' বা বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বিয়ে। তাদের মতে পারস্পরিক সংঘাতময়তা প্রদর্শনকারী গ্রপের সদস্যরা যদি স্বজাতিমোহ ছেড়ে অন্য সংস্কৃতির/ধর্মের সদস্যদের বিয়ে করতে শুরু করে, তবেই একমাত্র কনফ্লিক্ট (মজ্জাগত রেসিজম?) কমে আসবে।

নিঃসন্দেহে এটা বলা সহজ, কিন্তু করা কঠিন। এথনোসেন্ট্রিক ব্যবহার আমাদের মজ্জাগত বলেই আমরা বাঙালিরা বিয়ের সময় আরেকজন বাঙালিই খুঁজি। যারা ট্রাডিশনাল তারা আবার পরহেজগার মেয়ে খুঁজবেন, আর যারা একটু উদার তারা গান গাওয়া একটু আধটু সংস্কৃতির চর্চা করা মেয়ে খোঁজেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সীমাবদ্ধ ছকেই। জাতিসত্তাকে অস্বীকার করতে পারি খুব কমই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অন্তত আশা দেখেন এই ক্ষেত্রেই। যদিও আমার কাছে এটি অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে' জাতীয় সমস্যা। সংঘাত থাকার কারণে 'ক্রস কালচারাল ইন্টারম্যারেজ' হচ্ছে না, নাকি ক্রস কালচারাল ইন্টারম্যারেজ হচ্ছে না বলে সংঘাতগুলো মানবসমাজে বজায় আছে, তা বের করা কঠিনই। তারপরেও হুইটমেয়ার-এর সমাধান অন্তত এই মুহূর্তে দ্বিতীয়টির দিকেই।

সপ্তম অধ্যায়

বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব

আগের পর্বে আমরা সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সহিংসতার একটি নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণ হাজির কারার চেষ্টা ছিল আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের পটভূমিকায়। এই পর্বে আমরা দেখব সহিংসতার বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে গিয়েই কীভাবে একসময় পরার্থিতা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটেছিল মানবসমাজে।

সহিংসতা আর নৈতিকতা—দুটি বৈশিষ্ট্যকে সাদা চোখে দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা মনে হবে। কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সহিংসতা আর নৈতিকতার মধ্যে একধরনের অলিখিত সম্পর্ক আছে। গবেষক স্যামুয়েল বাওয়েল তার একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজে বিদ্যমান নৃশংস সহিংসতা থেকেই শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা আর সহমর্মিতার উদ্ভব হয়েছিল[270]। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমরা জানি আমাদের ২৫ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সময়ই আমরা শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে কাটিয়েছি। শিকারি সংগ্রাহক সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ গোত্রই হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত থাকত, আর ১৫ থেকে ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকত যুদ্ধ কিংবা

[270] Samuel Bowles, Did Warfare Among Ancestral Hunter-Gatherers Affect the Evolution of Human Social Behaviors?, Science 5 June 2009: Vol. 324. no. 5932, pp. 1293 - 1298

খুনোখুনিতে মানুষের মারা যাওয়ার। বাওয়েল তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, আদিম শিকারি সংগ্রাহকদের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে গোত্রের সদস্যরা অনেক বেশি নিজেদের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, স্বার্থত্যাগ করে সদস্যদের জীবন রক্ষায় কাজ করতে পেরেছে, তারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুঁনিতে তারাই টিকতে পেরেছে অন্যদের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, সোজা বাংলায় বললে, মূঢ় সহিংসতা থেকেই একসময় জন্ম হয়েছে মূঢ় পরার্থিতার, নীচের কার্টুনটিতে তার একটি আলামত তুলে ধরা হয়েছে—



চিত্র: মূঢ় সহিংসতা থেকেই কি এক সময় জন্ম হয়েছিল মূঢ় পরার্থিতার?

কিন্তু কীভাবে স্বার্থপরতা কিংবা সহিংসতার মতো বদখত ব্যাপার-স্যাপার থেকে নৈতিকতার মতো একটি 'আপাত বিপরীতমুখী' গুণাবলির জন্ম হতে পারে? আসুন ব্যাপারটি একটু বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার চেষ্টা করি। তবে এ ব্যাপারটি বুঝতে আগে হলে আমাদের চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকাতে হবে, তাকাতে হবে প্রাণিজগতের দিকেও। আমাদের জানতে হবে নৈতিকতার ব্যাপারটি কি কেবল মানবসমাজেরই একচেটিয়া নাকি অপরাপর প্রাণিজগতেও এর হদিস মেলে?

প্রাণিজগতে পরার্থিতা এবং নৈতিকতা

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ। শিকাগোর ব্রুকফিল্ড চিড়িয়াখানা। বিন্তি জুয়া (Binti Jua) নামে এক মেয়ে গরিলা খাঁচার ভিতর পায়চারি করছিল। হঠাৎ, খাঁচার বাইরে দর্শকদের মধ্য থেকে একটি তিন বছরের শিশু দেয়ালের উপর বসে গরিলাকে দেখতে গিয়ে খাঁচার ভিতরে প্রায় বিশ ফুট নীচে কংক্রিটের মেঝেতে আছরে পড়ে। পড়েই জ্ঞান হারায় ছেলেটি। বিন্তি পায়চারি বাদ দিয়ে ছেলেটির দিকে এগিয়ে যায়। ১৬০ পাউন্ডের দীর্ঘদেহী গরিলাটিকে ছেলেটির দিকে এগিয়ে যেতে দেখে দর্শকদের মধ্যে মুহূর্তেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। বিন্তি কাছে গিয়ে অনেক মনোযোগ দিয়ে ছেলেটিকে দেখতে লাগল। তারপর এক সময় দুই হাতে শিশুটিকে বগলদাবা করে ফেলল। দর্শকদের মধ্যে তখন আতংক চরম মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। অনেকেই ভাবছিলেন, এবারে নিশ্চয়ই বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে খুড়ে খেয়ে ফেলবে ঐ পাষণ্ড গরিলা। কিন্তু তারপরে যা ঘটল, তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। এ কাহিনি কেবল আমরা রূপকথাতে কিংবা কল্পকাহিনিতেই শুনেছি। বিন্তি শিশুটিকে নিয়ে বিশফুট দেয়াল পার হয়ে খাঁচার এক প্রান্তের একটি প্রবেশ দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো যাতে নিরাপত্তাকর্মীরা তার কাছ থেকে এসে নিয়ে যেতে পারে। নিরাপত্তাকর্মীরা বিন্তির কাছ থেকে বাচ্চাটি নিয়েই সোজা হাসপাতালের দিকে ছুটলেন। শিশুটি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করল দিন কয়েকের মধ্যেই। এভাবেই ব্রুকফিল্ড চিরিয়াখানার বিন্তি নামের গরিলাটি বাঁচিয়ে দিয়েছিল একটি ছোট্ট শিশুর জীবন।



চিত্র: বিন্তি জুয়া নামের গরিলাটি বিশ ফুট নীচে পড়ে যাওয়া ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্ছে। ১৯৯৬ সালের আগাস্ট মাসের ১৬ তারিখে এভাবেই গরিলাটি বাঁচিয়েছিল ছেলেটির জীবন।

এ ধরনের পরার্থিতামূলক কাজ যে কেবল বিন্তিই করেছে তা কিন্তু নয়। ১৯৮৬ সালে জার্সি চিড়িয়াখানায় জাম্বো নামে আরেকটি গরিলাও ঠিক এমনিভাবে আরেকটি মানব শিশুর জীবন বাঁচিয়েছিল। সেখানেও শিশুটি খাঁচার ভিতরে পড়ে গিয়েছিল, আর জাম্বো বিন্তির মতো শিশুটিকে কোলে করে নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে তুলে না দিলেও বহুক্ষণ ধরে শিশুটির কাছে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা করেছিল, যাতে অন্য গরিলারা আক্রমণ করতে না পারে। এতোদিন মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, পরার্থিতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা প্রভৃতি শব্দগুলোকে 'মানুষের' একচেটিয়া সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করার

যে রেওয়াজ ছিল, বিন্তি কিংবা জাম্বোর প্রয়াস সে সব স্বতঃসিদ্ধ ধারণার প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল যেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, শুধু গরিলা নয় শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, কিংবা বনোবোদের মধ্যে এ ধরনের পরার্থিতার সন্ধান খোঁজ করলেই পাওয়া যায়, তারা একে বলেন সহমর্মিতা (empathy)। সহমর্মিতা মানুষ শুধু নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীর মধ্যেও দৃশ্যমান (animal empathy)। আর সহমর্মিতার সাথে নৈতিকতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানী ফ্র্যান্স ডি ওয়াল তার 'আওয়ার ইনার এপ' গ্রন্থে বিন্তির ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে অভিমত দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ব্যাপারগুলোকে কেবল মানবসমাজের সাংস্কৃতিক অংগ বলে ভেবে নেওয়া হতো তা মোটেও ঠিক নয়; আসলে মানবসমাজে নৈতিকতার উদ্ভবের উৎস লুকিয়ে আছে আমাদের বিবর্তনীয় যাত্রাপথে[271]। ছয় মিলিয়ন বছর আগে আমরা আমাদের শিম্পাঞ্জি জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। বিজ্ঞানী ফ্রান্স ডি ওয়াল তার সাম্প্রতিক 'প্রাইমেটস এন্ড ফিলোসফারস'[272] গ্রন্থে বেশ কিছু আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জি এবং বনমানুষেরাও অনেকটা মানুষের মতো করেই ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত হয়, এমনকি গোত্রে যুদ্ধে পরাজিত হলে পরাজিত শিম্পাঞ্জিকে অন্য একটি শিম্পাঞ্জি সান্ত্বনা জানানোর উদাহরণও তিনি বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বনোবো সহ আমাদের খুব কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর আবেগানুভূতি বা সহমর্মিতা



চিত্র: যুদ্ধে পরাজয়ের পর পরাজিত শিম্পাঞ্জির পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে আরেকটি শিম্পাঞ্জি (উৎস : Frans de Waal, Primates and Philosophers, 2006)

[271] Frans De Waal, Our Inner Ape, Riverhead Books; 2005.

[272] Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober, Primates and Philosophers: How Morality Evolved, Princeton University Press, 2006

বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মানবসমাজে নৈতিকতার প্রকৃত উৎস বৈজ্ঞানিকভাবে জানা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা আজ মনে করেন।

নৈতিকতার ব্যাপারটি মানুষ, গরিলা কিংবা কিংবা অন্য প্রাইমেটদেরই আছে তা কিন্তু নয়। ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর প্রাণী'র মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোনো সদস্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমনকি 'দশে মিলে' কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোনো আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতিরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে[273]। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক সময় পরার্থিতার ব্যাপারটি কেবল নিজেদের প্রজাতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বহু ক্ষেত্রেই অতিক্রম করে প্রজাতির আঙ্গিনা। যেমন, ডলফিনেরা হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে বিপন্ন মানুষজনকে বাঁচিয়েছে এমন বেশ কিছু নথিবদ্ধ ঘটনার উল্লেখ আছে বিজ্ঞানীদের গবেষণায়[274, 275, 276]।

স্বার্থপরতা থেকে সহযোগিতা

প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা আছে, আছে নিষ্ঠুরতা-এ কথা বোধ হয় আমরা সবাই জানি।

---

[273] [illegible]

[274] Caldwell, M. C. & Caldwell, D. K. (1966). Epimeletic (caregiving) behaviour in cetacea. In: Whales, Dolphins and Porpoises. (Ed. K. S. Norris). University of California Press. pp. 755-789.

[275] V. G. Cockcroft and W. Sauer, Observed and inferred epimeletic (nurturant) behaviour in bottlenose dolphins, Aquatic Mammals 1990, 16.1, 31-32

[276] Connor R.C. and K.S. Norris. Are dolphins reciprocal altruists?. American Naturalist. 119: 358-374.

কিন্তু কতটুকু নিষ্ঠুরতা? প্রকৃতি যে আসলে ঠিক কী পরিমাণ নিষ্ঠুর তা বোধ হয় অনেক সময় আমাদের চিন্তাতেও আসে না। হোরাস সম্প্রতি প্রাণিজগতে নিষ্ঠুরতার বেশ কিছু নমুনা মুক্তমনা ব্লগে হাজির করেছেন[277]। সেই লেখাটি থেকেই কিছু উদাহরণ হাজির করা যাক। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই শিশু হাঙরেরা একজন আরেকজনকে আক্রমণ করে হত্যা করে এবং তাদের খেয়ে ফেলে যা তাদের পুষ্টি জোগায়। শুরুতে ২০টির মতো শিশু হাঙর মায়ের গর্ভে বড় হতে শুরু করলেও ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে একটি মাত্র স্যান্ড শার্কের শিশু বেঁচে থাকে। মার কাছে রাখা কোলের শিশু অরক্ষিত হয়ে পড়লে পুরুষ সিফাকা লিমারেরা শিশু লিমারটিকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পেট দুভাগ করে মাটিতে ফেলে দেয়।

তারপর ধরুন পাখিদের মধ্যে বিদ্যমান নিষ্ঠুরতার উদাহরণগুলো। কোকিলের নিষ্ঠুরতার উদাহরণ তো আমাদের সবারই জানা। একে তো কোকিল প্রতারণা করে অন্য পাখির রাসায় ডিম পাড়ে। শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে না হয় কথা ছিল। কোকিল শিশু ডিম থেকে ফুটে বের হওয়ার সাথে সাথেই যে কাজটি করে তা হলো অন্য ডিমগুলোকে বাসা থেকে ফেলে দেয়া, এমনকি আশে পাশের ডিম ফুটে সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাকেও। শিশু কোকিলের পিঠে বিশেষ ধরনের একটি খাঁজের মতো থাকে যেটা দিয়ে সে ডিমগুলোকে পাখির বাসার বাইরে ফেলে দিতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, কোকিল শিশুরা এই কাজটি সহজাত প্রবৃত্তির বশেই করে থাকে। আবার, ব্লু ফুটেড বুবিস নামক পাখিরা খাদ্যস্বল্পতার সময় (যখন বাচ্চাদের ওজন স্বাভাবিকের চাইতে ২০ ভাগের বেশি কমে যায়), বড় বাচ্চাটি তখন অন্য সহোদরদের ঠোকর দিয়ে মেরে ফেলে অথবা বাসা থেকে বের করে দেয়। ফলশ্রুতিতে ছোট বাচ্চাটি খাদ্যের অভাবে কিংবা অন্য প্রাণীদের আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যায়।

কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রেও নিষ্ঠুরতা প্রবল। মৌমাছিদের কথাই ধরা যাক। রানি

[277] হোরাস, পরিকল্পিত ডিজাইনঃ God Must Be Crazy, মুক্তমনা।

মৌমাছি যখন লার্ভা থেকে পিউপাতে পরিণত হয়, তখন প্রথম মৌমাছিটা সাথে সাথেই সে অন্যান্য সকল প্রতিদ্বন্দী সহোদরাদের হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে। তার বোনদের একজনও তার হাত থেকে নিস্তার পায় না। তবে প্রকৃতির সম্ভবত সবচেয়ে চরম নিষ্ঠুরতার উদাহরণ পেয়েছিলাম যখন আমাদের মুক্তমনা সদস্য পৃথিবী একবার ইমেইল করে আমাকে ইকনিউমেন (Ichneumon) প্রজাতির একধরনের প্যারাসিটোয়েড বোলতার কথা জানিয়েছিলেন। এরা একটি শুঁয়োপোকাকে হুল ফুটিয়ে প্যারালাইজড করে ফেলে এবং সেটার দেহে ডিম পাড়ে। অর্থাৎ, শিকারকে সরাসরি হত্যা না করে দৈহিকভাবে অবশ করে দিয়ে সেই শিকারের দেহের ভেতরে ডিম পাড়ে। এই ডিম ফুটে যে শূককীট (larva) বের হয়, তা শিকারের দেহের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। স্ত্রী বোলতাগুলো তার শিকারের প্রত্যেকটি স্নায়ুগ্রন্থি সতর্কতার সাথে নষ্ট করে দেয় যাতে তাদের শিকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার এই নির্বিচারী উন্মাদনা দেখে সময় সময় বিচলিত হয়েছেন আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, প্রকৃতিবাদী, মানবতাবাদী, সংশয়বাদী— সকলেই। বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স এই ইকনিউমেন প্রজাতির বোলতার উদাহরণটিকে তার *গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ* বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি রবিন উইলিয়ামসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘এই প্যারাসিটোয়েড বোলতাগুলোর নিষ্ঠুরতা দেখলেই বোঝা যায় যে পরম করুণাময় ঈশ্বরের মতো কোনো পরিকল্পনাকারী দ্বারা এই মহাবিশ্ব তৈরি হলে তিনি একজন স্যাডিস্টিক বাস্টার্ড ছাড়া আর কিছু হবেন না’[278]।

---

[278] Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free Press, 2009; p 370.



চিত্র: ইকনিউমেন প্রজাতির বোলতা শুঁয়োপোকাকে হুল ফুটিয়ে দৈহিকভাবে অবশ করে দিয়ে সেই শিকারের দেহের ভেতরে ডিম পাড়ে, আর তার দেহকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

প্রকৃতির এই ঢালাও নিষ্ঠুরতা দেখে এক সময় বিচলিত হয়েছিলেন ডারউইনও। তিনি প্যারাসিটোয়েড বোলতাগুলোর বীভৎসতা দেখে পরম করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়েন; তিনি মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন[279]—

> আমি ভাবতেই পারি না, একজন পরম করুণাময় এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোনো ঈশ্বর এইভাবে ডিজাইন করে তার সৃষ্টি তৈরি করেছেন যে, ইকনিউমেনগুলোর খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য একটি জীবন্ত কিন্তু প্যারালাইজড শুঁয়োপোকার প্রয়োজন হয়।

ঈশ্বরের ‘ভুল ডিজাইনের’ কথা না হয় বাদ থাকুক। আমরা বরং বৈজ্ঞানিকভাবেই খুঁজে দেখার চেষ্টা করি কেন প্রকৃতিতে এই ঢালাও নিষ্ঠুরতা এমনিভাবে টিকে আছে! বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন চার্লস ডারউইনই, ১৮৫৯ সালে প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে। ডারউইন বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতিতে প্রতিটি জীবের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা যত, সে পরিমাণ খাদ্যের যোগান প্রকৃতিতে কখনোই থাকে না। শুধু খাদ্য নয়, আশ্রয়, বাসস্থান এমনকি প্রজনন সঙ্গীরও ঘাটতি থাকে। এ সব নিয়ে প্রতিনিয়ত অন্তঃপ্রজাতি (intra-species) এবং আন্তঃপ্রজাতি

279 Darwin's letter to Asa Gray, 22 Mary 1860; Quoted in Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth, পূর্বক্ত, p 370.

(inter-species) প্রতিযোগিতা চলে। জীবজগতে সবাইকেই বেঁচে থাকার, অধঃবংশ রেখে যাওয়ার অর্থাৎ এক কথায় টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম চলে। তিনি এর নাম দেন জীবনের জন্য সংগ্রাম বা জীবন-সংগ্রাম (struggle of existence)। ডারউইন বুঝতে পেরেছিলেন— জীবন সংগ্রামের কারণেই প্রকৃতির জীবজগৎকে কিছু ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুর হতে হয়েছে।

এখন ডারউইন প্রস্তাবিত বিবর্তনীয় পটভূমিকায় প্যারাসিটোয়েড বোলতার নিষ্ঠুরতার ব্যাপারটা আরেকবার চিন্তা করা যাক। উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না। শুঁয়োপোকার জীবন্ত দেহ নিঃসন্দেহে শূককীটের জন্য খুব ভালো আশ্রয় এবং নিরাপদ খাদ্যের যোগান। কাজেই বিবর্তনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এমন কোনো জীব খুঁজে পেলে নিশ্চয় আমরা অবাক হব না যে কি না খাদ্যের চালান এবং আশ্রয় বজায় রাখার জন্য শুঁয়োপোকাকে নিস্তেজ করে তার দেহকে ব্যবহার করার সুযোগ নিতে চাইবে। প্যারাসিটোয়েড বোলতাগুলো সেই সুযোগেরই সফল সদ্ব্যবহারকারী মাত্র।

ডারউইইন যখন বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন তখন তিনি জিনের ব্যাপার-স্যাপারগুলো মোটেই জানতেন না। জানবেনই বা কী করে? জেনেটিক্সের তখন জন্মই হয়নি। এমনকি মেন্ডেলের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও মেন্ডেলের জিন নিয়ে প্রাথমিক কাজগুলো তার দৃষ্টির অগোচরে থেকে গিয়েছিল। শুধু ডারউইনই নন, সেসময়কার সমসাময়িক কোনো বিজ্ঞানীই মেন্ডেলের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি, তার কাজ মূলত হারিয়েই গিয়েছিল বিস্মৃতির অন্তরালে। মেন্ডেলের মৃত্যুর ১৬ বছর পরে সেগুলো পুনরাবিস্কৃত হয় ইউগো দ্য ফ্রিস, কার্ল করেন্স এবং এরিখ ফন শেরমাখ—সেসেনাগ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দ্বারা। তারপর থেকে বিশেষত আধুনিক বংশগতিবিদ্যার উন্মেষের পর থেকে আমরা জিন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করেছি। চল্লিশের দশকে জনপুঞ্জ বংশগতিবিদ্যার অভ্যুদয়ের পর প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে বংশগতির সম্মিলন ঘটে। জনপুঞ্জে জিন কীভাবে বংশাণুসৃত হয়, তা ব্যাখ্যা

করেছিলেন গণিতবিদ জি এইচ হার্ডি এবং জার্মান চিকিৎসক ভিলহেল্ম ওয়েইনবার্গ। পরে পরিসংখ্যানবিদ ইউল দেখিয়েছিলেন যে ডারউইনের অবিচ্ছিন্ন পরিবৃত্তি যে মেন্ডেলবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, পরিসংখ্যান দিয়ে তা প্রমাণ করা যায়। জীববিদ নিলসনের গবেষণায় ইউলের প্রকল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সর্বাধিক ইনফ্লুয়েনশিয়াল ছিল ১৯৩৭ সালে ডবজাবনস্কির ‘জেনেটিক্স এন্ড অরিজিন অব স্পিশিজ’ নামক বইটির প্রকাশ। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে আধুনিক বংশগতিবিদ্যার সাথে ডারউইনবাদের সমন্বয় ঘটে। রঙ্গমঞ্চে আসে বিবর্তনের সংশ্লেষণী তত্ত্ব তথা আধুনিক বিবর্তনের তত্ত্ব, যা এখনও বিবর্তনের স্বীকৃত তত্ত্ব হিসেবে জীববিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে রাজত্ব করে চলেছে।

সেই আধুনিক বিবর্তন তত্ত্ব আমাদের খুব ভালোভাবে দেখিয়েছে জিনগত স্তরে এক ধরনের স্বার্থপরতা কাজ করে[280]। আমরা সবাই অবগত যে, মানুষসহ যে কোনো প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলতে সচেষ্ট হয় জীবজগতের প্রায় সকল সদস্যরাই। কারণ, ‘পরবর্তী জিন’ রক্ষা না পেলে নিজের দেহ সুন্দর, কিংবা সুরক্ষিত হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। সেজন্যই নেকড়ে যখন আক্রমণ করে, গোত্রের ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য বুনো মোষেরা বাচ্চাদের চারিদিকে ঘিরে শিং উঁচিয়ে নেকড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও। এভাবেই জীব নিজেকে বিবর্তনের পথ ধরে এমনভাবে নিয়ে চলে যাতে তার জিন-বিস্তারে কিংবা ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষায় উদ্যোগী হয়, টিকে থাকার প্রয়োজনেই। আসলে যার সাথে সে

[280] Richard Dawkins wrote a very popular book called the Selfish Gene that explained, for a popular audience, many of the exciting new theories and discoveries being made in evolutionary biology in the 1960's and 70's. The metaphor Dawkins chose, the selfish gene, was an extremely powerful metaphor, so powerful that it has often overshadowed the science itself! The controversies that swirl around EP are often tightly bound up with Dawkins metaphor. If our genes are selfish, are we all, deep down, unalterably selfish ourselves? Why did Dawkins chose this metaphor, what does it really mean, and what are its implications for EP and human nature? To read more in technical terms Why are genes selfish, please refer to Edward H. Hagen, Institute for Theoretical Biology, Berlin, Why are genes selfish? http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/epfaq/selfishgene.html.

বেশি জিন বিনিময় করবে, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা, সেজন্যই, জীব নির্বিশেষে সন্তানের প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিকটাত্মীয়ের প্রতি এবং গোত্রের প্রতি একধরনের জৈবিক টান উপলব্ধি করে, এবং তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে। কাজেই জিনের উদ্দেশ্য যদি কেউ বলেন—কেবল স্বার্থপরভাবে প্রতিলিপি করা আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা—তাহলে সেটা অত্যুক্তি হবে না মোটেই। সেজন্যই স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার 'সেলফিশ জিন' গ্রন্থে অনুপম কাব্যিক ভঙ্গিমায় বলেন[281]—

> আমরা সবাই একেকটি টিকে থাকার যন্ত্র (survival machine)- অন্ধভাবে প্রোগ্রাম করা একটি নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক বাহন মাত্র—যার উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থপরভাবে এক ধরনের জৈবঅণুকে সংরক্ষণ করা। ... তারা আমার ভেতরে আছে, তারা রয়েছে আপনার ভেতরেও; তারাই আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমাদের দেহ আর আমাদের মন; আর তাদের সংরক্ষণশীলতাই আমাদের অস্তিত্বের চূড়ান্ত মৌলিকত্ব। ওই অনুলিপিকারকেরা এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। এখন তাদেরকে জিন বলে ডাকা হয়, আর আমরা হলাম তাদের উত্তরজীবীতার যন্ত্র।

কাজেই জৈব যন্ত্র যে স্বার্থপর তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। জিনগত স্তরে স্বার্থপরতা থাকার কারণেই অনেকটা 'টিকে থাকার যন্ত্র' হিসেবে কাজ করে যায়। কিন্তু বিস্ময়কর যে ব্যাপারটি গবেষণায় বেরিয়ে এল তা হলো—জিনের এই স্বার্থপরতা থেকেই পরার্থিতার মতো এক ধরনের বিপরীতমুখি অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। 'দ্য A¨v›U এন্ড দ্য পিকক' গ্রন্থের লেখিকা জীববিজ্ঞানী হেলেনা ক্রনিন তার 'দ্য বেটেল অব সেক্সেস রিভিসিটেড' নামের প্রবন্ধে বলেন[282]—

> Among genes all is selfishness, every gene out for its own replication. But from conflict can come forth harmony; the very selfishness of genes

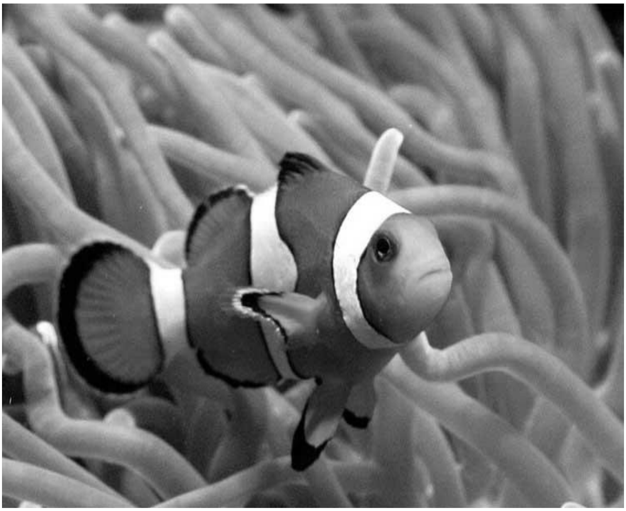
---

[281] Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition, Oxford University Press, USA; 3 edition, 2006; অনুবাদের কিয়দাংশ - অনীক আন্দালিব, সেলফিশ জিন, মুক্তমনা।

[282] Helena Cronin, The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today, Cambridge University Press, 1993

can give rise to cooperation. For among the potential resources, that genes can exploit is the potential for cooperation with other genes. And if it pays to cooperate, natural selection will favor genes that do so.

স্বার্থপর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরার্থিতার উদ্ভবের ব্যাপারটি শিক্ষায়তনে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন বিজ্ঞানী জর্জ উইলিয়ামস এবং উইলিয়াম হ্যামিলটন[283]। পরবর্তীতে ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন রিচার্ড ডকিন্স তার উপরে উল্লিখিত 'সেলফিশ জিন' বইয়ের মাধ্যমে[284]। তারা দেখালেন, স্বার্থপর জিন যেমন আত্মত্যাগ কিংবা পরার্থিতা তৈরি করে, ঠিক তেমনি আবার প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রাম থেকেই জীবজগতে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবীতা কিংবা সহ-বিবর্তন। টিকে থাকার প্রয়োজনেই কিন্তু এগুলো ঘটে।



চিত্র: ক্লাউন মাছ আর এনিমোনের সহবিবর্তন গড়ে উঠে তাদের নিজেদের স্বার্থের কারণেই।

এমনি একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে 'কালারফুল ক্লাউন' মাছের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন। এ ধরনের মাছ তার গাঢ় রঙের কারণে সহজেই অন্যের শিকারে পরিণত

[283] Hamilton W.D., The genetical evolution of social behaviour I and II. — Journal of Theoretical Biology 7: 1-16 and 17-52, 1964.
[284] Richard dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976.

হতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য গাঢ় রঙের সামুদ্রিক এনিমোনের শুঁড়ের ভিতর প্রায়শই আত্মগোপন করে। এভাবে ক্লাউন মাছগুলো শিকারি মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে এনিমোনগুলোও ক্লাউন মাছের কারণে উপকৃত হয়। কারণ ক্লাউন মাছগুলো এনিমোনভোগী ছোট মাছকে তাড়িয়ে দেয়। এনিমোন এবং ক্লাউন মাছের সহবিবর্তনের ফলে উপকৃত হচ্ছে দুই প্রজাতিই। নিঃস্বার্থ ভাবে একে অপরের সেবা করার জন্য তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেনি, বরং বন্ধুর প্রকৃতিতে আত্মরক্ষা আর টিকে থাকার প্রয়োজনেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক। এ ধরনের অনেক সম্পর্কই প্রকৃতিতে আছে। হামিং বার্ডের সাথে অর্নিথোপথিলাস ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোয়িড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন এগুলোর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। অত্যন্ত স্বার্থপর কারণেই তাদের মধ্যে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; আর সেই নিতান্ত স্বার্থপর কারণটি হলো—সফলভাবে টিকে থাকার ইচ্ছে। স্বার্থপরতার কারণেই কীভাবে সহযোগিতার গুণাবলি প্রকৃতিতে বেড়ে উঠে সেটি বিশ্লেষণ করতে গিয়েই বিজ্ঞান লেখক ম্যাট রিডলী তার 'নৈতিকতার উৎস' বইয়ে উল্লেখ করেছেন—*উই কোঅপারেট ইন অর্ডার টু কম্পিট বেটার*। ব্যাপারটা খুব নির্জলাভাবে সত্য।

আমরা ছোটবেলায় কামিনী রায়ের অনেক পরার্থিতামূলক কবিতা পড়েছি -

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলই দাও
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও। ...

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'আপনার কথা ভুলিয়া পরের কারণে স্বার্থ বিলিয়ে' দেয়ার মতো করে প্রকৃতিতে জীবজগৎ কাজ করে না। ডারউইন অনেক আগেই ধারণা করেছিলেন যে, তার বিবর্তন তত্ত্ব সত্যি হলে, প্রকৃতিতে এমন কোনো জীব পাওয়া যাবে না যে শুধু নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রজাতির সেবা করার জন্য বেঁচে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। ডারউইন তার 'অরিজিন অব স্পিশিজ' বইতে তার পাঠকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ ধরনের একটা প্রজাতি খুঁজে বের করার জন্য, এবং

স্বাভাবিক কারণেই আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেনি। এই সহজ ব্যাপারটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। আমাদের দেহের ভিতরেই অসংখ্য উপকারী ব্যকটেরিয়া বাস করে, এগুলো আমাদের দেহে থাকার ফলে আমরা যেমন—তাদের দিয়ে উপকৃত হচ্ছি, তেমনি আবার ব্যাকটেরিয়াগুলোও বেঁচে থাকার নানা রসদ খুঁজে পাচ্ছে আমাদের দেহে। এমন কিন্তু নয় যে, আমরা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে সেবা করার পশরা সাজিয়ে বসে আছি তাদের উপকার করার জন্য। কিংবা উল্টোভাবে ব্যাক্টেরিয়াগুলো সাহায্যের দোকান খুলে বসে আছে মানবসমাজকে নিঃস্বার্থ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে। বরং দুইপক্ষের স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে বলেই এই সহযোগিতার সম্পর্কগুলো টিকে রয়েছে। অর্থাৎ, পরার্থিতা কিংবা সহযোগিতা—যাই বলি না কেন এর মূলে কিন্তু রয়ে যাচ্ছে সেই মোটা দাগে লোভাতুর স্বার্থপরতাই। বিজ্ঞানী জর্জ উইলিয়ামস সেজন্য খুব চাঁছাছোলাভাবেই বলেছেন[285]—

> যখন একজন জীববিজ্ঞানী দেখেন কোনো প্রাণী অন্য কারো উপকার করে চলেছে, তিনি সহজাত নিয়মেই ধরে নেন যে, প্রাণীটিকে উপকারের নামে আসলে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে, কিংবা এর পেছনে রয়েছে কোনো প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা।

একই ব্যাপার চোখে পড়েছিল বিজ্ঞানী হ্যামিলটানেরও। তিনি পিঁপড়ে, মৌমাছি সহ বিভিন্ন সামাজিক কীট-পতঙ্গের কাজ এবং আচারব্যবহার বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, তাদের পরার্থিতামূলক কাজগুলো আসলে ঢালাওভাবে পরার্থিতামূলক নয়, বরং তাদের বিভিন্ন কাজের পেছনে আসল অভিসন্ধি হচ্ছে খুব স্বার্থপরভাবে জিনের রক্ষা আর বহুপ্রতিলিপি রেখে যাওয়ার পথ সুগম করা। পিঁপড়েরা একসাথে খাদ্যের অন্বেষণ করে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরাট কলোনি গড়ে তুলে। মৌমাছিরাও তাই। তাদের মধ্যে আছে এমনকি বন্ধ্যা সৈন্যের (sterile worker) উপস্থিতিও, যারা পুরো জীবন ব্যয় করে দেয় রানির সেবা যত্নে, নয়তো গোত্রকে রক্ষা করে শত্রুর আক্রমণ থেকে। জৈবিকভাবে চিন্তা করলে এরা তো পরার্থিতার চূড়ান্ত!

---

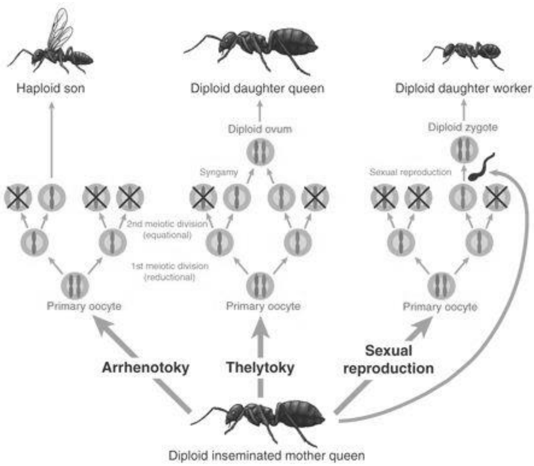
[285] Paradis, J. and G.C. Williams, T.H. Huxley's Evolution and Ethics: with New Essays on its Victorian and Sociobiological Context. Princeton University Press, Princeton, N.J, 1989.

কারণ নপুংসক এই বন্ধ্যা সৈন্যদের কখনো কোনো সন্তান হয় না। তারা কেবল খোঁজা প্রহরীর মতো হেরেম পাহারা দেয়! সাদা চোখে দেখলে জৈবিকভাবে এদের নিজের জিন রক্ষার তাগিদ একেবারে শূন্য। তাহলে? কলুর বলদের মতো বেগার খাটা এই সৈন্যরা বিদ্রোহ করছে না কেন?

এই ধাঁধাই সমাধান করলেন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম ডোনাল্ড হ্যামিলটন। তিনি তার গবেষণায় দেখালেন যে মৌমাছি কিংবা পিঁপড়েদের সমাজ খুব জটিল। সেখানে রানি মৌমাছির সাথে কর্মী মৌমাছির (যার অধিকাংশই নিজের সন্তান) সম্পর্কের এক জটিল টানাপোড়েন চলে প্রতিনিয়ত। দেখা গেছে, রানি মৌমাছি দিনে প্রায় আড়াই হাজার ডিম পাড়ে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই কলোনিতে ডিমের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সেই ডিমের কিছু অংশকে রানি নিষেক ঘটায় পুরুষ মৌমাছির শুক্রাণু দিয়ে, আবার বহুসংখ্যক ডিম নিষেক ছাড়াই পড়ে থাকে। নিষেক ঘটানো ডিমগুলো থেকে জন্ম হয় কেবল নারী মৌমাছির। এরা ডিপ্লয়েড। এদের ক্রোমজোমে থাকে যুগল বন্ধন। এই যুগল সেটটির অর্ধেক আসে বাবার কাছ থেকে আর অর্ধেক মায়ের। কিন্তু অন্যদিকে পুরুষ মৌমাছিরা হ্যাপ্লয়েড, তাদের জন্ম হয় অনিষিক্ত ডিম থেকে জন্ম। এদের কেবল একটিই ক্রোমোজম থাকে, যা সরাসরি তাদের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। ফলে কর্মী নারী মৌমাছিরা তাদের বোনদের সাথে এমনকি শতকরা ৭৫ ভাগ সদৃশ জিনের অংশ বিনিময় করে, যেখানে তার মার সাথে কিংবা তার নিজের সন্তানের সাথে জিনের সাদৃশ্য তাকে শতকরা ৫০ ভাগ, এবং তার ভাইদের সাথে মাত্র ২৫ ভাগ। অর্থাৎ, একটি কর্মী মৌমাছি যদি নিজের বংশ রক্ষার চেয়ে যদি তার সহোদর বোনদের প্রজননে পরোক্ষভাবে সুবিধা করে দেয়, কিংবা তার রানি মৌমাছির সন্তানদের রক্ষা করায় সচেষ্ট হয়, তবেই তার অধিকতর জেনেটিক সাফল্য থাকবে। হিসেব কষলে কিন্তু তাই পাওয়া যাচ্ছে। পিঁপড়া, মৌমাছি কিংবা উইপোকা—যাদের এ ধরনের জটিল সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সবার মধ্যেই এ ধরনের জটিল সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সহযোগিতা

‘পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলি’ টাইপের সহযোগিতা নয়, বরং এই সহযোগিতার মূলে থাকে সেই একই স্বার্থপরতাই—জিনের আত্মপরায়ণতা। সেজন্যই ম্যাট রিডলী তার ‘দ্য অরিজিন অব ভার্চু’ বইয়ে বলেন[286] —

> In the world of biology, an ant slaves away celibate on behalf of its sisters not out of goodness of its little heart, but out of the selfishness of genes.



চিত্র: পিঁপড়েদের মধ্যে বিদ্যমান জটিল জেনেটিক সম্পর্কের কারণেই তাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সহযোগিতা গড়ে উঠে। বিজ্ঞানী হ্যামিলটন দেখিয়েছেন এই সহযোগিতার মূলে থাকে জিনকেন্দ্রিক স্বার্থপরতাই।

কীভাবে পরার্থিতামূলক অভিব্যক্তি গড়ে উঠে তা নির্ণয়ের জন্য হ্যামিলটন একটি নিয়ম প্রস্তাব করেন, যা জীববিজ্ঞানে এখন হ্যামিলটনের সূত্র হিসেবে পরিচিত। সূত্রটির গাণিতিক সংজ্ঞায়ন এরকম[287] —

---

[286] Matt Ridley, The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation, Penguin; 1998
[287] W. D. Hamilton, "The Genetical Evolution of Social Behavior". Journal of Theoretical Biology 7 (1), 1964

$$b > \frac{c}{r}$$

যেখানে,

c হচ্ছে পরার্থিতার ব্যয় (cost of altruism)

b হচ্ছে গ্রাহকের পাওয়া উপযোগিতা (benefit received by recipient)

r হচ্ছে সম্পর্কের গুণাঙ্ক (coefficient of relationship)

অর্থাৎ, সোজা বাংলায়, যখন কোনো প্রজাতির মধ্যে সহযোগিতার উপযোগিতা তার ব্যয়কে অতিক্রম করে যায় তখনই পরার্থিতা উদ্ভূত হবে। হ্যামিলটনের এই নীতিটিকেই বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী মায়নার্ড স্মিথ নামকরণ করেছিলেন স্বজাতি নির্বাচন (kin selection) হিসেবে। স্বজাতি নির্বাচনের মোদ্দা কথা হলো, জিনের নৈকট্য (অর্থাৎ হ্যামিলটনের সূত্রে rএর মান) যত বেশি হবে, তত বেশি হবে পরার্থিতাসূচক মনোভাব। সেজন্যই দেখা যায় সবাই নিজের সন্তান এবং পরিবারের প্রতি সবার আগে পরার্থিতা প্রদর্শন করে। পরিবারের কেউ বিপদে পড়লে সবার আগে চিন্তিত হয় সবচেয়ে কাছের জেনেটিক সদস্যরাই, তারপরে একটু দূরের আত্মীয়-স্বজন, পরে পাড়া-পড়শী, বন্ধুবান্ধব। সেজন্যই সন্তানের প্রতি বাবা মার আত্মত্যাগের ব্যাপারটি সব সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়, আসলে যা কি না জীববিজ্ঞানীদের চোখে স্বজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে জিনপুল রক্ষার প্রয়াস। একইভাবে ছোট ভাইকে ছিনতাইকারীর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে বড়ভাইয়ের আত্মত্যাগের নানা ঘটনাও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে পাওয়া যায়।

'স্বজাতি নির্বাচন'—প্রকৃতিতে খুব চমৎকারভাবে কাজ করে বলেই আমরা দেখি—কোনো হিংস্র শিকারি পাখি যখন কোনো ছোট পাখিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে, গোত্রের অন্য পাখি চিৎকার করে ডেকে উঠে তাকে সতর্ক করে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে সেই শিকারি পাখি আর তার আদি

লক্ষ্যকে তাড়া না করে ওই চিৎকার করা পাখিটিকে আক্রমণ শুরু করে। এই ধরনের পরার্থিতা এবং আত্মত্যাগ কিন্তু প্রকৃতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। এই ব্যাপারগুলো স্বজাতি নির্বাচনের মাধ্যমেই উদ্ভূত হয়েছে। হ্যামিলটন বা মায়নার্ড স্মিথের গবেষণার অনেক আগে থেকেই জীববিজ্ঞানীরা 'কমন সেন্স' হিসেবে জানতেন। যেমন ১৯৩০ সালে একবার বিজ্ঞানী জে বি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি তার ভাইয়ের জন্য জীবন বিপন্ন করবেন কি না। তিনি রসিকতা করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না একটিমাত্র ভাইয়ের জন্য নয়; কিন্তু দুটি ভাই কিংবা আটটি কাজিনের জন্য হলে আমি আছি'। বলা বাহুল্য, হালডেন মনে মনে স্বজাতির নৈকট্য হিসেব করেই তার এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন।

এবারে আরেকটু গভীরে ঢুকি। হ্যামিলটন-স্মিথের প্রস্তাবিত স্বজাতি নির্বাচনের ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে স্বজাতি নির্বাচন ব্যাপারটা সার্বিকভাবে জীবজগতে কাজ করে কীভাবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, স্বজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে পরার্থিতা এমনি-এমনি কোথাও কাজ করে না, এটি মূলত কাজ করে হয় বিবর্তনের ক্রীড়াতত্ত্ব বা গেম থিওরির মাধ্যমে ঘটা স্থিতিশীল কৌশল রাজত্ব করার কারণে।

ক্রীড়াতত্ত্ব বা গেম থিওরির যাত্রা শুরু হয়েছিল হাঙ্গেরির প্রতিভাধর গণিতবিদ জন ফন নিউম্যানের হাত দিয়ে ১৯৪৪ সালের দিকে। পরে ১৯৫১ সালের দিকে আরও শক্ত গাঁথুনি দেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ জন ন্যাশ[288], তৈরি করেন ন্যাশ স্থিতাবস্থার মডেল (Nash Equilibrium)। প্রথমদিকে অর্থনীতির ভিন্ন স্ট্র্যাটিজির ব্যাখ্যায় গেম তত্ত্ব ব্যবহৃত হলেও পরে দেখা গেল জীববিজ্ঞানেও এটি সমানভাবে কার্যকরী। জন মায়নার্ড স্মিথসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীই গেম তত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, শুধু প্রতিযোগিতা কিংবা স্বার্থপরতা দেখালে জিনপুলকে সর্বোচ্চ

[288] জনপ্রিয় বিউটিফুল মাইন্ড সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র - স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী এবং পরবর্তীতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক

দক্ষতায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না, সাথে আনতে হয় সহযোগিতা এবং পরার্থিতার কৌশলও।

কিন্তু কথা হচ্ছে, কতকগুলো ভারি ভারি কথা বলে দিলেই তো হলো না। কীভাবে বিবর্তনের গেম থিওরি জীবজগতের উপর কাজ করে সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা চাই। এটি বুঝতে হলে আমাদের সবার প্রথমে তাকাতে হবে জেলখানায় বন্দি আসামিদের উভয়-সংকটের দিকে।

আসামির সংকট

গাণিতিকভাবে গেম থিওরির ব্যুৎপত্তি না ঘটলেও এই ধরনের স্ট্র্যাটিজিক সমস্যাগুলো প্রাচীনকালে দার্শনিক আর রাজনীতিবিদদেরও আকৃষ্ট করেছিল পুরোমাত্রায়। প্রাচীন কালে রাজাবাদশাহরা নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে নানা ধরনের 'গেম প্ল্যান' করতেন। কখন কোন্ রাজার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে, কখন পাশের রাজ্য আক্রমণ করতে হবে, আর কখন বা আবার আক্রমণ ভুলে দেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করতে হবে—এগুলো নিয়ে তারা চিন্তিত থাকতেন অহর্নিশি। যারা এ ব্যাপারে ভালো কূটবুদ্ধি দিয়ে রাজাদের সাহায্য করতে পারতেন, তাদেরকে রাজসভায় আপ্যায়ন করে নিয়োগ দেয়া হতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা আমরা সবাই জানি—কূটবুদ্ধির জাল বুনে কীভাবে রাজাকে সহায়তা করা যায়—তার শক্তিশালী দলিল এটি। রাজনীতি আর অর্থনীতির নানা প্যাঁচঘোচ খুঁজে প্রজাদের রোষ থেকে রাজার গদি রক্ষার তল্পিবাহক হিসেবে কৌটিল্যকে এখন অভিযুক্ত করা হলেও কৌটিল্যই সম্ভবত ছিলেন মানবেতিহাসের প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি গেম থিওরির মতো স্ট্র্যাটিজিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতির বিদ্যমান সমস্যাগুলোর এক ধরনের যৌক্তিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু রাজনীতিবিদেরাই নন, অর্থনীতিবিদ, গণিতবিদ কিংবা দার্শনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সাধারণ মানুষই বিভিন্ন স্ট্র্যাটিজি পর্যালোচনা করেই জীবনের নানা সিদ্ধান্ত নেন। হাতে একাধিক ভালো চাকরির অফার থাকলে আমরা নতুন চাকরির

বেতন, চাকরির স্টেবিলিটি কিংবা চাপ, সেখানকার পরিবেশ, তেলের খরচ, বাড়ি থেকে যাত্রাপথের দূরত্ব কিংবা সময় প্রভৃতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেই কোন চাকরিতে যোগ দিব। সামাজিকভাবে বন্ধুত্ব কিংবা মেলামিশির ক্ষেত্রেও আগাপাশতলা সব কিছু বিবেচনা করেই নেওয়া হয় কার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে, আর প্রতি থেকে যাওয়া হবে নিরপেক্ষ। ফেসবুকে বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখির ক্ষেত্রেও অনেকে নানা স্ট্রেটেজির আশ্রয় নেন— কাকে সমালোচনা করা হবে, আর কার প্রতি যোগাতে হবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন। আসলে আমরা নিজেদের অজান্তেই খেলি ক্রীড়াতত্ত্বের জটিল খেলা। প্রাচীনকালে যখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এখনকার মতো ছিল না, পরিস্থিতি ছিল যুদ্ধংদেহী, তখন প্রাচীন কালের মানুষদের মধ্যে ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এমন অনেক পরিস্থিতিই জীবনে আসে যখন নিজের একতরফা জয়লাভ করতে যাওয়ার চেয়ে ভালো কোনো স্ট্র্যাটিজি করে প্রতিপক্ষকে দীর্ঘক্ষণ ঘায়েল করে রাখতে পারলে সুবিধা বেশি। কিংবা কখনো সরাসরি প্রতিযোগিতায় না নেমে তৃতীয় পক্ষের সাথে ঝামেলা তৈরি করে দিতে পারলে বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে। কখনো আবার এগুলো কোনোটাতেই না গিয়ে স্রেফ জনসমর্থন বাড়িয়ে কিংবা কিংবা সাময়িক সহযোগিতার মাধ্যমেও সর্বোচ্চ সুফল আদায় করে নেওয়া সম্ভব।

স্ট্র্যাটিজির ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য এবার একটি পরিচিত ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করা যাক। গেম থিওরির প্রয়োগ সংক্রান্ত অত্যন্ত সহজ সরল কিন্তু শক্তিশালী এই ধাঁধাটির নাম দেয়া হয়েছে আসামির সংকট (Prisoner's dilemma)। মুক্তমনায় অপার্থিব 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব' নামের একটি চমৎকার লেখায় আসামির সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছিলেন[289]। ব্যাপারটা অনেকটা এরকমের—

ধরা যাক একজন পুলিশ একটি হত্যা মামলায় দুজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই অপ্রতুল। ফলে পুলিশ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

---

[289] অপার্থিব জামান, বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব, বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়, মুক্তমনা ই-বুক, মুক্তমনা দ্রষ্টব্য

এখন আসামিদের দুজন সত্যই অপরাধ করেছে কি না কিংবা কে আসল অপরাধী তা নির্ধারণ করতে নীচের শর্তগুলো আসামিদের সামনে হাজির করা হলো—

১. একজন আসামি যদি দাবি করে (বিশ্বাসঘাতকতা) যে, অপর জন অপরাধী আর অপর জন যদি নিশ্চুপ থাকে (সহযোগিতা), তাহলে প্রথম জন মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয়জন ৫ বছরের কারাদণ্ড পাবে।

২. উভয়েই যদি নিশ্চুপ থাকে (দুজনের মধ্যে সহযোগিতা) তাহলে উভয়েরই ২ বছরের কারাদণ্ড হবে।

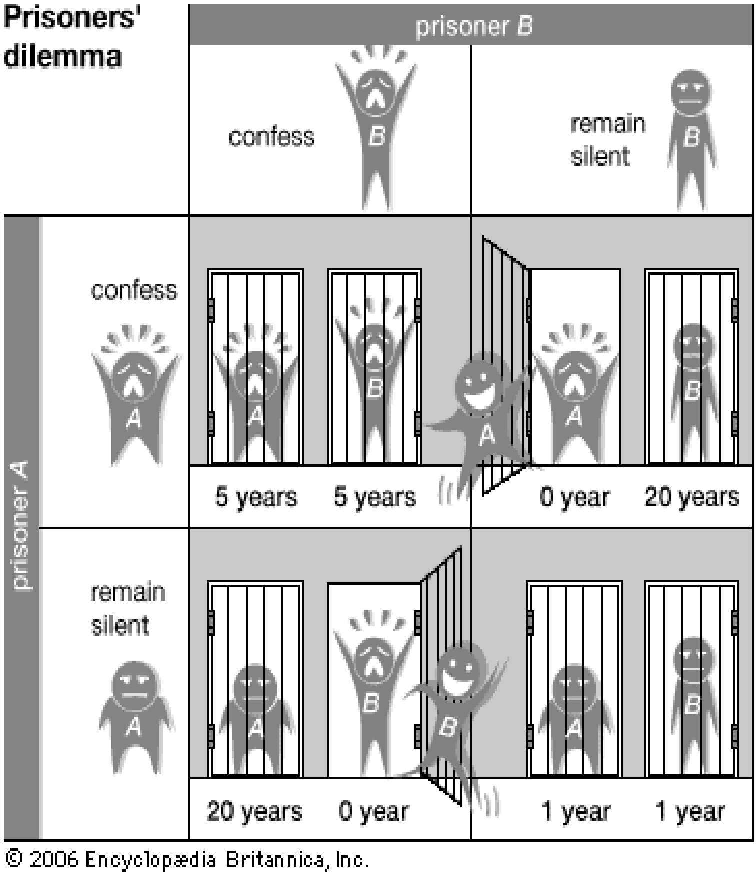
৩. উভয়েই যদি একে অপরকে দোষারোপ করে অপরাধী বানানোর চেষ্টা করে (দুইজনের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা), তবে তাদের প্রত্যেকের ৪ বছরের কারাদণ্ড হবে।

এখন তাহলে আসামিদ্বয় কী করবে? তারা উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করবে, কী করে নিজের সর্বোচ্চ লাভ হবে কিংবা নিজের সর্বোচ্চ ক্ষতি এড়ানো যাবে। প্রথমে হয়তো এক আসামি ভাববে, আমি যদি অপরকে দোষী বানাতে পারি, তাহলে আমি মুক্তি পাব। সুতরাং সে অপরজনকে দোষারোপ করবে। এখন দ্বিতীয়জন যদি নিশ্চুপ থাকত তাহলে প্রথমজন মুক্তি পেয়ে সর্বোচ্চ লাভ অর্জন করে ফেলতো। কিন্তু মুশকিলটা হলো—দ্বিতীয় আসামি যে নিশ্চুপ থাকবে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। দ্বিতীয়জনও যদি প্রথমজনের মতোই অপরকে দোষারোপের কৌশল নেয়, তাহলেই হবে সমস্যা। দুইজনেরই সর্বোচ্চ ৪ বছর করে কারাদণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুজন দুজনকে দোষারোপ করতে গিয়ে নিজেরাই সর্বোচ্চ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তারচেয়ে বরং দুইজনই যদি নিশ্চুপ থাকত, তখন হয়তো শাস্তিরমাত্রা কমে আসত। এই পুরো খেলাটা একাধিকবার পরিচালনা করা হলে হয়তো কারাবন্দিদের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ফলে তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপরা করে গেম থিওরির মাধ্যমে ঘটা স্থিতিশীল কৌশল আয়ত্ব করে নেবে। বাস্তবেও তাই

হয়। সেজন্যই আমরা দেখি দাগি ভয়ংকর সব আসামিদের মধ্যেও কিংবা মাফিয়া চক্রের মধ্যেও এক ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে। তারা পারতপক্ষে একে অপরকে ধরিয়ে দেয় না।

ট্রপিকাল রেইন ফরেস্টের দীর্ঘকায়া গাছগুলো আসামির সংকটের বাস্তব উদাহরণ। সেখানে গাছগুলোকে কেবল বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটিই কেবল দেখতে হয় না, পাশাপাশি বাড়াতে হয় নিজেদের উচ্চতাকেও। সেই ঘন বনভূমিগুলোতে সূর্যের আলো নীচ পর্যন্ত পৌঁছয় না। কাজেই উচ্চতায় খাটো হলে থেকে যায় সূর্যের আলো না পেয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই অন্য জায়গার গাছেদের মতো উচ্চতা বাদ দিয়ে কেবল বংশবৃদ্ধি করা কোনো অপশনই নয় তাদের জন্য। তাই রেইন ফরেস্টের গাছের জন্য কখন বংশবৃদ্ধি করতে হবে, আর কখন উচ্চতা বাড়াতে হবে—এ নিয়ে সবসময় চলে ক্রীড়াতত্ত্বের জটিল এক খেলা। ক্রীড়াতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় জমিতে কৃষকদের কীটনাশক প্রদানের ক্ষেত্রেও। কৃষকেরা দেখেছেন যে একটি কীটনাশক ব্যবহার করে কোনো একটি ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়—দেখা যায় সেই কীট মরলেও তার প্রতিযোগী অন্য কোনো ক্ষতিকর কীটের সুবিধা করে দেবার ঘটনা ঘটছে; যার নীট ফলাফল ফসলের জন্য ক্ষতি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষকেরা সিদ্ধান্ত নেন কখন কীটনাশক প্রয়োগ করবেন, কখন ছাড় দেবেন, আর প্রয়োগ করলে কোনো কোনো কীটের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করবেন ইত্যাদি। আসলে কৃষকের মনে চলতে থাকে আসামির সংকটের মতোই গেম তত্ত্বের নিরন্তর খেলা। জীবজগতের বিবর্তন ভারসাম্যও কিন্তু অনেকটা এভাবেই কাজ করে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন আদিমকালের মানুষের মধ্যে বহু সংঘর্ষ, সহাবস্থান, পারস্পরিক যোগাযোগ, প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক লাভ ক্ষতির হিসেবে থেকে এক ধরনের নৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছে। কীভাবে সেটা সম্ভব তা বুঝতে হলে আমাদের রিচার্ড ডকিন্সের স্বার্থপর জিন তত্ত্বের মাধ্যমে ঘটা ‘বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশল’

সম্বন্ধে একটু জানতে হবে।



চিত্র: আসামির সঙ্কট – ক্রীড়াতত্ত্বের একটি অতি পরিচিত উদাহরণ।

স্বার্থপর জিন এবং বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশল

রিচার্ড ডকিন্সের *সেলফিশ জিন* বইটির কথা আমরা আগেও বলেছি। ডকিন্স বইটি লেখেন ১৯৭৬ সালে। এটি রিচার্ড ডকিন্সের প্রথম বই এবং তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর একটি। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, বিবর্তন কাজ

করে জিনের উপর, একক কোনো জীবের উপর নয়। আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত 'অত্যন্ত স্বার্থপর'ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো 'উদ্দেশ্য' যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। বইটির নাম 'সেলফিশ জিন' হলেও বইটির মূল লক্ষ্য ছিল ঠিক বিপরীত। জিনগত স্বার্থপরতা থেকেই ক্রমান্বয়ে কীভাবে উদ্ভব হয় পরার্থিতার মতো একটি বিপরীতমুখী অভিব্যক্তির—তা ব্যাখ্যা করাই ছিল বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। ডকিন্স কিন্তু নতুন কিছু লেখেননি, বরং জর্জ উইলিয়ামস এবং উইলিয়াম হ্যামিলটনের কাজগুলোকেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের মোড়কে মলাটবন্দি করেছেন। তথ্যে নতুনত্ব না থাকলেও নিঃসন্দেহে নতুনত্ব আর অভিনবত্ব ছিল উপস্থাপনায়। উইলিয়ামস এবং হ্যামিলটনের কাজ ছিল একেবারেই কাঠখোট্টা একাডেমিক লেভেলে। ডকিন্স তাদের কাজকেই সাধারণ মানুষের দরবারে নিয়ে গেলেন একাডেমিক জার্গন সরিয়ে। আসলে এমনকি একাডেমিক স্তরেও ডকিন্সের বইটি প্রকাশের আগে এত ব্যাপকভাবে উইলিয়ামস এবং হ্যামিলটনের কাজ সম্বন্ধে কারও এতো জানাশোনা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থিতা, আত্মত্যাগের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরও বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন তারা। ডকিন্সের বইটি প্রকাশের আগে জীববিজ্ঞানীরা পরার্থিতা এবং আত্মত্যাগকে ব্যাখ্যা করতেন গ্রুপ সিলেকশন বা দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আত্মত্যাগ ব্যাপারটি ব্যক্তির জন্য খারাপ হলেও পুরো দলের জন্য ভালো—এটাই ছিল আত্মত্যাগের মতো প্রবৃত্তিগুলো টিকে থাকার কারণ—এভাবেই ভাবতেন জীববিজ্ঞানীরা। কিন্তু ডকিন্সের সেলফিশ জিন বইটি এসে দাবার ছক একেবারেই উলটে দিল। ডকিন্স দেখালেন যে, দলের কথা মাথায় রেখে বিবর্তন কখনোই কাজ করে না। আসলে দলগত নির্বাচন ব্যাপারটাই বিবর্তনের পরিভাষা থেকে উঠিয়ে দেয়া উচিত। যে ব্যাপারগুলোকে আপাতঃভাবে দলগত নির্বাচনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা

যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে, তার সবগুলোকেই আসলে স্বার্থপর জিন তত্ত্বের মাধ্যমে আরও অনেক ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ, নির্বাচন হয় জিন লেভেলে, গ্রুপ লেভেলে নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন নিজের জিনকে রক্ষা কিংবা যাদের সাথে জিনের নৈকট্য বেশি থাকে, তাদেরকেই রক্ষার তাগিদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। আর তা থেকেই ঘটে বৃহৎ স্কেলে পরার্থিতার সূত্রপাত। পিঁপড়া, মৌমাছি, উইপোকা থেকে শুরু করে বানর, শিম্পাঞ্জি কিংবা মানুষ□সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে জিনগত স্বার্থপরতা থেকেই উদ্ভব ঘটে পরার্থিতার, যা এতোদিন ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হতো দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে। জীববিজ্ঞানে এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে দিল ডকিন্সের স্বার্থপর জিন তত্ত্ব। স্বার্থপর জিনতত্ত্বই দলগত নির্বাচনকে সার্থকভাবে প্রতিস্থাপন করল উইলিয়ামস- হ্যামিলটন-স্মিথের প্রস্তাবিত স্বজাতি নির্বাচন (Kin selection) দিয়ে।

ডকিন্স তার বইয়ে দেখিয়েছেন স্বার্থপর জিন তত্ত্বের মাধ্যমে খুব সফলভাবে জীবজগতে পরার্থিতার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা যায়। শুধু তাই নয়, জীবজগতে সবসময়ই স্বার্থপরতা আর পরার্থিতার মধ্যে এক ধরনের 'দড়ি টানাটানির' খেলা চলতে থাকে। সেই টানাটানি থেকেই শেষপর্যন্ত নির্ধারিত হয় বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশল (Evolutionary Stable Strategy)। কীভাবে স্থিতিশীল কৌশল জীবজগতে রাজত্ব করে, তা বাংলায় একটি চমৎকার প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন মুক্তমনা ব্লগার দিগন্ত সরকার[290]। দিগন্ত লেখা শুরু করেছিলেন একটি মজার উদাহরণ দিয়ে —

> ধরা যাক মুক্তমনায় অপার্থিব আর বন্যা আমার প্রতিযোগী দুই সদস্য। এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে আমি এখন অপার্থিবের মুখোমুখি হলেই তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হব। কিন্তু, এমন যদি হয় যে অপার্থিব আবার বন্যারও প্রতিযোগী, তাহলে

---

[290] দিগন্ত সরকার, 'স্বার্থপর জিন' -এর আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ, বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়, মুক্তমনা ই-বুক, মুক্তমনা দ্রষ্টব্য

অপার্থিবকে মারলে আদপে বন্যার সুবিধাই হয়ে যাবে। বরং, বন্যা আর অপার্থিবের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হলেই আমার লাভ বেশি। তাই, প্রতিযোগিতার জটিল ঘূর্ণাবর্তে প্রতিযোগীদের নির্বিচারে হত্যা করাটা নির্বাচিত হবার জন্য খুব একটা ভালো কৌশল নাও হতে পারে।

অর্থাৎ কেবল মার-মার কাট-কাট করলেই লাভ হবে না। কারণ 'মার-মার কাট-কাট' স্ট্র্যাটিজি অনেক সময়ই টিকে থাকার জন্য কোনো ভালো স্ট্র্যাটিজি নয়। মারামারির পাশাপাশি রপ্ত করতে হবে সহযোগিতার কৌশলও। ব্যাপারটা গাণিতিকভাবেই সহজে প্রমাণ করা যায়। দিগন্ত তার লেখায় এই আকর্ষণীয় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ডকিন্সের বইয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ হাজির করে। আমি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে উদাহরণটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। বলা বাহুল্য, এই উদাহরণটি মূলত মায়নার্ড স্মিথের দেয়া কাল্পনিক 'Hawk and Dove' এর ঈষৎ পরিবর্তিত উদাহরণ[291]।

ধরা যাক, একটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যে দুই ধরনের পরস্পরবিরোধী কৌশল অবলম্বনকারী জীব রয়েছে। প্রথমটি আগ্রাসী নীতি (আনী), আরেকটি ধান্দাবাজ-বিবাদ নীতি (ধানী)। *আনী*রা হচ্ছে আগ্রাসী, এরা মার মার কাট কাট। তারা সবসময় শেষ রক্তবিন্দু অবধি লড়াই করে, মৃতপ্রায় না হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। অপরদিকে *ধানী*রাও বিবাদী, কিন্তু একটু ধান্দাবাজ টাইপের। এরা মারামারি না করে অন্য উপায়ে লড়াই করে। এরা ঝগড়া করে, রক্তচক্ষু দেখায়, আক্রমণের ভাব করে কিন্তু রক্তপাত করে না। কিন্তু তারপরেও দুই ধানীতে লড়াই বাধলে শেষপর্যন্ত একজন জিতে আরেকজন হারে। এদের পার্থক্যটা অনেকটা অনেকটা ডিপ্লোম্যাট আর আর্মির পার্থক্যের মতো। আনীর সাথে ধানীর লড়াই হয় না, কারণ ধানী পালিয়ে যায়। কিন্তু দুই আনীর লড়াইতে সর্বদা কোনো না কোনো একজন মারা যায় (বা গুরুতর আহত হয়)।

---

[291] In the biological literature, this game of game theory is referred to as Hawk-Dove. The earliest presentation of a form of the Hawk-Dove game was by John Maynard Smith and George Price in their 1973 Nature paper, "The logic of animal conflict", Nature 246: 15–18.

এবারে লড়াইয়ের কৌশলটি গাণিতিকভাবে হিসেব করা যাক। হিসাবের সুবিধার্থে আমরা ধরে নিব, কোনো জীবই জীবদ্দশায় তার কৌশল বদলায় না, এবং এমনকি প্রতিযোগিতার শুরুতে একে অন্যের কৌশল সম্বন্ধেও অবগত থাকে না। আমাদের এই মডেলের কাল্পনিক পয়েন্ট সিস্টেমে ধরা যাক :

প্রতিযোগিতায় জিতলে ৫০ পয়েন্ট,
প্রতিযোগিতায় হারলে ০ পয়েন্ট,
সময় নষ্টের জন্য ১০,
গুরুতর আহত হলে ১০০ পয়েন্ট বরাদ্দ করা হলো।

– জিনের নির্বাচনের সম্ভাবনার সাথে মিল রেখেই এরকম পয়েন্ট সিস্টেম।

আমরা হিসাব করতে চাই যে এদের মধ্যে কোন্ কৌশলটি (বা এদের কোনো সংমিশ্রণ) স্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

মনে করা যাক, জীবগোষ্ঠীর সব জীবই প্রথমে ধানী (ধান্দাবাজ বিবাদী নীতি) ছিল। তাহলে তাদের মধ্যে প্রতিটি প্রতিযোগিতায়, একজন জেতে (+৫০), একজন হারে (০); আর দুজনেই সময় নষ্ট করে (-১০x২ = -২০), কিন্তু কেউই আহত হয় না। সমষ্টিগতভাবে লাভ হয় ৩০ পয়েন্ট, প্রত্যেকের ভাগে যায় ১৫ পয়েন্ট করে। এবার ধরা যাক একটা আনী (আগ্রাসী নীতি) জীব হঠাৎ এসে হাজির হলো এই গোষ্ঠীতে। সে ধানীদের সহজেই লড়াইতে হারিয়ে দেবে, প্রতি যুদ্ধে +৫০ পয়েন্ট হাসিল করবে। তার ফলে তার আগ্রাসী জিন খুব সহজেই জীবগোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করবে। বিস্তার লাভ করতে করতে, ধরা যাক, একটা সময় পরে জীবগোষ্ঠীতে ধানীদের সংখ্যা একেবারেই কমে যাবে আর গোষ্ঠীর প্রায় সবাই আনী হয়ে যাবে। এখন স্বভাবতই দুই আনীতে লড়াই বাধবে। দুটি আগ্রাসী জীবের লড়াইয়ে প্রত্যেকে গড়ে -২৫ পয়েন্ট পায় (জেতায় +৫০, আর গুরুতর আহত হওয়ায় -১০০)। একটি বিবাদী সেই দলে থাকলে সে সব লড়াইতে হারে, কিন্তু গড়ে সে ০ পয়েন্ট পায়

(আগের গণনা থেকে)। -২৫ পয়েন্ট এর চেয়ে ০ পয়েন্ট অনেক ভালো। +৩৫ পয়েন্টের সুবিধা থাকায় সহজেই ধানী কৌশল নিয়ন্ত্রক জিন জনপুঞ্জে বিস্তার লাভ করতে থাকবে।

এতদূর পর্যন্ত গল্পটা শুনে মনে হতে পারে যে জীবগোষ্ঠীতে সবসময় এই দুই কৌশলের জীবদের মধ্যে একটা বাড়াকমা চলবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন যে ধানী আর আনীদের অনুপাত ৫:৭ অনুপাতে পৌঁছলে সমাজ স্থিতিশীলতা লাভ করবে! মানে, ওই অনুপাতে পৌঁছনর পরে প্রতিটি আগ্রাসী (আনী) আর প্রতিটি ধান্দাবাজ বিবাদী (ধানী)র গড়পড়তা লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব মিলে যায়। অর্থাৎ ধানী : আনী = ৫:৭ হয়ে গেলে নির্বাচনে আর কেউই অন্যের তুলনায় সুবিধা পায় না। এই অনুপাতই এক্ষেত্রে বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশল।

স্থিতিশীল কৌশল কেবল আনী-ধানীর ক্ষেত্রেই নয়, চমৎকারভাবে কাজ করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মানবসমাজে নারী পুরুষের অনুপাত থাকে ১০০ : ১০৫ অনুপাতে। ক্রীড়াতত্ত্বের সাম্যাবস্থার জন্যই এটি ঘটে। রিচার্ড ডকিন্স তার সেলফিশ জিন বইয়ের 'ব্যাটেল অব সেক্স' অধ্যায়ে উপরের আনী-ধানীর মতোই নারীপুরুষের মধ্যে প্রতারণা এবং বিশ্বস্ততা নিয়েও একটি সরল 'গেম থিওরির' অবতারণা করে দেখিয়েছেন যে, সেখানেও দড়ি টানাটানির একটা খেলা চলে, ফলে পূর্ণ বিশ্বস্ত নারী-পুরুষে ভর্তি সমাজ যেমন আমরা পাই না, তেমনি পাই না এমন সমাজও যেখানে সবাই অবিশ্বস্ত। বরং সমাজে দেখা যাবে—বিশ্বস্ততা এবং প্রতারণা রাজত্ব করে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে যা শেষ পর্যন্ত বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশল বা Evolutionary stable strategy তৈরি করে।

একই ধরনের মডেল তৈরি করা যায় সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেও। বিবর্তনীয় স্থিতিশীল কৌশলের কারণেই পরিপূর্ণ সত্যবাদী সমাজ যেমন আমরা পাই না, ঠিক তেমনি এমন সমাজও আমরা পাব না যেখানে সবাই মিথ্যা কথা

বলছে। এমনকি একই মানুষের মধ্যেও দেখা যাবে কারো পক্ষেই জীবনের সবসময় সত্য কথা বলা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি সম্ভব নয় সর্বদা মিথ্যে কথা বলাও। পদার্থবিদ হাইন্য পেগেল্স তাঁর "যুক্তির স্বপ্ন" বইয়ে এজন্যই বলেছেন[292]—

> জটিলতার নতুন বিজ্ঞান আর কম্পিউটারের প্রতিরূপ (মডেল) তৈরির মাধ্যমে আমরা মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি, যা আগে কখনোই সম্ভব ছিল না। নৈতিকতা নিয়ে বিতর্কের সুরাহা করতে না পারুক, বিজ্ঞান অন্তত মডেলের সাহায্যে ব্যাপারগুলোর একটা যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করতে পারে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন মিথ্যা বলা। আমরা সত্য বলাকে একটা পুণ্য বলে মনে করি আর মিথ্যা বলাকে পাপ হিসেবে গণ্য করি। এখন একটি সমাজ কল্পনা করি□যেখানে সবাই সর্বদা সত্য কথা বলছে। এখন সেই সমাজে কোনো এক মিথ্যেবাদী এসে হাজির হলো (অনেকটা উপরের ধানী সমাজে আনীর আগমনের মতো)। এখন সত্যবাদী সমাজে এরকম একজন মিথ্যা বললে তার বিপুলভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু এই সম্ভাবনা সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য সহায়ক নয়। অপরদিকে যে সমাজে সবাই সর্বদা মিথ্যা বলে, সেই সমাজও বেশিদিন স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না এবং একসময় ভেঙে পড়তে বাধ্য। সবচেয়ে স্থিতাবস্থার দশা হলো যখন সবাই অধিকাংশ সময় সত্য বলে কিন্তু মাঝে মধ্যে মিথ্যা বলে, যা বাস্তব জগতে দেখা যায়। এক অর্থে বলা যায় যে আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তারাই আমাদের বাকি সবাইকে সত্যবাদী ও সতর্ক থাকতে সহায়তা বা বাধ্য করে। মিথ্যাকথনের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমরা কেন মিথ্যা বলি সেটা বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

ক্রীড়াতত্ত্ব এইরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে সমর্থন দেয়, শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের নানা শাখাতেই। যেমন অর্থনীতি নিয়ে যারা পড়াশুনা করেছেন তারা জানেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তথা বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, গেম থিওরি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে।

---

[292] Heinz R. Pagels, The Dreams of Reason: The Computer and the Rise of the Sciences of Complexity, Bantam, 1989; অনুবাদের কিয়দংশ অপার্থিব জামান, বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব, বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়, মুক্তমনা ই-বুক।

প্রথমে কোনো দ্রব্যের মনোপলি বাজার থাকলে দ্রব্য প্রস্তুতকারীর একচেটিয়া মুনাফা থাকে। দ্রব্যের দামও হয়তো বসাতে পারে ইচ্ছেমতো। কিন্তু একটা সময় পরে অন্য প্রতিযোগীরাও একই দ্রব্য তৈরিতে নেমে পড়লে কারো একতরফা মুনাফা থাকে না। দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় গেম থিওরির মাধ্যমে বোঝাপড়ার নিরিখে। আবার কোনো ব্যবসায়ী একই দ্রব্য কমদামে বিক্রি শুরু করলে তার সাময়িকভাবে লাভ হয় বটে, কিন্তু তার অন্য প্রতিযোগীরাও সাথে সাথেই দাম কমিয়ে ফেললে তার আখেরে অনেক লোকসানই হবে। তাই শেষমেষ নিজেদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়ার মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া শুরু করে। স্বার্থপরতা আর পরার্থিতাও ঠিক একইভাবে কাজ করে। তারা মিলেমিশে এক হয়ে থাকে ক্রীড়াতত্ত্বের দড়ি টানাটানির মাঝখানে। চীনের অধিবাসীদের অনেকেই ইন এবং অ্যান (Yin and yang) নামক দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিতে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে মানুষসহ সবকিছুই আসলে ইন এবং অ্যান-এর সুষম মিশ্রণ। শুধু চীনারা কেন, আমরাও ছোটবেলায় স্কুলে ভাব সম্প্রসারণ করতে গিয়ে শিখেছিলাম—“শুভ’র জন্যই অশুভ’র দরকার”, কিংবা “আলোর জন্যই অন্ধকারের প্রয়োজন”। নিরঙ্কুশ সত্যবাদী সমাজ তৈরির মতো প্রদীপ জ্বেলে আঁধার দূর করার চেষ্টা হলেও দেখা যায় প্রদীপের নীচেই থেকে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। ঠিক একইভাবে বলা যায়, আমরা পরার্থিতার যতই বিজয় কেতন উড়াই না কেন, স্বার্থপরতাকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। প্রদীপের অন্ধকারের মতোই তা নীচের স্তরে থেকে যাবে। কারণ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পরার্থিতার মূল উৎস আসলে স্বার্থপর জিনের উপস্থিতির কারণেই। ক্রীড়াতত্ত্বের আধুনিক মডেলগুলো যেন তারই বাস্তব প্রতিধ্বনি। সেজন্যই ম্যাট রিডলী তার ‘নৈতিকতার উদ্ভব’ বইয়ে বলেন[293]—

> Cooperation was first used, not for virtuous reasons, but as a tool to achieve selfish results. And if we are to celebrate the unusually cooperative result of the societies, we must first recognize the base

[293] Matt Ridley, The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation, Penguin; 1998

metal from which it was forged.

এই স্বার্থপরতার উপস্থিতির কারণেই কীভাবে পরার্থিতার উদ্ভব ঘটে তা আরও স্পষ্ট হবে নীচের কিছু উদাহরণে।

ইট-পাটকেল এবং পিঠ চুলকোচুলকির খেলা

জীবজগতে গেম থিওরি এবং বিবর্তনীয় স্থিতিশীল তত্ত্ব কীভাবে কাজ করে তা না হয় জানা গেল। কিন্তু একটি জীব কী করে বুঝবে কখন তাকে স্বার্থপর হতে হবে, আর কখন পরার্থ? কীভাবে বুঝবে কখন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সাজতে হবে, আর কখন হতে হবে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ? এর উত্তর পাওয়া গেছে দুই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী রবার্ট এক্সেলরড (Robert Axelrod) এবং রবার্ট ট্রাইভার্স (Robert Trivers)-এর পৃথক দুটি গবেষণায়। দুজন বিজ্ঞানী আলাদা দুটি তত্ত্ব দিয়েছেন। নামে আলাদা হলেও তত্ত্বের বিষয়বস্তু মোটামুটি একই। তুমি আমার পিঠটি চুলকালে আমিও এক সময় তোমার পিঠটি চুলকে দিব। আর তুমি ইট মারলে আমিও দেব পাটকেলটি মেরে। কাজেই বাপু যা করবে বুঝে করো। এই হলো তত্ত্ব দুটির মোদ্দা কথা।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে এই তত্ত্বের ইংরেজি 'টিট ফর ট্যাট' (Tit for tat)। এটি দিয়েছেন এক্সেলরড। আর রবার্ট ট্রাইভার্সের 'পিঠ চুলকোচুলকি' সংক্রান্ত তত্ত্বের নাম বিনিময়ী পরার্থিতা (Reciprocal Altruism)। দুটি তত্ত্বই ইঙ্গিত করছে—অতীতে আমার প্রতি তুমি কী আচরণ করেছ সেটা মনে করে আমি তোমার প্রতি আচরণ করব। ভালো আচরণ করে থাকলে আমার থেকেও ভালো আচরণ পাবে, আর ঝামেলা করে থাকলে আমার দিক থেকেও তাই পাবে। কাজ কর্মে এক হলেও তত্ত্ব দুটিতে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য থেকে গেছে। টিট ফর ট্যাট ঘটে একই প্রজাতিতে। এক ভার্ভেট বানর ক্ষিদার সময় আরেক বানরকে কলা দিলে, সেই

বানরও পরবর্তীতে কলা দিয়ে প্রথম বানরকে সাহায্য করবে। শিকারিদের দ্বারা আক্রান্ত হবার মুহূর্তে কোনো পরোপকারী বানর বন্ধু যদি চিৎকার করে সতর্ক করে দেয়, তবে পরোপকারী বানরটি কখনো বিপদে পড়লেও ঠিক একইভাবে সেই আক্রান্ত বানরটি চিৎকার করে তাকে বিপদে সাহায্য করবে। *টিট ফর ট্যাট* বিদ্যমান থাকে একই প্রজাতির মধ্যে। বানর কেবল চিৎকার করে সতর্ক করবে আরেকটি বানর বিপদে পড়লেই, কোনো খরগোশ বিপদে পড়লে নয়। আর তাদের সাহায্যের ধরনও একই ধরনের হবে। কলার বিনিময়ে কলা, কিংবা চীৎকারের বিনিময়ে চিৎকার। অন্য কিছু নয়। কিন্তু অন্য দিকে রেসিপ্রোকাল অলট্রুইজম বা বিনিময়ী পরার্থিতার ক্ষেত্রে পরার্থিতা প্রজাতির স্তর অতিক্রম করে যায়। এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিকে সহায়তা করে। আমরা আগে আমরা আগে ক্লাউন মাছ আর এনিমোন, হামিং বার্ডের সাথে অর্নিথোপথিলাস ফুলের, কিংবা এংরাকোয়িড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবরতনের উদাহরণের সাথে পরিচিত হয়েছি যেগুলো প্রজাতির স্তর অতিক্রম করে পরার্থিতার বিকাশ ঘটিয়েছে। সাহায্যের ধরনও ভিন্ন হতে পারে। আমি পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীকে পায়েশ পাঠালে, প্রতিবেশীও যে পায়েশই পাঠাবে তা নয়, হয়তো ঈদের দিন পাঠাবে কোরমা এই ধরনের!

ইট-পাটকেল তথা টিট ফর ট্যাট তত্ত্বের উদ্ভবটা বেশ মজার। আশির দশকের প্রথমভাগে কম্পিউটারের শক্তি বাড়তে শুরু করেছে হু-হু করে। পার্সোনাল কম্পিউটারও বাজারে আসতে শুরু করেছে। এই সময় রবার্ট এক্সেলরড নামের এক তরুণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর শখ হলো কম্পিউটারের সাহায্যে আসামির সঙ্কটের একটা সিমুলেশন পরীক্ষা করবেন। তিনি একটি মজার প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন যেখানে প্রতিযোগীরা আসামির সংকট সমাধানের জন্য একটা ভালো এলগরিদম সাবমিট করবে। প্রায় দুশবার একে অপরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে খেলা চলবে। এর মধ্যে যার পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি হবে সেই এলগোরিদমই বিবেচিত হবে শ্রেষ্ঠ হিসেবে। চৌদ্দজন প্রতিযোগী সেই প্রোগ্রামিংয়ের খেলায় অংশ নেন তারা সহজ সরল থেকে

শুরু করে বিভিন্ন জটিল জটিল এলগোরিদম সাবমিট করলেন। এনাতল র‍্যাপোট© (Anatol Rapoport) নামে এক তরুণ প্রোগ্রামারের এলগোরিদম সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে জয়লাভ করল আর সেই প্রোগ্রামের স্ট্র্যাটিজি ছিল সবচেয়ে সরল সেই টিট ফর ট্যাট। প্রথমে সহযোগিতা করে সে খেলা শুরু করবে, আর মনে রাখবে তার প্রতিপক্ষ ঠিক কি করেছিল তার সাথে সহযোগিতা নাকি বিরোধিতা। প্রতিপক্ষ সহযোগিতা করে থাকলে সেও সহযোগিতা করবে, আর বিরোধিতা করলে সেও করবে বিরোধিতা। এভাবেই এগুতে থাকবে। এভাবেই সে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট অর্জন করে প্রথম স্থানে পৌঁছে গেল। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বেরিয়ে এল যে, টিট ফর ট্যাট বা ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় এটিই আসামির সংকট মোকাবেলার জন্য সর্বোত্তম সমাধান।

কয়েক বছর পরে রবার্ট এক্সেলরড আবারো আরেকটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করলেন টিট ফর ট্যাট আলগোরিদমকে কেউ হারাতে পারে কি না সেটা পুনর্বার পরীক্ষা করার জন্য। এবারেও শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে রইলো সেই আদি অকৃত্রিম টিট ফর ট্যাট! তিনি ১৯৮১ সালে বিষয়টি ফোকাস করে হ্যামিলটনের সাথে মিলে সায়েন্স পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন ‘দ্য ইভোলুশন অব কোঅপারেশন’ নামে[294], এবং বছরখানেক পরে একটি বই লেখেন সেই একই শিরোনামে[295]। এভাবেই টিট ফর ট্যাট অ্যালগরিদম বিবর্তনীয় গেম থিওরির এক রাজকীয় স্থান অধিকার করে নিল।

রক্তচোষা বাদুড়দের কথা

খাতায় কলমে আর কম্পিউটার সিমুলেশনে না হয় ইট-পাটকেল তথা টিট ফর ট্যাট এক বাস্তব সমাধান হিসেবে হাজির হলো, কিন্তু কথা হচ্ছে প্রকৃতিতে কি আসলেই ইট-পাটকেল কিংবা বিনিময়ী পরার্থিতার প্রয়োগ দেখা যায়, নাকি এগুলো কেবলই

[294] Axelrod, Robert; Hamilton, William D, "The Evolution of Cooperation", Science 211: 1390–96, 1981
[295] Axelrod, Robert, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984

কিছু আঁতেলেকচুয়াল বিজ্ঞানীদের অলস মস্তিষ্কের প্যাচপ্যাচানি?

এর উত্তর পাওয়া গেল ১৯৮৩ সালে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় নিয়ে জীববিজ্ঞানী গেরাল্ড উইলকিনসনের (Gerald Wilkinson) একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়। ভদ্রলোক কোস্টারিকায় এই বাদুড়দের নিয়ে অনেকদিন ধরেই রিসার্চ করছিলেন। এই সমস্ত বাদুড়েরা খুবই অদ্ভুত। বাদুড়দের অন্য প্রজাতিদের মতো এদের ফলমূলে কোনো রুচি নেই। এদের আহার হলো কেবল তাজা রক্ত। এরা গাছের ডালে ঝুলে থাকে আর অপেক্ষা করে থাকে কোনো ঘুমন্ত স্তন্যপায়ী জীবের গা থেকে রক্তপানের জন্য। তারপর গভীর রাত্রিতে বের হয় শিকারের সন্ধানে। নিঃসন্দেহে এভাবে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারটি বাদুড়দের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আর বহুসময়ই তারা পর্যাপ্ত আহার যোগাড় করতে পারে না। কারণটি বোঝা কঠিন কিছু নয়। খাবার মানে রক্ত সংগ্রহের জন্য শিকারকে জায়গা মতো পেতে তো হবে, আর যার দেহ থেকে রক্ত যোগাড় করতে যাচ্ছে, সেই বা রাজি থাকবে কেন। টের পেয়ে বাধা দিলে তো আর রক্ত খাবার উপায় নেই। জান নিয়ে পালানোটাই তখন বুদ্ধিমানের কাজ। সেজন্য দেখা যায় এই বাদুড়েরা অনেক সময়ই দুই তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত থেকে যায় কোনো কিছু যোগাড় না করতে পেরে। পঞ্চাশ-ষাট ঘণ্টা না খেয়ে থাকার পর তাদের বাদুড়দের কী অবস্থা হয় তা বোধহয় সহজেই অনুমেয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটা রাস্তা তারা নিজেরাই বাতলে নিয়েছে। তারা যখন খাবার পায় তখন তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে নেয়। রক্ত খেয়ে একেবারে পেট ফুলিয়ে বসে থাকে। কিন্তু পেট ফুলায় এমনি এমনি না। তারা গোত্রের অভুক্ত বাদুড়দের রক্ত খাইয়ে সাহায্য করে। তারা পরার্থতা প্রদর্শন করে সমগোত্রীয়দের প্রতি। তারা এই পরার্থতাপরায়ণ সামাজিক আচরণের মাধ্যমেই সফলভাবে টিকে থাকে।

মজার ব্যাপার হলো বাদুড়দের সবাই যে নিঃস্বার্থ তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে

অনেকে পেট ফুলিয়ে রক্ত খাওয়ার পরেও এমন ভান করে যে সে খায়নি। পরার্থপরায়ণ এই বাদুড় সমাজে কোনো বাদুড়কে যদি বিপদের সময় কাউকে রক্তপান না করাতে হয়, কিন্তু নিজে বিপদে পড়লে যদি কেউ না কেউ তাকে খেতে দেয়, তাহলে সে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। আবার অন্যদিকে এমন যদি হয় যে কোনো বাদুড় কারো বিপদের সময় অন্যকে রক্ত খাইয়ে সাহায্য করছে, কিন্তু নিজের বিপদে কেউ তাকে খাওয়াতে এগিয়ে আসছে না তা হলে সে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।



চিত্র: ভ্যাম্পায়ার বাদুড় নিয়ে জীববিজ্ঞানী গেরাল্ড উইলকিনসনের গবেষণায় দেখা গেছে যে, তারা ইট-পাটকেল আর বিনিময়ী পরার্থতাপরায়ণতা প্রদর্শন করে একে অন্যকে সাহায্য করে।

এই ডাইনামিক্স এর ধরনটা আসামির সংকটের আলোকে বুঝার চেষ্টা করা যাক। নিঃসন্দেহে কোনো বাদুড়ই চাইবে না ক্ষতির বোঝা বাড়াতে, বরং বাদুড় সমাজে 'অতি চালাক' এমন কেউ না কেউ থাকবে যে ধোঁকাবাজি করে সবচেয়ে বেশি

লাভবান থাকতে চাইবে। অর্থাৎ এ সমস্ত বাদুড়েরা রক্ত খেয়ে এসে মুখ টুখ মুছে এমনভাবে চলাফেরা করবে যে তারা রক্ত খায়নি; ফলে অন্য কাউকে তার রক্ত খাওয়াতে হবে না। সত্যই এরকম কিছু বাদুড় দেখা যায় গোত্রে। যারা চালাকি করে প্রতারণার পথ নেয়। কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়তে সময় লাগে না। তার ফোলা পেটের ধরন দেখেই অন্য অভিজ্ঞ বাদুড় সদস্যদের কেউ কেউ বুঝে ফেলে ব্যাটা 'সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়'। ফলে তাকে একঘরে করে ফেলা হয়, কেউ তাকে তার বিপদের সময় রক্ত খেতে দিয়ে সাহায্য করে না। মূলত বাদুড়েরা তাদের নিজেদের মধ্যে খেলতে থাকে 'ইট-পাটকেল' বা 'টিট-ফর ট্যাট'-এর মায়াবি খেলা কেউ তাকে রক্ত খেতে দিলে সেও তার বিপদে নিজের ভাগের রক্ত খেতে দেয়। কিন্তু কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সেও প্রত্যাখ্যান করে। এভাবেই ইট-পাটকেল এবং বিনিময়ী পরার্থিতা নীতি বাদুড় সমাজে রাজত্ব করে চলে অত্যন্ত সফলভাবে[296]।

এই সমস্ত রক্তচোষা বাদুড়দের মতো আফ্রিকান ভার্ভেট বানরদের মধ্যেও কিন্তু বিনিময়ী পরার্থতা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেও বানর সদস্যরা টিট ফর ট্যাটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় অপর বানরকে সাহায্য করা হবে নাকি প্রতাখ্যান করা হবে। যদি অতীতে সাহায্য পেয়ে থাকে কারো কাছ থেকে, বিপদের সময় তাকে সাহায্য করে। আর যদি উল্টোভাবে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে বিপদের সময় তাকেও কাঁচকলা দেখিয়ে দেয়া হয়। এই ইট-পাটকেলের পাশাপাশি স্বজাতি নির্বাচনও খুব জোড়ালোভাবে কাজ করে ভার্ভেট বানরদের মধ্যে। শুধু জোড়ালো বললে ভুল হবে, স্বজাতি নির্বাচনের সম্পর্ক অনেক সময় ছাপিয়ে যায় ইট-পাটকেল এবং বিনিময়ী পরার্থপরায়ণতাকেও। যেমন, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, দুই বানরের মধ্যে যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে তাহলে অতীতে সাহায্য পাক না পাক, তার বিপদে অন্য সদস্য সাহায্য করে। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক ছাড়িয়ে যায় ইট-পাটকেলের খেলাকে। মা বানর তার শিশু বিপদে পড়লে এমনিতেই সাহায্য করে, কোনো কিছুর বিনিময়ের দাবিতে নয়।

[296] Gerald S. Wilkinson, Reciprocal food sharing in the vampire bat, Nature, 308, 181 – 184, 1984

ঠিক একই ব্যাপার ঘটে ভাই বোনদের মধ্যেও। কিন্তু রক্তের সম্পর্কের বাইরে কাউকে সাহায্য সহযোগিতার প্রশ্ন আসলে সেই ইট-পাটকেলেরই শরণাপন্ন হয় সবাই। সাধে কি আর বলে Blood is thicker than water!

ভ্যাম্পায়ার বাদুড় আর ভার্ভেট বানরের ক্ষেত্রে যা দেখা গেল সেরকম ব্যাপার তো মানুষের জন্যও খাটে, তাই না? বিপদের সময় কারো কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকলে আমরাও প্রাণপণে সেটা শোধ করে দিতে চেষ্টা করি। আর বিশ্বাসঘাতক কিংবা কৃতঘ্ন লোকজনকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। এ ধরনের লোককে অনেকসময় সামাজিকভাবেও একঘরে করে ফেলা হয়। এটা কিন্তু ঘুরেফিরে উপরের টিট ফর ট্যাট আর রেসিপ্রোকাল অল্ট্রুইজমেরই প্রতিফলন। আবার, ভার্ভেট বানরদের মতো মানবসমাজেও দেখা যায় এই টিট ফর ট্যাট নীতিকে বহু সময়ই অতিক্রম করে যায় স্বজাতি নির্বাচন তথা রক্তের সম্পর্ক। ছেলে মেয়ে বিপদে পড়লে 'রক্তের টান'ই মুখ্য হয়ে উঠে ইট-পাটকেলের চেয়ে। বিপদ থেকে সন্তানকে রক্ষার চিন্তাই প্রাধান্য পায় তখন। অর্থাৎ, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভার্ভেট বানরের মধ্যে স্বজাতি নির্বাচনের সম্পর্ক যেভাবে অনেক সময় ছাপিয়ে যায় ইট-পাটকেল এবং বিনিময়ী পরার্থপরায়ণতাকে, ঠিক সে ধরনের প্যাটার্ন কাজ করে মানবসমাজেও।

বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন, ইট-পাটকেল আর বিনিময়ী পরার্থতার খেলা ভালো জমে যদি সদস্যরা খুব 'ক্লোজড কমিউনিটি'তে বাস করে। ভার্ভেট বানরেরা আর ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরা দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় বাস করে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই তাদের মধ্যে সহজাতভাবেই এক ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ব্যাপারটা মানবসমাজের জন্যও ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা প্রায় সময়ই অনেকের মুখেই বলতে শুনি যে, শহরের লোকেরা অনেক বাটপার, তার তুলনায় গ্রামের লোকেরা অনেক ভালো সহজ-সরল। আসলে এটার কারণ হলো, গ্রামের লোকেরা একটা ক্লোজড কমিউনিটিতে বাস করে। সেখানে সবাই সবাইকে চেনে, আর প্রায়ই হাটে-মাঠে একে অপরের সাথে দেখা হয়ে যায়। ফলে কারো পক্ষে

বাটপারি কিংবা চুরিচামারি করে খুব বেশি সুবিধা সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঢাকা শহরের মতো জায়গায় যেখানে লক্ষ লোকের বাস, সেখানে একজন বাটপার জানে যে, আজকে বাসে একটি অপরিচিত লোকের পকেট মেরে দিলে পরের দিন তার সাথে দেখা হবার সম্ভাবনা একেবারেই কম। তাই গ্রামের চেয়ে শহরে ছিনতাইকারী, পকেটমার, চোর ছ্যাচর বেশি দেখা যায়, মানুষ আক্রান্তও হয় তুলনামুলক বেশি। এটাও ক্রীড়াতত্ত্বের সিমুলেশনেরই একটি বাস্তব ফলাফল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এক্সেলরড তার 'সহযোগিতার বিবর্তন' বইয়ে টিট ফর ট্যাটের একটি বাস্তব উদাহরণ হাজির করছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়াম দখল করে নেয়। স্বভাবতই পশ্চিমা শক্তি (western front) আর মধ্যশক্তির (Central Powers) মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ আর সংঘাত। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও একটা সময় পরে দেখা গেল, রেলজিয়ামের একটি পরিখার দুই পাশে জার্মান সৈন্য আর পশ্চিমা শক্তির (ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম) কিছু ট্রুপের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা আগের কিছু উদাহরণে দেখেছি যে, দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় বাস করতে থাকলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতার পাশাপাশি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আসামির সংকট থেকে উদ্ভূত টিট ফর ট্যাটের কারণেই এটি ঘটে। রবার্ট এক্সেলর্ডের মতে, ঠিক একই কারণে বেলজিয়ামের একটি পরিখার দুই পাশে অবস্থিত দুই বিরোধীপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক ধরনের সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কারণ একই জায়গায় দুই দলের সৈন্যদের একই ট্রুপকে বেশ কয়েকবার একে অপরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রাথমিক সময়গুলোতে সংঘাত আর সংঘর্ষ চললেও একটা সময় পরে গেম থিওরির নিয়মেই 'আসামির সংকটের' মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তারা পারতপক্ষে শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতো না, অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রমণ করে জয়লাভের চেষ্টা করত না, কিংবা যত কম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখা যায়, তার সর্বাত্মক চেষ্টা করত। বিনিময়ে তারা প্রত্যাশা করত যে

শত্রুপক্ষও প্রতিদানে তাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল যে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছিল। এমনি শত্রুপক্ষ খুব সহজ নিশানায় কাউকে পাওয়ার পরেও গুলি করেনি কিংবা ভুল দিকে গুলি ছুঁড়েছে—এমন দৃষ্টান্তও আছে। টনি এশওয়ার্থ সহ অনেক ইতিহাসবিদই ব্যতিক্রমী ব্যাপারটি উল্লেখ করে বই লিখেছেন। স্বার্থের কারণে ঘোর শত্রুদের মধ্যে আপাত সমঝোতার ব্যাপার কিন্তু রণক্ষেত্রের ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। এমনি একটি উদাহরণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটা 'মলোটোভ-রিবেন্ট্রোপ' চুক্তি (কমিউনাৎসি চুক্তি হিসেবে কুখ্যাত), যার ফলশ্রুতিতে হিটলারের নাৎসি জার্মানি আর স্ট্যালিনিস্ট রাশিয়ার মধ্যে একধরনের সমঝোতা স্থাপিত হয়। এই সমঝোতার ফলশ্রুতিতে নাৎসি জার্মান সৈন্যরা পোল্যান্ডের একাংশ নিরাপদে অধিকার করে নেয়, আর অন্য অংশ স্ট্যালিনিস্ট রাশিয়া দ্বারা অধিকৃত হয়। পিসা, নারেভ, ভিস্টুলা আর সান নদীর অববাহিকার কিয়দংশ রাশিয়ার ভাগে পড়ে, আর পশ্চিমাংশ থাকে জার্মানির পদতলে। জার্মানি ফ্রান্স অধিকার করে নেয়, লিথুনিয়া এবং পশ্চিম প্রুসিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে, আর অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া থাবা বসায় পূর্ব ফিনিল্যান্ড, এস্টোনিয়া আর লাটভিয়ার উপর। নিঃসন্দেহে মানবেতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বার্থপর সহযোগিতার (কিংবা সঠিকভাবে বললে দুই স্বার্থপর রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যকার সহযোগিতা) নির্জলা সত্য এটি। মানুষের জন্য 'স্বার্থপর সহযোগিতার' ব্যাপারটি আমাদের অনেকের মধ্যেই অস্বস্তি তৈরি করলেও জীবজগতে এ ধরনের সহযোগিতার উদাহরণই দৃশ্যমান। বেবুনদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, দুই পুরুষ বেবুনের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে নারী বেবুনের দখল নিতে গিয়ে অপর কোনো শক্তিশালী বেবুনকে বিতাড়িত করতে[297]। এই সহযোগিতার চুক্তি অনেকটা 'মলোটোভ-রিবেন্ট্রোপ' চুক্তির মতোই হয় সাময়িক[298]। হিটলার যেমন চুক্তি ভেঙে এক সময় সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ঠিক তেমনি বেবুন

297 Craig Packer, Reciprocal Altruism In Olive Baboon, Nature, 265: 441-3

298 R Noë, Alliance formation among male baboons: shopping for profitable partners. In: Harcourt AH, de Waal FBM, editors. Coalitions and alliances in humans and other animals. Oxford: Oxford University Press. pp. 285–321, 1992

সমাজেও শক্তিশালী বেবুনটি বিতারিত হবার পরে চুক্তি ভেঙে শুরু হয় সহযোগী দুই বেবুনের মধ্যে প্রতিযোগিতা-কে সবার আগে নারী বেবুনটির দখল নিতে পারে! একই ধরনের স্ট্র্যাটিজি বিজ্ঞানীরা প্রবলভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন বটলনেক ডলফিনদের মধ্যেও[299]। চুক্তির কথা না হয় বাদ দেই, আমরা যে সহবিবর্তন এবং মিথোজীবীতার উদাহরণগুলো জানি—যেমন, শিকারি মাছদের থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউন মাছদের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন, হামিং বার্ডের সাথে অর্নিথোপথিলাস ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোয়িড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন সেগুলো কিন্তু সবই প্রকারন্তরে স্বার্থপর সহযোগিতারই উদাহরণ। আসলে এ ব্যাপারগুলো প্রকৃতিতে এতোই স্পষ্ট যে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তার 'আনউইভিং দ্য রেইনবো'বইয়ের নবম অধ্যায়ের শিরোনামই দিয়েছেন—স্বার্থপর সহযোগী (The selfish cooperator)। তিনি পুরো ব্যাপারটিকে দেখেছেন অনেকটা এভাবে[300] —

> আমি বরাবরই মনে করেছি যে, জীবজগতের প্রকৃতি বহুলাংশেই পরার্থপরায়ণ, সহযোগিতাপ্রবণ, এমনি অনেক-সময় আবেগপ্রবণও। এগুলো কিন্তু তাদের স্বার্থপর জেনেটিক স্তর থেকেই উদ্ভূত হয়। প্রাণীরা কখনো খুব ভালো (পরার্থ), আবার কখনো খুবই খারাপ (স্বার্থপর)আচরণ করে, আর কখন কোনটা করবে তা নির্ধারিত হয় জেনেটিক স্তরে সর্বোচ্চ হিস্যা আদায়ের নিরিখে। ...প্রাণিজগতে পরার্থতা আসলে একটি সুচারু মাধ্যম যার ফলশ্রুতিতে অতলস্পর্শী জিনগুলো নিজ নিজ স্বার্থ সর্বোত্তম উপায়ে চরিতার্থ করতে পারে।

যৌনতা, যৌনতার নির্বাচন এবং পরার্থিতা

আমাদের বিবর্তনীয় যাত্রাপথের খুব কাছের আত্মীয় শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন গবেষকেরা। তারা দেখলেন

[299] R.C. Connor, R.A. Smolker, and A.F. Richards, Dolphin alliances and coalitions. In A.H. Harcourt and F.B.M. de Waal (Eds.), Coalitions and alliances in animals and humans (pp. 415-443). New York: Oxford University Press, 1992.

[300] Richard dawkins, Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder, Mariner Books; First Edition edition, 2000

শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও সহযোগিতা দৃশ্যমান, কিন্তু সেটার পেছনে কাজ করে এক ধরনের যৌনাভিলাস। শিম্পাঞ্জিরা শিকার করে, কিন্তু অনেক সময়ই সেই শিকার নিজেদের বা গোত্রের পুষ্টির জন্য নয়, বরং নারীদের আকর্ষণ করে যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত করার জন্য।

ধরা যাক একদল শিম্পাঞ্জি জঙ্গলে ঘুরতে ফিরতে গিয়ে কলোবাস বানরদের একটা দলের দেখা পেলো। অনেক সময় তারা কলোবাসদের আক্রমণ করে, কখনো বা আবার করে না। আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই নির্ভর করে দলে নারী শিম্পাঞ্জিদের উপস্থিতি এবং আধিক্যের উপর। দলে কোনো যৌনান্মুখ শিম্পাঞ্জি (swollen female chimp) থাকলে নির্ঘাত আক্রমণের সূচনা ঘটে। দক্ষ শিকারিরা সফল অভিযানের পর সাথে করে মাংস নিয়ে আসে সেই সব যৌনান্মুখ নারী শিম্পাঞ্জির জন্য। দেখা গেছে নারী শিম্পাঞ্জিরা সেই সব পুরুষদের প্রতিই থাকে উদার যারা মাংসের ব্যাপারে কোনো কৃপণতা করে না।

ব্যাপারটা কি মানবসমাজের জন্যও প্রযোজ্য? বলা মুশকিল। মাংসের জন্য না হলেও অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিক্রির পেশা যে মানবসমাজে আছে, তা সবারই জানা। শিম্পাঞ্জিদের সমাজে যৌনতার বিপননের মাধ্যম মাংস, মানবসমাজে অর্থ কড়ি। এখন, আদিম মানবসমাজে নৈতিকতার উদ্ভবের পেছনে এ ধরনের কোনো ধরনের যৌনাভিলাস কাজ করেছিল কি না সেটা পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা কিছু আদিম ট্রাইবে গবেষণাকাজ চালিয়েছেন। তাঞ্জানিয়ার অদূরে হাডজা (Hadza) নামে একটি ট্রাইবে গবেষণা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই হাডজা মানুষেরা এখনও শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে জীবনযাপন করে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সেখানে যে সব পুরুষেরা শিকারে অধিকতর দক্ষ হয়, তারা আবার একই সাথে বহু নারীর প্রণয় অর্জনে সক্ষম হয়।

মনোবিজ্ঞানী জিওফ্রি মিলার তার ‘সঙ্গমী মন’ বইয়ে[301] এবং একটি গবেষণাপত্রে[302] সম্প্রতি প্রস্তাব করেছেন যে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের মতো গুণাবলিগুলো আসলে যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে মানবসমাজে বিকশিত হয়েছিল। ব্যাপারগুলো ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। সততা, দয়া, মমতা এবং সহমর্মিতার মতো গুণগুলো জাতি, লিঙ্গ এবং সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষের কাছে আদৃত। আমরা বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে ডেভিড বাসের বিখ্যাত গবেষণার কথা জেনেছি। সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩৭ টি দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে ছেলে এবং মেয়েদের পছন্দের উপর জরিপ চালিয়েছিলেন তিনি[303]। সেই গবেষণায় নারী-পুরুষ—দুই লিঙ্গের কাছেই যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে তা হলো দয়া। অর্থাৎ, পছন্দের তালিকায় দয়ার স্থান বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্যসহ অন্যান্য সব কিছুর উপরে। এটা হতেই পারে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের এই দয়া, মমতা, বিশ্বস্ততার মতো গুণগুলো ছিল তারাই খুব বেশি করে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, এবং তারাই অধিক হারে এ পৃথিবীতে সন্তানসন্ততি রেখে গেছে। সেজন্যই এখনও যে কোনো সমাজেই দেখা যাবে ভালো মানুষের সংখ্যাই বেশি—যারা অন্য মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি সংবেদনশীল এবং সহানুভূতিশীল; চোরছ্যাচোড়, গুণ্ডা, বদমায়েশ এবং স্বার্থপরদের সংখ্যাই সমাজে তুলনামূলকভাবে কম থাকে, এবং এ ধরনের লোকজনকে সাধারণত কেউই সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করতে চায় না।

মরাল ল্যান্ডস্কেপ

একটা সময়ে ধর্মবাদীরা একচেটিয়াভাবে নৈতিকতার উৎসের জন্য ধর্ম এবং ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তারা বহুকাল ধরেই নৈতিকতার পুরো

---

301 Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature, Anchor, 2001

302 Geoffrey Miller, Sexual Selection for Moral Virtues, The Quarterly Review of Biology, 82(2) : 2007

303 D.M. Buss, Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49, 1989.

ব্যাপারটাকে ঈশ্বরিক প্রলেপ লাগিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং দাবি করেছেন (এবং এখনও অনেকে করেন) যে, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবের মতো ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলোর কোনো জৈবিক ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়নি মোটেই, বরং জৈবিক উৎস তথা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে পরার্থিতা কিংবা সহযোগিতার মতো ব্যাপারগুলো প্রাণিজগতে উদ্ভূত হয়েছে—এটা যখন থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই ব্যাপারগুলো বরং অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে।

শুধু ধার্মিকেরাই নয়, অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও ধার্মিকদের মতো একই ফাঁদে পা দিয়ে বলেন, মানবসমাজের নৈতিকতা ভিন্ন। বিবর্তন দিয়ে এটিকে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। এরাও আসলে ধার্মিকদের মতোই অবচেতন মনে ধরে নেন যে, মানুষ আসলে অন্যান্য প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা, যেন স্বর্গীয় কোনো সৃষ্টি! কিন্তু এটি তো ঠিক নয়। মানুষ তো শেষ বিচারে এই জীবজগতেরই অংশ। অন্য প্রাণীতে পরার্থিতা আর নৈতিকতা যে জৈবিক নিয়মে উদ্ভূত হয়েছে, মানুষের মধ্যেও সেই একই উৎসই কাজ করছে, তা এখন শুনতে যতই অস্বাভাবিক লাগুক না কেন। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, মানবসমাজ অনেক জটিল। কিন্তু সেই জটিলতা ব্যাখ্যার জন্য জীববিজ্ঞানকে বাদ দেয়ার দরকার নেই। পিঁপড়ে, মৌমাছি কিংবা ডলফিনদের সমাজও জটিল। জটিল শিম্পাঞ্জিদের সমাজও। তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন জটিল সোশাল স্ট্রাকচার আছে। সেগুলো বিজ্ঞানীরা জৈববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেই বিশ্লেষণ করে চলেছেন। মানবসমাজের বিবিধ জটিলতার উৎসের কারণে নৈতিকতার স্তরে যে পার্থক্যগুলো আছে তা বিভিন্নভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় স্বর্গীয় উৎস সরিয়ে রেখে। সম্প্রতি (২০১০ সালে প্রকাশিত) স্যাম হ্যারিস একটি চমৎকার বই লিখেছেন 'দ্য মরাল ল্যান্ডস্কেপ' শিরোনামে[304]। বইটিতে হ্যারিস দাবি করেছেন যে, নৈতিকতা নিয়ে

[304] Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, Free Press, 2010

সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো আসলে বিজ্ঞানের একটি 'অবিকশিত শাখা' (undeveloped branch of science)-এর অংশ। তাই নৈতিকতার ঔচিত্য কিংবা অনুচিত্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এখন বিজ্ঞানের কাঁধেই থাকা উচিত, অশিক্ষিত মোল্লা-পাদ্রী-পুরুতদের কাঁধে নয়। তিনি বলেন,

> বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা প্রতিদিনই জানতে পারছি কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক, কোনটা মানবিক, কোনটা অমানবিক, কোনটা পরিবেশ সম্মত কিংবা কোনটা স্বাস্থ্যসম্মত। শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ভালো বাণী থেকে উঠে আসা মূল্যবোধের চেয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া নৈতিকতাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ...পৃথিবীতে যেমন খ্রীষ্টান পদার্থবিদ্যা কিংবা মুসলিম বীজগণিত বলে কিছু নেই ঠিক তেমনি মুসলিম নৈতিকতা কিংবা খ্রীষ্টান নৈতিকতা বলাটাও হাস্যকর। আমি দাবি করব, নৈতিকতার গবেষণা বিজ্ঞানেরই অংশ, বিজ্ঞানের এক অবিকশিত শাখা এটি।

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে[305]। এমনকি ডারউইন নিজেও সে সময় জেনেটিক্সের কোনো জ্ঞান ছাড়াই কেবল জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে সহযোগিতা এবং পরার্থতার বিবর্তনীয় উপযোগিতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদেরা বহুভাবে দেখিয়েছেন যে এই ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপ্রায়ণতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর

---

305 সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষনাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়:

* Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985
* Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987
* Robert Wright, The Moral Animal : Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995
* Frans B. M. de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1997
* Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature, State University of New York Press, 1998
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality : Cross-Disciplinary Perspectives, Imprint Academic, 2000
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University Press, 2004 ইত্যাদি

মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানবসমাজে এসে আরও বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। গবেষক এলিয়ট সোবার তার একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন[306],

> যদি আমরা বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও নৈতিকতার ব্যাপারগুলো চিন্তা করি, তারপরেও এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে বিবর্তন মানুষকে কেবল স্বার্থপর এবং অহঙ্কারী হিসেবে গড়ে তুলবে। বরং উল্টোভাবে এটা বরং খুবই সম্ভব যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তাদেরকেই বাড়তি উপযোগিতা দিয়েছিল যারা আত্মম্ভরী কিংবা স্বার্থপর না হয়ে গোত্রের মধ্যে সহযোগিতামূলক ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল।

আমরা অধ্যায়ের শুরুতে স্যামুয়েল বাওয়েলের বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে একটি মজার কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ গবেষণার উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে আবারো ফিরে যেতে হচ্ছে। বাওয়েলের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছিল যে, মূঢ় সহিংসতা থেকেই সম্ভবত একসময় জন্ম হয়েছে মূঢ় পরার্থিতার। এলিয়ট সোবারের মতো স্যামুয়েল বাওয়েলও মনে করেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে গোত্রের সদস্যরা অনেক বেশি নিজেদের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, তারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাঁকুনিতে তারাই টিকতে পেরেছে অন্যদের চেয়ে বেশি। কাজেই পরার্থিতার মতো অভিব্যক্তিগুলো সমাজে এক সময় না একসময় উদ্ভূত না হবার কোনো কারণ নেই। মানবসমাজে এটির উদ্ভবের পরে সেটার বিকাশ এবং বৃদ্ধি তো স্রেফ সময়ের ব্যাপার। সমাজে সুগুণের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা, দুর্বলদের রক্ষার জন্য এক সময় রাষ্ট্রের উদ্ভব, গণতান্ত্রিক আইনের প্রয়োগ, শিক্ষার প্রসার, নারী অধিকার, সাংস্কৃতিক অগ্রসরতা প্রভৃতি মানব নৈতিকতাকে ভিন্ন একটি মাত্রায় নিয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। আমাদের আধুনিক মূল্যবোধগুলো যে প্রতিদিনের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত এবং উৎসারিত, দার্শনিক পল কার্জের 'নিষিদ্ধ ফল: মানবিকতার মূল্যবোধ' গ্রন্থে এই মতের সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে[307]।

---

[306] E. Sober, 'Did Evolution Make us Psychological Egoists?', in his From A Biological Point of View, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
[307] Paul Kurtz, Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism, Prometheus Books, 1988

প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল শারমার মানবসমাজে মুল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভিব্যক্তি নিয়ে আলাদা করে ভেবেছেন এবং এ নিয়ে লিখেছেন। তিনি তার 'দ্য সায়েন্স অব গুড এন্ড এভিল' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে 'গোল্ডেন রুল' হিসেবে গ্রহণ করেছিল[308] :

Do unto others, as you would have them do unto you.

(অন্যদের প্রতি সেরকম ব্যবহারই করো যা তুমি তাদের থেকে পেতে চাও)

কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া কোনো সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলির চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় 'প্রোভিশনাল এথিক্স', যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে। আমরা এখনও মানবিকতার কষ্টিপাথরে নিজেদের মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছি। বিগত কয়েক শতকের সামাজিক বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধগুলোকে বাড়িয়ে নিতে পেরেছি বহুক্ষেত্রেই। এখন আর কালো মানুষদের দেখলে 'নিগ্রো' শব্দটি উচ্চারণ করি না, বাংলাদেশে 'উপজাতি'র বদলে লিখি 'পাহাড়ি জনগোষ্ঠি'। আমরা জীর্ণশীর্ণ পুরাতন মূল্যবোধগুলোকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে সেগুলোর সংস্কার করতে পেরেছি। সাড়া বিশ্বজুড়েই নারীবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধ কিংবা শিশু অধিকারের প্রতি দায়দায়িত্বও। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার-সচেতনতা, সমকামী এবং রূপান্তরকামীদের প্রতি সহমর্মিতাসহ অনেক মূল্যবোধই আজকে খুব ভালোভাবে চোখে পড়ে, যেগুলো কয়েক দশক আগেও ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। রিচার্ড

[308] Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004

ডকিন্স তার ‘গড ডিলুশন’ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘Natural Selection as a consciousness Raiser’ অংশে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আসলে ডারউইনীয় সিলেকশনের মতোই এক ধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের মূল্যবোধগুলোকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছি, ঠিক যেভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের ডারউইনীয় সিলেকশন প্রক্রিয়ায় সরল জীব থেকে উদ্ভূত হয়েছে জটিল জীবজগতের[309]। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ক্রমিক চর্চার মাধ্যমে জৈববৈজ্ঞানিক পথে আমরা প্রতিদিনই নিজেদের অগ্রসর করছি, জাগিয়ে তুলছি আমাদের সুপ্ত মানবতাবোধকে।

[309] Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006

অষ্টম অধ্যায়

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলেনি

আমি এ বইয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের নতুন বিজ্ঞানের শাখাটির সাথে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হতে পারলাম বলা মুশকিল। বিচারের ব্যাপারটা পাঠকদের কাছেই ছেড়ে দিতে চাই; তবে আমি যা করতে চেয়েছি তা হলো—আলোচনার একটা সূচনা। আর সেই আলোচনার সূত্র ধরেই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো পাঠকদের সামনে নিয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছি যথাসম্ভব নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছু কিছু ব্যাপার বিতর্কিত মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এখনও 'প্রমাণিত' কোনো বিষয় নয়। আমি তারপরও চেষ্টা করেছি বৈজ্ঞানিক সাময়িকী এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের (যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) লেখা থেকে সর্বাধুনিক তথ্যগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠকদের সামনে হাজির করতে। প্রান্তিক গবেষণালব্ধ জিনিস গ্রন্থাকারে সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে হাজির করলে একটা ভয় সবসময়ই থাকে যে, পরবর্তীতে অনেক কিছুই ভুল হয়ে যেতে পারে। তারপরও এই প্রান্তিক জ্ঞানগুলো আমাদের জন্য জরুরি। অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার 'হাউ মাইন্ড ওয়ার্ক্স' বইয়ের ভুমিকায় যেমনিভাবে বলেছিলেন—'Every idea in the book may turn out to be wrong, but that would be progress, because our old ideas were too vapid to be wrong!' - আমিও সেকথাই বলার চেষ্টা করব। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন শাখা। নতুন

জিনিস নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে—এর কিছু প্রান্তিক অনুমান যদি ভুলও হয়, সেটাই হবে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য 'প্রগ্রেস'। আর সেই সংঘাত সংঘর্ষ থেকেই ঘটবে হবে নতুন অজানা জ্ঞানের উত্তরণ।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলেনি

বিবর্তন মনোবিজ্ঞান কোনো আলাদিনের প্রদীপ নয়, তাই এটি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। যদিও মানবসমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত সফল অবদান রেখেছে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান, কিন্তু আবার সেই সাথে উন্মুক্ত করেছে অজস্র প্রশ্নের ঝাঁপিও। একটি সার্থক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধরনই এমন। একটি সার্থক বৈজ্ঞানিক ধারণা কিংবা তত্ত্ব কেবল সমস্যার সমাধানই করে না, সেই সাথে জন্ম দেয় অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্নেরও। বিগ ব্যাঙের ধারণা, আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যাই কেবল সমাধান করেনি, তারা জন্ম দিয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও। ভবিষ্যত বিজ্ঞানীরা সেই সব প্রশ্নের সমাধান বের করবেন। কিন্তু তাদের সমাধানও নিঃসন্দেহে জন্ম দিবে অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্নের, যেগুলো হবে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার অমূল্য খোরাক। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানও সেই পথেই এগুচ্ছে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, আবার সূচনা করছে আরও বিস্তৃত কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষাপটও।

১৯৯৪ সালে রবার্ট রাইটসের রচিত 'মরাল এনিম্যাল' বইটি বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের উপর লেখা অন্যতম একটি ক্লাসিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত[310]। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করার পরেও বইটির পরিশিষ্টে এসে রাইটস স্বীকার করেছেন যে, বিবর্তন মনোবিজ্ঞান ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। রাইটসের তৈরি করা ছয়টি প্রশ্ন ছিল এরকম -

---

[310] Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1994)

১. কেন মানবসমাজে সমকামিতার অস্তিত্ব রয়েছে?
২. কেন ভাই-বোনেরা (এমনকি যমজ সন্তানেরাও) একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করে?
৩. কেন অভিভাবকেরা অনেক সময়েই কম সন্তান নেন, এমনকি নিঃসন্তান থাকাকেও শ্রেয় মনে করেন?
৪. কেন মানুষ আত্মহত্যা করে?
৫. কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?
৬. কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়?

রাইটস এ প্রশ্নগুলো করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তারপর থেকে (যখন ২০১১ সালে এ বইটি লিখছি) প্রায় ১৭ বছর পার হয়ে গেছে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণাও এর মধ্যে এগিয়েছে অনেক। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই উত্তর মিলেছে, যদিও কোনো কোনো ব্যাপার এখন রয়ে গেছে রহস্যের বাতাবরণেই। সমকামিতার ব্যাপারটি দিয়েই শুরু করা যাক।

কেন মানবসমাজে সমকামিতার অস্তিত্ব রয়েছে?

১৯৯৪ সালে রাইটস সমকামিতার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বইটি প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমকামিতার জৈববৈজ্ঞানিক উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু অগ্রগতি সাধন করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করে[311]। আমি নিজেও সমকামিতার বিবর্তনীয়

---

[311] উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের উল্লেখ করা যায়—

১. Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000

উৎস অনুসন্ধান করে একটি বই লিখেছি—'সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান' শিরোনামে[312]। বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়টির নামই ছিল 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা'। অধ্যায়টির 'ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কি সমকামিতাকে ব্যখ্যা করতে পারে?' শিরোনামের একটি অংশে বিবর্তন তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামী প্রবৃত্তিকে ব্যখ্যা করার এবং এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণাগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন, মানুষের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অঙ্গ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানী সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমকামীদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়। আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক তথাকথিত 'গে জিন' সংক্রান্ত গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন[313]। শুধু তাই নয়, ডিন হ্যামারের গবেষণা থেকে জানা গেছে সমকামী প্রবণতা খুব সম্ভবত মায়ের দিক থেকেই জেনেটিকভাবে প্রবাহিত হয়[314]। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও বেরিয়ে এসেছে, যে জেনেটিক প্রভাব মেয়েদের উর্বরা শক্তি বাড়ায়—সেই একই জিন আবার ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা ছড়িয়ে

২. Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।

৩. Volker Somme, Paul L. Vasey, *Homosexual Behaviour in Animals: An Evolutionary Perspective*, Cambridge University Press, 2006

৪. Qazi Rahman, Glenn Wilson, *Born Gay: The Psychobiology of Sex Orientation*, Peter Owen Ltd, 2008

[312] অভিজিৎ রায়, সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর, ২০১০

[313] Dean Hamer and Peter Copeland, The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the Biology of Behavior, Touchstone, 1991

[314] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

দেয়—বিবর্তনের উপজাত হিসেবে[315]। তার মানে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার অস্তিত্বের রহস্য হয়তো খুব একটা জটিল কিছু নয়, যার ব্যাখ্যা ডীন হ্যামার দিয়েছেন সহজ একটি বাক্যে[316] —

> The answer is remarkably simple: the same gene that causes men to like men, also causes women to like men, and as a result to have more children

যদিও এ সংক্রান্ত গবেষণার বেশ কিছু জায়গা এখনও বিতর্কিত এবং অমীমাংসীত, কিন্তু তারপরেও সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে রহস্যের জট ক্রমশ খুলে যাচ্ছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

কেন ভাই-বোনেরা *(এমনকি যমজ সন্তানেরাও)* একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করে*?*

রাইটসের দ্বিতীয় প্রশ্নটি—সন্তানেরা একই জেনেটিক উৎস থেকে আসার পরেও কেন ভিন্ন আচরণ করে—এটিও ১৯৯৪ সালে ছিল একেবারেই অমীমাংসিত একটি প্রশ্ন । কিন্তু এখন এ প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই জানা হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত ফ্র্যাঙ্ক জে. সালওয়ের লেখা 'বিদ্রোহের জন্য জন্ম'[317] (১৯৯৪) এবং পরবর্তীতে জুডিথ হ্যারিসের লেখা 'পরিবেশ অনুজ্ঞা - 'কেন সন্তানেরা তাদের মতো করেই বেড়ে উঠে'[318] (২০০৯) শিরোনামের বই দুটো এ ব্যাপারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সালওয়ে তার বইয়ে দেখিয়েছেন, 'পিতা মাতার চোখে সব সন্তানই

[315] Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 271: 2217-2221.

[316]

[317] Frank J. Sulloway, Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative Lives, Vintage , September 2, 1997

[318] Judith Rich Harris, The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do, Free Press; Rev Upd edition , 2009

সমান’—এই আপ্তবাক্য খুব সাধারণভাবে সমাজে আউড়ে যাওয়া হলেও জৈবিকভাবে ব্যাপারটি কিন্তু এত সরল নয়। প্রথম সন্তান আগে জন্মানোর ফলশ্রুতিতে পিতাপাতার যত্ন (parental care) অনেক বেশি উপভোগ করে, তার পরবর্তী ভাই বোনদের তুলনায়। অর্থাৎ অগ্রজের সম্পদের আহরণ এবং ব্যাবহারের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই অনুজদের চেয়ে বেশি হয়। তার প্রভাব পড়ে অগ্রজ-অনুজের অর্জিত ব্যবহারে। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায়—বড় সন্তানেরা হয় বাধ্য এবং অনুগত; সংসারের হাল ধরার জন্য কিংবা সংসারের ভিত্তি হিসেবে সবার বড় ছেলে বা মেয়ের উপরেই বাবা মা বেশি নির্ভর করেন, আর অন্যদিকে সহজাত কারণেই পরবর্তী সন্তানদের থেকে বাবা মার একটা অলিখিত দূরত্ব এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। আর সেজন্য প্রথম সন্তান সময়ের সাথে সাথে সাধারণত প্রথাগত, এবং সব দিক রক্ষা করে চলা সমঝদার ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং একই সংসারের পরবর্তী সন্তানদের অনেকে হয়ে উঠে ‘বিদ্রোহী’। সালওয়ে তার বইয়ে ইতিহাস থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে এনে দেখিয়েছেন সংসারের প্রথম সন্তান আত্ম প্রকাশ করেছে পুরনো রীতি বা প্রথা মানা ‘কনজারভেটিভ ভ্যানগার্ড’ হিসেবে, অন্যদিকে বিভিন্ন নতুন বিপ্লবের কিংবা সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংসারের অনুজ সন্তানেরা। কাজেই একই জেনেটিক উৎস থেকে আসা সত্ত্বেও কেবল জন্মের ক্রমের পার্থক্যের কারণে কালক্রমে বিভিন্ন সন্তানের ভিন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়।

অন্যদিকে জুডিথ হ্যারিস তার ‘পরিবেশ অনুজ্ঞা—কেন সন্তানেরা তাদের মতো করেই বেড়ে উঠে’ নামক বইয়ে ‘সন্তানের বেড়ে উঠার পেছনে পিতামাতাই কেবল দায়ী’—সামাজিকভাবে প্রচলিত ধারণাটি পদ্ধতিগতভাবে খণ্ডন করেছেন। হ্যারিসের মতো হলো—শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে পিতামাতার দেয়া বাড়ির পরিবেশের চেয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গী সাথীদের পরিবেশই জোরালো ভূমিকা রাখে। পিতামাতার দেয়া পরিবেশ যা একটি শিশু অন্য ভাইবোনদের সাথে মিলিতভাবে উপভোগ করে, তাকে বলা হয় বণ্টিত পরিবেশ (shared environment), আর স্কুলে, আড্ডায়, খেলার

মাঠে কিংবা মহল্লা এবং অন্যত্র সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকে যে পরিবেশ শিশুটি পেয়ে থাকে তাকে বলে অবণ্টিত পরিবেশ (non shared environment)। হ্যারিসের মতে শিশুটির মানসজগৎ তৈরিতে বণ্টিত পরিবেশের চেয়ে অবণ্টিত পরিবেশই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। হ্যারিসের বইটি স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিবিদ এবং সমাজবিদদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেও আচরণ বংশগতিবিদ্যা থেকে পাওয়া বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল হ্যারিসের অনুকূলেই গিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন[319]। অবণ্টিত পরিবেশ অনেক সময়ই যে বণ্টিত পরিবেশের চেয়ে বড় হয়ে যায় তা আমার জীবনেই স্পষ্ট। আমার নিজের জীবনের দিকে তাকালে এখন মনে হয় মানস জগৎ গঠনে আমি মনে করি আমার বাবা মার দেয়া পরিবেশের চেয়ে বাইরের পরিবেশের অবদানই বেশি ছিল। একটা ছোট উদাহরণ দেই। আমার মা বড় হয়েছিলেন কুমিল্লায়, আর আমার বাবা দিনাজপুরে। বাসায় গ্রাম থেকে আত্মীয় স্বজন যে কম আসতেন তা নয়। অথচ আমার উচ্চারণে কুমিল্লা বা দিনাজপুরের কোনো ছোঁয়া ছিল না কখনোই। আমি ঢাকায় বড় হবার কারণে, এবং স্কুলে বাসায় আড্ডায় ঢাকার বন্ধুদের সাথেই মেলামেশার কারণে সেই ভাষাটিই আমি রপ্ত করে ফেলেছিলাম ছোটবেলা থেকে। আমার স্ত্রী বন্যারও তাই। বন্যার বাবার কথায় ময়মনসিংহের টান থাকলেও বন্যার সেটা ছিল না। এ ব্যাপারগুলো সবাই মোটামুটি জানেন—ভাষা উচ্চারণ বাচনভঙ্গির ব্যাপারগুলো মানুষ অভিভাবকদের থেকে শেখে না, শেখে কাছের বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশা করে। এ ব্যাপারটা আরও ভালো করে আমি বুঝেছি আমাদের মেয়ে তৃষার ক্ষেত্রে। আমেরিকায় বড় হবার কারণে তৃষা ছোটবেলা থেকেই পরিষ্কার আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে, আমাদের মতো বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী অভিভাবকদের উচ্চারণগত সীমাবদ্ধতাকে এক ফুঁ দিয়ে অতিক্রম করেই।

[319] David C. Rowe, The Limits of Family Influence: Genes, Experience, and Behavior, The Guilford Press;, 1995

হ্যারিস মনে করেন, শিশুদের এই ভাষা এবং বাচনভঙ্গি শেখার ব্যাপারে যেটা সত্য, সেই সত্যতা আছে প্রায় সবকিছুতেই। এই অবণ্টিত পরিবেশ বা 'নন-শেয়ার্ড এনভায়রনমেন্ট' হচ্ছে আরেকটি কারণ, যার ফলে আমরা বুঝতে পারি ছেলেমেয়ারা একই পারিবারিক পরিবেশে বড় হবার পরেও কেন তারা চিন্তায় চেতনায় প্রায়শই ভিন্নতর হয়ে থাকে। অবশ্য মিডিয়ায় যেভাবে হ্যারিসের বইয়ের সমালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে হ্যারিস সন্তানের পরিচর্যায় পিতামাতার ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন—ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। পিতামাতার ভূমিকা অবশ্যই আছে, এবং সেটি কেবল বাসার পরিবেশের জন্য নয়, সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক কারণেও। শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকেই শতভাগ জিন পেয়ে থাকে। জেনেটিক তথ্য হিসেবে পিতামাতার কাছ থেকে যে তথ্য সে পেয়ে থাকে তা জৈবিক কারণেই তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হ্যারিস যেটা বলতে চেয়েছেন, তা হলো—পিতামাতা যে অবণ্টিত পরিবেশ তার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ করেন, তার চেয়ে শিশুটি যে অবণ্টিত পরিবেশ খুজে পায় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে বেশি।

কেন মানুষ নিঃসন্তান থাকতে চায়? কেন মানুষ আত্মহত্যা করে?

রাইসের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নটি অবশ্য বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও অমীমাংসিত রহস্য। মানুষ কেন অনেক ক্ষেত্রে নিঃসন্তান থাকতে চায়—কিছু ক্ষেত্রে বংশাণুগত আচরণ, কিছু ক্ষেত্রে গেম থিওরির আলোকে সম্পদ বনাম সন্তানের রেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব করা হলেও আমার কাছে কোনোটিকেই খুব একটা যুৎসই কিছু মনে হয়নি। এটা ঠিক, অনেক সময়ই 'সন্তান মানুষ করার' বিশাল খরচের কথা ভেবে পিতা মাতারা অনেক সময়ই সন্তান নেন না, কিন্তু এটাকে নিঃসন্তান থাকার সঠিক কারণ মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, যে সমস্ত দেশে প্রাচুর্য তুলনামূলকভাবে বেশি—যেমন পশ্চিমের দেশগুলোতে —সেখানেই বরং জন্মহার কম, কোনো কোনো দেশে একেবারেই ঋণাত্মক। সে সব দেশেই নিঃসন্তান

দম্পতির সংখ্যা বেশি। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশেই শিশু জন্মহার অত্যধিক। সম্পদ এবং খরচের ব্যাপারটা মুখ্য হলে ব্যাপারটা উলটো হবার কথা ছিল। অঢেল প্রতিপত্তি থাকার পরেও কেন মানুষ নিঃসন্তান থাকতে ভালোবাসে, কিংবা কেন ক্ষেত্র বিশেষে নিজ সন্তানকে হত্যা করে, কিংবা কখনো নিজেও আত্মহত্যা করে—এগুলোর কোনো বিবর্তনীয় সমাধান নেই, কিংবা থাকলেও আমাদের জানা নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে, এগুলো সবই খুব চরম কিছু নমুনার উদাহরণ, জনপুঞ্জ টিকে থাকতে হলে এগুলো কখনোই মূল স্রোতধারা হয়ে উঠবে না। আর আমরা তো দেখেছিই বিবর্তনে সমকামিতার ট্রেন্ডসহ নানা ধরনের প্রকারণগত ভিন্নতা থাকেই, এগুলো কিছু না কিছু থাকবেই, তবে কম হারে।

কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?

রাইসের পঞ্চম প্রশ্নটি কেন তিনি তার বইয়ে রেখেছিলেন, সেটা আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়। মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন ১৯৮৮ সালে তাদের লেখা ‘হোমিসাইড’ বইয়ে এর সমাধান হাজির করেছিলেন[320]। আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি বইয়ের ষষ্ঠ)জীবন মানে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা(অধ্যায়ের ‘কেন সিন্ডারেলার গল্প কম বেশি সব সংস্কৃতিতেই ছড়িয়ে আছে?’ অংশে। ‘কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?’ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে ‘খুব বেশি আসলে করে না’। শিশু অত্যাচার এবং হত্যা আসলে জৈব অভিভাবকের চেয়ে সৎ অভিভাবকদের দ্বারাই বেশি হয়। অনগ্রসর সমাজে তো বটেই এমনকি আমেরিকা, ক্যানাডার মতো দেশেও স্টেপ প্যারেন্টদের অত্যাচার জৈব অভিভাবকদের অত্যাচারের চেয়ে বহুগুণ বেশি পাওয়া গেছে। আসলে বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে তাই পাওয়ার কথা। জৈব অভিভাবকেরা তাদের জেনেটিক সন্তানকে খুব কমই নির্যাতন বা হত্যা করে, কারণ তারা সহজাত কারণেই নিজস্ব জিনপুল তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের চেয়ে রক্ষায় সচেষ্ট হয় বেশি, কিন্তু

[320] Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988

সৎঅভিভাবকদের ক্ষেত্রে যেহেতু সেটি জেনেটিক নয়, বরং অনেকাংশেই সামাজিকভাবে আরোপিত, সেখানে নির্যাতনের মাত্রা অধিকতর বেশি পাওয়া যায়। তারপরেও কিছু ক্ষেত্রে জৈবিক অভিভাবকেরা যে নিজ সন্তানকে হত্যা করে । সেটা ড্যালি এবং উইলসন ব্যাখ্যা করেছেন, 'পার্থক্যসূচক অবিভাবকত্বীয় উৎকণ্ঠা'র (discriminative parental solicitude) নিরিখে। কেবল পুরুষেরাই শিশু সন্তানকে হত্যা করে তা নয়, সারা বাফার হার্ডি তার 'প্রকৃতি মাতা' বইয়ে দেখিয়েছেন বর্ধিত প্রজননগত কৌশলের (greater reproductive strategy) কারণে একটি নারীও আপন সন্তানকে হত্যা করতে পারে[321]। পরকীয়া এমনি একটি বর্ধিত প্রজননগত কৌশল, যার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে অনেক নারীর মধ্যেই। পরকীয়ার কারণে আয়শা হুমায়রা তার নিজের সন্তান সামিউলকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি এবং তার প্রেমিক আরিফ মিলে হত্যা করেছিলেন তার শিশুপুত্রকে। সম্প্রতি আমেরিকায় কেলি অ্যান্থনিকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার মা কেসি অ্যান্থনিকে। প্রমাণের অভাবে কেসি খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও এ নিয়ে সাড়া আমেরিকায় বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। নিজের প্রজননগত সফলতা বজায় রাখতে বহু পিতা মাতাই শিশু সন্তানকে হত্যা করেছেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ অজস্র। ঠিক একই কারণে সামাজিক কাঠামো বজায় রাখতে সঠিক শাস্তির ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করতে হয়েছে মানুষকেই।

কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়?

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণোৎসর্গ করেছিল, বাংলাদেশ নামের আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ হয়ে উঠে স্বাভাবিক ঘটনা, দেশের মানুষ

[321] S. B. Hrdy, Mother Nature: A History of Mothers, Infants and Natural Selection, Pantheon/Random House, New York, 1999

তখন প্রিয় মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সামগ্রিকভাবে জনগণের অংশগ্রহণের কথা না হয় বাদই দেই, একটি দেশের সৈন্যবাহিনীকে তৈরিই করা হয় এভাবে যেন তারা দেশের প্রয়োজনে যে কোনো সময় যুদ্ধ করতে পারে, দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। আমেরিকার সৈন্যরা কেবল নিজের দেশ রক্ষায় প্রাণ দেয় না, প্রাণ দেয় রাষ্ট্রপতির হুকুম তামিল করে অন্যদেশ আক্রমণ করেও। ইরাক, আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে কম সৈন্যহানি ঘটেনি আমেরিকার। কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়? কেন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে? এগুলো সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো বিবর্তনীয় অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসবে না; সে আশা করাও হয়তো বোকামি। তারপরেও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় বেশ কিছু তাৎপর্যময় দিক উঠে এসেছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত সৈন্যদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই খুব উঁচু মূল্য দেয়া হয়, সেটা যে কোনো দেশেই। যুদ্ধের ময়দানে সাহসের সাথে প্রাণোৎসর্গ করে ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাব বাংলাদেশে যারা পেয়েছেন সে রকম খেতাব বেসরকারীভাবে আর কেউ পাননি, পাবেনও না আর কখনো। যুদ্ধে যে সৈন্যরা নিহত হন, তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব অনেকাংশেই রাষ্ট্র থেকে নেওয়া হয়। আমেরিকাতেও যুদ্ধফেরত সৈন্যদের সম্মান দিয়ে বরণ করা হয়, যুদ্ধাহত সৈনিকদের আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র, আর যুদ্ধে কোনো সৈন্য নিহত হলে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে তার পরিবার অর্জন করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব, বিধবা স্ত্রী এবং শিশুদের জন্য থাকে রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণের সার্বিক ব্যবস্থা। আমরা এমন কোনো সভ্য রাষ্ট্রের কথা জানি না, যেখানে দেশের জন্য প্রাণ দেয়া মানুষকে সম্মান করা হয় না। মানুষ যখন শিকারি-সংগ্রাহক পরিস্থিতিতে বাস করত, তখন যে সকল সুদক্ষ সৈন্যরা গোত্রে বাড়তি নিরাপত্তা দিতে পারত, কিংবা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাস্ত করতে পারত, তারা অবধারিতভাবে পেত গোত্রাধিপতির তরফ থেকে পুরস্কার, এবং অধিক নারীর দখল। আজকের দিনে পরিস্থিতি বদলালেও বীর সৈন্যদের পুরস্কৃত করার সেই একই মানসিকতার প্রতিফলন একটু চেষ্টা করলেই লক্ষ করা যাবে।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করা গেছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকার ফলে এ ব্যাপারটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আমেরিকান সৈন্যরা ঠিক যুদ্ধে যাওয়ার বছরখানেক আগে বিয়ে করে ফেলে; আর যুদ্ধরত অবস্থায় পায় সন্তান জন্মের খবর। স্ত্রী সন্তানদের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের হাতে সঁপে দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হয়তো আদিম মনোসঞ্জাত স্ট্র্যাটিজি। পরিবারের নিরাপত্তা একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে বহুনারীর দখলদারিত্বের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ সময়ের ব্যাপার। সেজন্যই দেখা যায় প্রতিটি যুদ্ধেই আগ্রাসী সৈন্যরা ভিন দেশ আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা এবং ধ্বংসের পাশাপাশি বহু সময়ই মেতে উঠে ধর্ষণে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্ষণ প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেরই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা নয় মাসে দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল, বসনিয়ায় সার্ব সৈন্যরা ধর্ষণ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার নারীকে, রুয়ান্ডা গণহত্যায় দুই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। শিম্পাঞ্জিরা যখন অন্য শিম্পাজির এলাকা দখল করে, তখন প্রথম কাজটিই যেটা করে সেটা হলো—সেই এলাকার নারী শিম্পাঞ্জিদের পালা করে ধর্ষণ করা[322]। আমরা নিজেদের 'সভ্য এবং আধুনিক' মানুষ দাবি করলেও আমরা যে বন্য স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি, তা যুদ্ধের সময়গুলোতে উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন শিম্পাঞ্জিদের মতোই এভাবে অধিক নারীর দখল নিয়ে প্রজননগত সফলতা বৃদ্ধি করা মানবসমাজেও সৈন্যদের গুপ্ত স্ট্র্যাটিজি। যুদ্ধের ময়দানে একাধিক নারীর দখল, আর যুদ্ধ শেষে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং পাশাপাশি পরিবারের সুদৃঢ় নিরাপত্তা —এগুলো মানবসমাজে যে কোনো রাষ্ট্রেই নির্জলা সত্য। আরও একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়; বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সাধারণত আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল পরিবার থেকেই মূলত

[322] Akiko Matsumoto-Oda, Miya Hamai, Hitosige Hayaki, Kazuhiko Hosaka, Kevin D. Hunt, Eiiti Kasuya, Kenji Kawanaka, John C. Mitani, Hiroyuki Takasaki and Yukio Takahata. 2007. Estrus Cycle Asynchrony in Wild Female Chimpanzees, Pan troglodytes schweinfurthii.

সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা যুদ্ধের মাধ্যমে সম্মান বয়ে এনে যে প্রজননগত সফলতা প্রদর্শন করতে পারে, যুদ্ধ না করলে সেটা তাদের মতো অবস্থার মানুষদের পক্ষে সম্ভব হতো না অনেক ক্ষেত্রেই। এগুলো সবগুলোই হয়তো দেশের জন্য সৈন্যদের যুদ্ধ করার উজ্জীবনী শক্তি। তবে বলা বাহুল্য—এগুলো সবই জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া কতকগুলো ধারণা, সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নয়। কেন মানুষ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়, কেন সৈন্যরা দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দেয় তার অনেক কিছুই এই মুহূর্তে জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অজানা।

প্রান্তিক কিছু বিতর্ক

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বড় সড় অভিযোগ করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। রিচার্ড লিওনটিন অভিযোগ করেছেন লঘুবাদিতার (reductionism), স্টিফেন জে গুল্ড অভিযোগ করেছেন প্রাক-অভিযোজনের (Panadaptationism), স্টিফেন রোজ অভিযোগ করেছেন বংশাণু নির্ণয়বাদিতার (Genetic determinism)। অবশ্য বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা এই যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন বলে দাবি করেন[323]। তারা মনে করেন এই সমস্ত সমালোচকেরা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমালোচনা করেননি। যেমন, লঘুবাদিতা বা রিডাকশনিজম প্রসঙ্গে বলা যায়—লঘুবাদিতাতে দোষের কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই লঘুবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়; শুধু তাই নয়, অনেক সময় মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় লঘুবাদিতা বা রিডাকশনিজম, তা সে আমরা প্রকৃতিকেই ব্যাখ্যা করি আর সমাজকেই ব্যাখ্যা করি। যেমন, আমরা জানি যে, মহাকর্ষকে ব্যাখ্যার জন্য নিউটনের সূত্রও এক ধরনের রিডাকশনিজম বা লঘুকরণ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বও তাই। তাহলে সামাজিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও লঘুকরণ খাটবে না

[323] Robert Kurzban, Alas Poor Evolutionary Psychology: Unfairly Accused, Unjustly Condemned, Skeptic Magazine, Volume 9, No. 2

কেন? এতোদিন স্ট্যান্ডার্ড সোশাল সায়েন্সের মডেলে (SSSM) সমাজের গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছিল; পুরুষেরা সহিংস কেন, কিংবা সিরিয়াল কিলার পুরুষদের মধ্যে বেশি কেন, কেন পুরুষেরা পর্নোগ্রাফি বেশি দেখে, আর মেয়েরা রোমান্স নভেল বেশি পড়ে—এগুলো কেবল সামাজিক অবস্থান, প্রতিপত্তি, পাওয়ার প্লে, সংস্কৃতি এগুলো দিয়েই ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে এর অনেককিছুতেই আরও ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে। এতে যদি রিডাশনিজমের ব্যাপার চলে আসে তো আসুক। ডেনিয়েল ডেনেট সেজন্যই বলেছেন, 'রিডাকশনিজম' কোনো সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে 'লোভী রিডাকশনিজম' (Greedy reductionism)[324]।

'লোভী রিডাকশনিজমের' ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সতর্ক না থাকলে 'লোভের ফাঁদে পড়ে' ভুল দিকে গবেষণা চলে যাওয়ার খুব ভালো অবকাশ থেকে যেতে পারে। যেমন, নারীপুরুষের জৈবিক পার্থক্যগুলোকে 'খুব বড় করে' কিংবা 'অনমনীয়' হিসেবে দেখিয়ে স্টেরিওটাইপিং-এর বৈধতা দেয়া, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতিকে এডাপ্টিভ ট্রেইট হিসেবে উপস্থাপন করা ইত্যাদির কথা বলা যায়। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের কিছু 'গবেষক'এমন গবেষণাপত্রও লিখেছেন যে, আফ্রিকাসহ কিছু দেশে মানুষের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যজনিত দুর্ভোগ দারিদ্র্য কিংবা অর্থনৈতিক কারণে নয়, বরং 'লো আইকিউ'-এর কারণে। ফলত এ গবেষণাগুলো সঠিক দিকে না গিয়ে লোভী লঘুকরণের ফলাফল হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপিত দুর্বল 'পপ সায়েন্স' হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় পাশাপাশি সচেতন মানুষের মধ্যে বহু বিতর্কও তৈরি করেছে পুরোমাত্রায়। ডেভিড বুলার সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে 'বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের চারটি হেত্বাভাস' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলেন ২০০৯ সালের জানুয়ারি সংখ্যায়[325]। অধ্যাপক

---

[324] Greedy reductionism is a term coined by Daniel Dennett, in his 1995 book *Darwin's Dangerous Idea* (Simon & Schuster; 1995), to refer to a kind of erroneous reductionism. Whereas "good" reductionism means explaining a thing in terms of what it reduces to (for example, its parts and their interactions), greedy reductionism is when "in their eagerness for a bargain, in their zeal to explain too much too fast, scientists and philosophers [...] underestimate the complexities, trying to skip whole layers or levels of theory in their rush to fasten everything securely and neatly to the foundation.

[325] David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology, Scientific American Magazine , January 2009

বুলার সেই প্রবন্ধটিতে চলমান বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের 'জনপ্রিয়' ধারাটিকে 'চটুল বিজ্ঞান' (pop evolutionary psychology, or Pop EP) হিসেবে সমালোচনা করেছেন[326]। তিনি সেই প্রবন্ধে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের চারটি জনপ্রিয় অনুমানকে 'হেত্বাভাস' বা ফ্যালাসি হিসেবে খণ্ডন করেছেন। সেগুলো হলো—

১. প্লেইসটোসিন যুগের অভিযোজনগত সমস্যা থেকে আমাদের মানসপটের বিনির্মাণের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া।
২. পার্থক্যসূচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ইতোমধ্যেই খুঁজে পেয়েছি বা শিগগিরই খুঁজে পাব বলে মনে করা।
৩. মনোবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত জনপ্রিয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যায় বলে মনে করা।
৪. আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া।

তালিকার শেষ দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরিপ, গ্রাফ, ট্রেন্ড এনালাইসিস প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে একটি সরল উপসংহারে পৌঁছে যান বলে সমালোচকদের অনেকেই মনে করেন। অনেক সময় নমুনাক্ষেত্রও থাকে খুব ছোট। আর তাদের অনেকেরই গবেষণার পদ্ধতি অনেকসময়ই নিগূঢ় থাকে না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠে বর্ণনামূলক। সেজন্যই সংশয়বাদী জীববিজ্ঞানী ম্যাসিমো পাগ্লিউসি (Massimo Pigliucci) বলেছেন, "Evolutionary stories of human behavior make for a good narrative, but not good science."। উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, ডেভিড বাসের যে বহুল আলোচিত সমীক্ষাটির সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে, যা থেকে আমরা জেনেছি—সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারগুলো। বাসের এই জরিপের পর সহস্রাধিক জার্নালে এই স্টাডির উল্লেখ করে

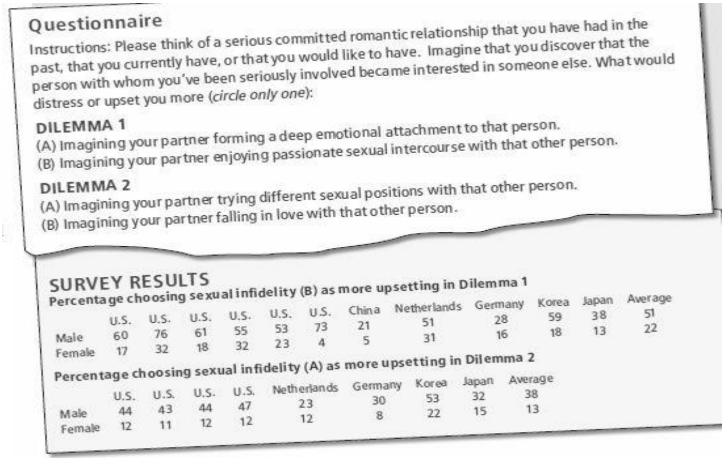
[326] According to David J. Buller Pop EP, refers to a branch of theoretical psychology that employs evolutionary principles to support claims about human nature for popular consumption.

দেখানো হয়েছে যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্যগুলো প্রধানত বিবর্তনীয় কারণেই ‘মজ্জাগত’—কিন্তু বাস্তবতা হলো মাত্র ৩৩ টি দেশে ছোট নমুনাক্ষেত্রের মাধ্যমে পাওয়া ফলাফল মোটেই শক্তিশালী কোনো বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে না। তার চেয়েও বড় কথা সাম্প্রতিক কিছু জরিপ নারী পুরুষ নিয়ে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গেছে মনে করা হচ্ছে। যেমন, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক লীন কারোল মিলার তার সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে মেয়েরাও ছেলেদের মতো বহুগামী হতে পারে, সংস্কৃতিভেদে তারাও ছেলেদের মতো একইভাবে সময় এবং অর্থ ব্যয় করে থাকে যৌনতাকে উদযাপনের জন্য। এই ফলাফল বাসের পূর্বোক্ত সমীক্ষার বিপরীতে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজেই বহুগামিতা, ‘ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড’, সম্ভোগের যথেচ্ছচার প্রভৃতি পুরুষদের একচেটিয়া কিছু নয়, নারীদের মধ্যেও একইভাবে জাগ্রত হতে পারে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই[327]।

একই কথা বাসের ঈর্ষা সংক্রান্ত জরিপের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। অধ্যাপক বাস তার জরিপের মাধ্যমে উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, পুরুষ এবং নারী দুজনেরই ঈর্ষা আছে, কিন্তু জৈববিবর্তনীয় কারণে তাদের প্রকাশ ভিন্ন। ছেলেরা তার সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অধিকতর ঈর্ষাপরায়ণ থাকে, আর অন্যদিকে মেয়েরা ঈর্ষার প্রকাশ ঘটায় তার সঙ্গীর রোমান্টিক সম্পর্কের ব্যাপারে। নারী পুরুষে ঈর্ষার জৈববিবর্তনীয় পার্থক্য নিয়ে আমিও এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এমনও হতে পারে এই পার্থক্যের ভিত্তি পুরোপুরি জৈবিক নয়। জার্মানি কিংবা নেদারল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে যৌনতার ব্যাপারগুলো অনেক শিথিল, সেখানে পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অনেক কম ঈর্ষাপরায়ণ থাকেন। এ দুটি দেশের জরিপে যৌনতার ব্যাপারে সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের হার যথাক্রমে মাত্র ২৮ ভাগ এবং ২৩ ভাগ। সেটা বাস নিজেও

[327] JR Minkel, Student Surveys Contradict Claims of Evolved Sex Differences, Scientific American, October 14, 2010.

স্বীকার করেছেন এই বলে—‘আমেরিকান সংস্কৃতির চেয়ে তাদের সংস্কৃতি অনেক শিথিল, এমনকি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও’[328]। তার মানে হচ্ছে সংস্কৃতির একটা গুরুত্ব থেকেই যাচ্ছে। যে সংস্কৃতিতে সংম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা মানেই শাস্তি কিংবা সম্পর্কের তাৎক্ষণিক সমাপ্তি, সেখানে মানুষ সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন থাকে, আর যে জায়গায় লোকজনের মন মানসিকতা যৌনতার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম কঠোর,



Questionnaire

Instructions: Please think of a serious committed romantic relationship that you have had in the past, that you currently have, or that you would like to have. Imagine that you discover that the person with whom you've been seriously involved became interested in someone else. What would distress or upset you more (*circle only one*):

DILEMMA 1
(A) Imagining your partner forming a deep emotional attachment to that person.
(B) Imagining your partner enjoying passionate sexual intercourse with that other person.

DILEMMA 2
(A) Imagining your partner trying different sexual positions with that other person.
(B) Imagining your partner falling in love with that other person.

SURVEY RESULTS

Percentage choosing sexual infidelity (B) as more upsetting in Dilemma 1

	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	China	Netherlands	Germany	Korea	Japan	Average
Male	60	76	61	55	53	73	21	51	28	59	38	51
Female	17	32	18	32	23	4	5	31	16	18	13	22

Percentage choosing sexual infidelity (A) as more upsetting in Dilemma 2

	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	Netherlands	Germany	Korea	Japan	Average
Male	44	43	44	47	23	30	53	32	38
Female	12	11	12	12	12	8	22	15	13

চিত্র: ডেভিড বাস নারী-পুরুষে ঈর্ষা সংক্রান্ত ভিন্নতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন [“Sex Differences in Jealousy: Evolution, Physiology, and Psychology” in Psychological Science, Vol. 3, No. 4; July 1992] তার কিছু ফলাফল সম্প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

সে সমস্ত জায়গায় যৌনতা নিয়ে একটু এদিক ওদিক হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই কিন্তু আমরা দেখছি জরিপের ফলাফলে। নতুন কিছু সমীক্ষায় ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন, কোনটা চিন্তা করে আপনি বেশি বিপর্যস্ত হবেন—*আপনার সঙ্গী অন্য কারো সাথে বিভিন্ন আসনে যৌনক্রিয়ায় আসীন* নাকি *আপনার সঙ্গী অপরজনের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে* -এর উত্তরে

[328] David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology, Scientific American Magazine , January 2009

মার্কিনদের মধ্যে মাত্র ১২ ভাগ, নেদারল্যান্ডসের ১২ ভাগ এবং জার্মানির মাত্র ৮ ভাগ নারী ২য় অপশনটির পক্ষে মত দিয়েছেন। কাজেই মেয়েরা তার যৌনসঙ্গীর 'ব্যাভিচারের ব্যাপারে মোটেই উৎকণ্ঠিত নয়' এই অনুমান সার্বজনীন বলে ধরে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি বোধ হয় খুব জোরালো নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়। যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা ভুল দিকে চলে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে অবলীলায়। অনেক সময় তৈরি করতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক। যেমন রেন্ডি থর্নহিলের ধর্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা এবং তার 'ধর্ষণের প্রাকৃতিক ইতিহাস' বইটির[329] কথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই বইয়ে থর্নহিল এবং ক্রেইগ পালমার ধর্ষণকে একটি 'বিবর্তনীয় অভিযোজন' হিসেবে অভিমত দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্ষণ ব্যাপারটা হয়তো আদিম সমাজে পুরুষদের বেশ কিছু প্রজননগত সুবিধা দিয়েছিল। তাদের মতে, আমরা সেই সব পুরুষেরই বংশধর যারা একসময় শুধু নিজেদের সঙ্গীর দেহেই গর্ভসঞ্চার করেনি, পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জোর করে গর্ভ সঞ্চার করেছিল অনিচ্ছুক নারীর দেহেও। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থাতেও 'ধর্ষণের ট্রেইট' অনেকটা সার্থকভাবেই টিকে আছে, আর পুরুষেরা সে কারণেই ধর্ষণ করতে উন্মুখ থাকে সুযোগ পেলেই। তারা যুক্তি দেন প্রজননগত সুবিধার ব্যাপারটা আছে বলেই দেখা যায় যে, শিশু কিংবা বৃদ্ধাদের তুলনায় সন্তান ধারণক্ষম উর্বরা নারীদের উপরেই ধর্ষণের প্রকোপ ঘটে বেশি, এবং ধর্ষণের কারণে মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াও তাদের মধ্যে বেশি থাকে[330]। কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয় (কিছু জরিপে এর সপক্ষে কিছু সত্যতা পাওয়া

[329] Randy Thornhill and Craig T. Palmer, A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion, The MIT Press; 2000

[330] Most rape victims are women of childbearing age. Also, the analysis of the data showed that young women suffered greater distress after a rape than did children or women who were past reproductive age. According to Randy Thornhill and Craig T. Palmer, the author of the controvesial book, the finding makes evolutionary sense, because it is young women who were at risk of being impregnated by an undesirable mate. Married women, moreover, were more traumatized than unmarried women, and they were more likely to feel that their future had been harmed by the rape. That, too, makes evolutionary sense, because the doubt a rape sows about paternity can lead a long-term mate to withdraw his support.

গেছে বলে দাবি করা হয়েছে[331]), কিন্তু তারপরেও থর্নহিল এবং পালমার ধর্ষণকে যেভাবে 'মানব বিবর্তনের একটি স্বাভাবিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়াজাত উপকরণ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাতে অনেকেই ধর্ষণের 'বৈধতার গন্ধ' খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিক কারণেই এটি নানা অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। নারীবাদী, যৌন অপরাধবিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, মানবাধিকারকর্মী থেকে শুরু করে অনেকেই বইটির নিন্দা করেছেন। জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন তো বইটিকে সর্বশেষ 'বিবর্তনই আমার অপরাধের জন্য দায়ী' ধরনের দায়মুক্তির অপচেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন। জেরি কোয়েনের মতো খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী পর্যন্ত এই বইয়ের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন[332]। অবশ্য থর্নহিল এবং অন্যান্য বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা এই দাবিগুলোকে 'অবৈজ্ঞানিক অপপ্রচার' হিসেবে প্রত্যাখান করেছেন এই বলে যে, তারা কেবল বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ধর্ষণের উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন, কোনো কিছুর বৈধতা দিতে নয়। তারা যুক্তি দিয়েছেন, ধর্ষণ করে নারীর দখল নেওয়া একধরনের স্ট্র্যাটিজি যা পুরুষেরা ব্যবহার করেছে অনাদিকাল ধরে। এজন্যই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুদ্ধের সময় নারীদের উপর ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বিগতযৌবনা নারীদের চেয়ে যুবতী নারীরাই বেশি ধর্ষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কোনোটিই ধর্ষণকে 'অ্যাডাপ্টিভ' বা অভিযোজনশীল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের সময় নারীদের উপর আগ্রাসন এবং ধর্ষণ বৃদ্ধি পায়—সত্য কথা, কিন্তু যুদ্ধের সময় চুরিদারি, লুটতরাজ, খুন মারামারি, সম্পত্তি ধ্বংসসহ অনেক কিছুই বৃদ্ধি পায়। অন্য নেতিবাচক ব্যাপারগুলোকে যদি অভিযোজনশীল মনে না করা হয়, তবে একতরফাভাবে ধর্ষণকেও অভিযোজনশীল মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

---

[331] For e.g, 2001 survey claims that a single act of rape may be more than twice as likely to make a woman pregnant as a single act of consensual sex (New Scientist, 19 February 2000, p 44).

[332] Jerry A. Coyne, The Fairy Tales Of Evolutionary Psychology : Of Vice And Men, The New Republic, 04.03.00 Issue;

Also see, Jerry A. Coyne and Andrew Berry, A theory that rape has its origin in evolutionary biology is seriously flawed, Nature 404 (2000)

সম্প্রতি প্যারাগুয়ের আহকে ট্রাইবের (Aché) মানুষের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়েছেন এরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কিম হিল। সেখানে গবেষণা চালানোর কারণ হলো, আহকে গোত্রের মানুষেরা এখনও সেই আদিম শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবেই জীবনযাপন করছে। সেই সমাজের উপর সমীক্ষা চালিয়ে অধ্যাপক কিম হিল বের করার চেষ্টা করেন যে, সত্য সত্যই আদিম সমাজে ধর্ষণ কোনো 'বিবর্তনীয় অভিযোজন' হিসেবে কাজ করেছিল কিনা। তিনি সেখানে ধর্ষণের ব্যয় এবং উপযোগিতার একটা তুলনামূলক হিসেব বের করেন। তারা ধর্ষণের ব্যয় হিসেবে গণনায় আনেন কিছু বিশেষ প্রেক্ষাপট যেমন, ধর্ষণ করতে গিয়ে আক্রান্ত নারীর স্বামী কিংবা আত্মীয়দের দ্বারা ধর্ষণকারীর নিগ্রহ, শাস্তি এবং মৃত্যুর সম্ভাবনাসহ অন্যান্য ব্যাপারগুলো—যা ধর্ষণের জন্য নেতিবাচক উপাদান হিসেবে গৃহীত। ঠিক একইভাবে প্রজননগত উপযোগিতার ব্যাপারটি আরও কমে আসবে ধর্ষিতা যদি তার ধর্ষণজাত শিশুকে জন্ম দিতে কিংবা লালনপালন করতে অস্বীকৃত হন, কিংবা শিকারি-সংগ্রাহকদের ছোট গোত্রের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে খাদ্যান্বেষণসহ বহু মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে সহযোগিতার অভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি কারণে। অন্যদিকে ধর্ষণগত বিবর্তনীয় উপযোগিতা বাড়বে যদি ধর্ষিতা উর্বর সময়ের মধ্যে থাকে (শতকরা ১৫ ভাগ), তার গর্ভ সঞ্চার হয় (শতকরা ৭ ভাগ সম্ভাবনা), ধর্ষিতা গর্ভপাত ঘটাবেন না (শতকরা ৯০ ভাগ) এবং ধর্ষণের পরেও ধর্ষিতা তার শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেন (শতকরা ৯০ ভাগ) । হিল এই প্রেক্ষাপটগুলো বিবেচনা করে ধর্ষণের ব্যয় এবং উপযোগিতার তুলনামুলক বিশ্লেষণ নির্ণয়ের জন্য সিমুলেশন পরিচালনা করেন। যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে তিনি দেখেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ষণের ব্যয় তার উপযোগিতাকে অতিক্রম করে যায়। এমনকি ফলাফল কাছাকাছিও নয়, ধর্ষণের ব্যয় উপযোগিতার প্রায় দশগুণ পাওয়া গেছে। কিপ হিলের এই গবেষণার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে—ধর্ষণের বিবর্তনীয় অভিযোজন থাকার সম্ভাবনা খুব কমই । হিল সেজন্যই বলেন, ‘প্লেইস্টোসিন যুগের মানুষেরা একটি প্রজননগত কৌশল হিসেবে ধর্ষণকে

ব্যবহার করেছিল—এটি বলার পেছনে কোনো শক্ত ভিত্তি নেই'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সতর্ক থাকা দরকার আরও অনেক ব্যাপারেই, নাহলে বিশ্লেষণ এবং উপসংহার নারী অধিকারের জন্য 'অপমানজনক' বলে প্রতিভাত হতে পারে। মনে হতে পারে 'স্টাটাস কো' বজায় রাখার 'পুরুষতান্ত্রিক' অপচেষ্টা, কিংবা 'ব্যাক টু কিচেন' আর্গুমেন্ট । বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পুরুষেরা অনাদিকাল থেকেই অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ায় তারা মন মানসিকতায় অনেক প্রতিযোগিতামূলক এবং সহিংস হয়ে উঠেছে। আর মেয়ারা ঘর-দোর সামলাতে আর বাচ্চা মানুষ করার পেছনে নিয়োজিত থাকায় তাদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্র অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, 'মেয়েরা ঘরে থাকুক, কেবল বাচ্চা মানুষ করুক, আর ছেলেরা বাইরে কাজ করুক — কারণ এটাই ন্যাচারাল—'এভাবে দেখা শুরু করলে পুরো বিষয়টিকে কিন্তু ভুল উপস্থাপনার দিকে নিয়ে যাবে। কিছু ক্ষেত্রে গিয়েছেও। যেমন, চার বছর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লরেন্স সামারস একটি কনফারেন্সে 'ছেলে মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের কারণে' মেয়েরা কম সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে—এই কথা বলে মহাবিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। ন্যান্সি হপকিন্সের মতো জীববিজ্ঞানী এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। এই বক্তব্যের কারণে সামারসকে পরবর্তীতে পদত্যাগ করতে হয়। সামারসের কথায় সত্যতা আছে কী নেই, বা থাকলেও কতটুকু এ নিয়ে বিতর্ক করা গেলেও পরিসংখ্যান মূলত সামারসের বক্তব্যের পক্ষেই যায় বলেই অনেকে মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকায় ২০০৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনশক্তির প্রায় ৪৩ ভাগ নারী। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ২৭

ভাগ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাথে যুক্ত[333]। গণিতে দক্ষ শীর্ষ ১% ছেলে মেয়ের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আটজন ছেলে গণিত বা বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে নিলে, তার বিপক্ষে মেয়ে থাকে মাত্র একটি। অন্য সাতজন পেশা হিসেবে নেয় চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, কিংবা মানবিক কোনো বিষয়-আশয়। কিন্তু তারপরেও পৃথিবীর ভালো ভালো গবেষণাগারগুলোর দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, নারীরা পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন, গবেষণায় সাফল্য পাচ্ছেন। সেই প্রাচীনকালের হাইপেশিয়া থেকে শুরু করে মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার, ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভয়শিয়ে রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম আমরা সবাই জানি। আধুনিক বিশ্বে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে সাফল্যের সাথে কাজ করছেন লিজা রান্ডল, ইভা সিলভারস্টাইন, সিএস উ, ভেরা রুবিন, জোসলিন বেল প্রমুখ। জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানসহ অন্যান্য শাখায় সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন বনি ব্যাসলার, লরা বেটজিগ, এলিজাবেথ ক্যাসদান, লিডা কসমাইডস, হেলেনা ক্রনিন, মিল্ডার্ড ডিকম্যান, হেলেন ফিশার, প্যাট্রিশিয়া গোয়াটি, ক্রিস্টেন হকস, সারা ব্ল্যাফার হার্ডি, ম্যাগদালিনা হুর্টাডো, ববি লো, লিণ্ডা মিলে, ফেলিসিয়া প্রাত্তো, মেরিন রাইস, ক্যাথেরিন স্যামোন, জোয়ান সিল্ক, মেরিডিথ স্মল, বারবারা স্মুটস, ন্যান্সি থর্নহিল, মার্গো উইলসন প্রমুখ নারীবিজ্ঞানীরা। তাদের অনেকেই আবার স্ব স্ব পেশায় কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের জেন্ডারগত অসাম্যেরও শিকার হয়েছিলেন। আমি ২০০৭ সালে সারা পৃথিবী জুড়েই নারী গবেষকদের প্রতি জেন্ডারগত অসাম্যের নানা উদাহরণ হাজির উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'হাইপেশিয়া : এক বিস্মৃতপ্রায় গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান' শিরোনামে[334]। লেখাটির প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনবোধ করছি

[333] Diane F. Halpern, Camilla P. Benbow, David C. Geary, Ruben C. Gur, Janet Shibley Hyde and Morton Ann Gernsbacher, Sex, Math and Scientific Achievement : Why do men dominate the fields of science, engineering and mathematics?, Scientific American Mind, December 2007

[334] অভিজিৎ রায়, হাইপেশিয়া: এক বিস্মৃতপ্রায় গনিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান, সচলায়তন ও মুক্তমনা; তারিখ: রবি, ২০০৭-১০-০৭। লেখাটি *পড়শী* পত্রিকায় এবং সাপ্তাহিক *একাত্তরে* প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি 'স্বতন্ত্র ভাবনা—মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি' (*চারদিক*, ২০০৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এখানেও—

ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অটোমান স্ট্যানলি তার 'মাদারস এন্ড ডটারস অব ইনভেনশন' বইটিতে হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন যে, পুরুষেরা যখন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু নারীরা যখন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। ইতিহাসবিদরা ঢালাওভাবে বলেছেন 'কে, কখন, কীভাবে এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না'। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা যে সমস্ত কাজকর্মে নিয়োজিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেই অমন ঢালাও 'স্টেরিওটাইপিং' করা হয়েছে। স্পিনিং হুইল বা চরকা এমনি একটি উদাহরণ। সম্ভবত নারীরাই এটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল চীন দেশে, কিন্তু আজ তার কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, অথচ সেই চরকা যখন তের শতকের পর পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে 'পুরুষের হাতে' উন্নত আর বিবর্ধিত হয়, তা তখন থেকেই যেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শুরু হয়ে যায়।

তারপরও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের জাল ভেদ করে অনেক নারীই প্রতিটি যুগে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাইপেশিয়া, মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার প্রমুখ। এ কজন ছাড়াও আরও আছেন ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভরশিয়ে এবং ডি.এন.এ এর উদ্ভাবক রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এদের সবাই গবেষণাগারে পুরুষ সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; অথচ ওই সহযোগীরাই তাঁদের অবদানকে অনেক সময়ই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা তো বলাই যায়—ডি.এন.এর 'যুগল সর্পিলের' রহস্যভেদ করার পরও প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে তাঁকে ইচ্ছে করেই বঞ্চিত করা হয়েছে। জোসলিন বেল পালসার আবিষ্কারের পরও নোবেল পুরস্কার পাননি, পেয়েছেন তাঁর পুরুষ সহযোগী অ্যান্থনী হিউয়িশ। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে লিখিত যুগান্তকারী পেপারটিতে তার

স্ত্রী মিলেভা আইনস্টাইনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গেছেন। আমালী নোয়েথার কেবল নারী হবার কারণেই জার্মানির গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, একই কারণে আ ইনস্টাইনের সাথে গবেষণা করার জন্য তাঁর আবেদনও নামঞ্জুর হয়েছিল। ভেরা রুবিন 'ডার্ক ম্যাটার'বা গুপ্ত পদার্থ আবিষ্কারের পরও স্বীকৃতি পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। উনিশ শতকে ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এমন আইনও করা হয়েছিল, বিবাহিত নারীরা যদি কোনো 'পেটেন্ট' উদ্ভাবন করে থাকেন, তা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সব কিছুই পুরুষেরা ব্যবহার করেছে নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে অবদমিত আর ব্যহত করার কাজে। এটি নিঃসন্দেহ যে, নারীরা সভ্যতা-নির্মাণের এক বড় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারে বারে।

একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বহু বছর ধরে মেয়েদের দমন করে রাখা হয়েছে সামাজিক ভাবেই। তাদের ভোটাধিকার, বাইরে কাজ করার অধিকার, নারী শিক্ষা সহ সকল অধিকারগুলো খুব সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা। মেয়েদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও কিন্তু দিতে হবে উঠে আসতে হলে। তা না করে কেবল পরিসংখ্যান হাজির করে যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় কেউ যে, নারীরা প্রযুক্তি বিজ্ঞান কিংবা গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে অক্ষম, তা ভুল উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটির কথা বলা যেতে পারে। কালোদের খুব কমই শিক্ষায়তনে যায়, বা গেলেও বড় একটা অংশ ঝরে পড়ে। চাকরি ক্ষেত্রেও যে খুব বেশি কালো চোখে পড়ে তা নয়। এখন যে কেউ উপসংহারে পৌঁছিয়ে যেতে পারে—কালোদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম—তাই বোধ হয় সাদাদের সাথে পেরে ওঠে না। কিন্তু এই উপসংহারে পৌঁছোনো কি ঠিক হবে? মোটেই নয়। আসলে বহু বছর ধরে কালোরা আমেরিকায় নিগৃহীত, নিপীড়িত ছিল। তাদের দাস বানিয়ে রাখা হয়েছিল যুগের পর যুগ, তাচ্ছিল্য করে 'নিগ্রো' বা 'নিগার' হিসেবে অভিহিত করা হতো। এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াতে হলে তাদের পর্যাপ্ত সময়

দিতে হবে, তারপরে না তুলনার প্রশ্ন।

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর অধিকাংশই নৈতিকতা কেন্দ্রিক। সমালোচকদের কেউ কেউ বিবর্তন মনোবিজ্ঞানকে অভিযুক্ত করেছেন 'প্রগতির অন্তরায়' হিসেবে কেউ বা বাতিল করতে চেয়েছেন 'অনৈতিক' হিসেবে। অবশ্য বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এর জবাব দিয়েছেন কী বনাম উচিত এর হেত্বাভাস ("Is" vs. "Ought" fallacy)-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে। এ ব্যাপারগুলো নিয়ে এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে এসেও এটি একইভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে কেন সমাজ বা মানবপ্রকৃতির বড় একটা অংশ কোনো একটা নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে সেটা ব্যাখ্যা করা, সমাজ কিরকম হওয়া 'উচিত' তা নয়[335]। অর্থাৎ মানুষ তার নীতি নৈতিকতা বা সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য কী করবে না করবে, তা নিয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কোনো মাথাব্যথা নেই। আর তাছাড়া কোনো কিছু 'ন্যাচারাল' বা প্রাকৃতিক মনে হলে সেটা সমাজেও আইন করে প্রয়োগ করতে হবে বলে যদি কেউ ভেবে থাকেন, সেটা কিন্তু ভুল হবে। এটা এক ধরনের হেত্বাভাস, এর নাম, 'ন্যাচারিলিস্টিক ফ্যালাসি'। প্রকৃতিতে মারামারি কাটাকাটি আছে। সিংহের মতো এমন প্রাণীও প্রকৃতিতে আছে যারা নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এগুলো তাদের জন্য 'প্রাকৃতিক'। কিন্তু তা বলে এই নয় সে সমস্ত 'প্রাকৃতিক' আইনগুলো মানবসমাজেও প্রয়োগ করতে হবে। বিবর্তননীয় মনোবিদ্যা থেকে পাওয়া প্রকল্প থেকে আমরা বলতে পারি কেন পুরুষের মন প্রতিযোগিতামূলক হয়ে বেড়ে উঠেছে, কিংবা অনুমান করতে পারি যে পুরুষদের একাংশ কেন মেয়েদের চেয়ে স্বভাবে বহুগামী, কিন্তু তা কোনোভাবেই যুদ্ধ বা হানাহানিকে ন্যায্যতা প্রদান করে না কিংবা বহুগামিত্বকে আইন করে দিতে বলে না। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করে, সামাজিক ভাবে কিংবা ধর্মীয়ভাবে বিয়ে করে, বাচ্চা না নেওয়ার

[335] Evolutionary psychology describes what human nature is like - it does not prescribe what humans should do

জন্য কিংবা কম নেওয়ার জন্য পরিবার-পরিকল্পনা করে, কিংবা একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল হয়—যেগুলোর অনেক কিছুই প্রকৃতিতে বিরল। ম্যাট রীডলি তার 'রেড কুইন' বইয়ে বলেন—

> অনেক মানুষ নিজের খারাপ আচরণকে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে 'ন্যায্যতা' দেয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে, আবার অনেকে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবেন এই ভেবে যে, এটি যৌনতার ক্ষেত্রে একধরনের অসাম্য সৃষ্টি করে স্থিতিশীলতাকে 'অবদমন' করতে চাচ্ছে। কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এগুলোর কোনোটিই কিন্তু করে না। আসলে সে উচিত অনুচিৎ প্রশ্নে থেকে যায় বরাবরের মতোই নীরব। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এখানে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে এসেছে, কোনো নীতি নৈতিকতার বিহিত করতে নয়। খুন করা 'প্রাকৃতিক' এই অর্থে যে, আমাদের খুব কাছের প্রাইমেটরাই নিয়মিতভাবে একে অপরের উপর আগ্রাসন চালিয়ে হত্যা করে থাকে, আপাতভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এটি যথেষ্ট পরিমাণেই করেছিল। ঘৃণা, হত্যা, সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা-এ ব্যাপারগুলো মোটাদাগে আমাদের প্রকৃতিরই অংশ, এবং প্রতিটি ব্যাপারকেই উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। প্রকৃতি চরিত্রগতভাবে একগুঁয়ে বা গোয়ারগোবিন্দ কিছু নয়, বরং অনেক নমনীয়।

আরেকটি বিষয়ও কিন্তু মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে, বিশেষত যারা প্রকৃতির ধুয়া তুলে মেয়েদের গৃহবন্দি করে রাখতে চান। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় হান্টার ছিল, আর মেয়েরা গ্যাদারার, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় গ্যাদারার ছিল, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না? না তা কখনোই নয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পড়তা স্পেসিফিক বা স্পেশাল কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণত) বেশি দক্ষ হয়, মেয়েরা সামগ্রিকভাবে মাল্টিটাস্কিং-এ। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রণ। এখানে সফল হতে 'স্পেসিফিক'

দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে 'মাল্টিটাস্কিং'ও। কাজেই কোনোভাবেই 'ব্যাক টু দ্য কিচেন' আর্গুমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে নারী-অধিকারকে বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর খুব বড় কোনো যুক্তি নেই বলে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন[336]। সম্প্রতি গ্রিট ভ্যান্ডারম্যাসেন (Griet Vandermassen) নামের এক নারীবাদী লেখিকা সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, 'কারা চার্লস ডারউইনকে ভয় পাচ্ছে?' শিরোনামে[337]। বইটি নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ভ্যান্ডারম্যাসেন মূলত তার একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন একজন নারীবাদী বিশেষজ্ঞ হিসেবেই। চারিদিকে নারীবাদীদের দ্বারা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরূপ সমালোচনা লক্ষ্য করে তিনি বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মূল গবেষণাপত্রগুলো একটু পরখ করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই আগ্রহ থেকেই তার নিরন্তর গবেষণা। তার সেই গবেষণায় শেষ পর্যন্ত যা বেরিয়ে এল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি দেখলেন বহু নারীবাদীরা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মূল অনুসিদ্ধান্তগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার গবেষণার উপসংহার হলো, নারীবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরোধিতা করলেও, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অনেক মণিমানিক্য লুকিয়ে আছে, আর এটি আসলে প্রকারন্তরে নারীবাদকে অবদমন নয়, বরং অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে। জীববিজ্ঞানী হেলেনা ক্রনিন যেমন নিজেকে এখন 'ডারউইনিয়ান ফেমিনিস্ট' বলেন[338], সেরকমভাবে অনেকেই ইদানীং নিজেকে পরিচিত করছেন। গ্রিট ভ্যান্ডারম্যাসেনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, পাশাপাশি আছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবারা স্মুট[339], ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট্রিশিয়া গোয়াটি[340] কিংবা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা ব্ল্যাফার হার্ডি[341]। এরা সবাই খ্যাতনামা নারী বিজ্ঞানী, এবং এরা নির্ভয়ে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নারীবাদকে

---

[336] D.M. Buss &, D. P. Schmitt, Evolutionary Psychology and Feminism. Sex Roles, 64, 768-787, 2011.

[337] G. Vandermassen, Who's afraid of Charles Darwin? Debating feminism and evolutionary theory. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

[338] Helena Cronin, The vital statistics: Evolution, not sexism, puts us at a disadvantage in the sciences, The Guardian, Saturday 12 March 2005

[339] B. B. Smuts, The evolutionary origins of patriarchy. Human Nature, 6, 1–32, 1995

[340] P. A. Gowaty, Evolutionary biology and feminism. Human Nature, 3, 217–249, 1992

[341] S. Hrdy, The woman that never evolved. Cambridge: Harvard University Press, 1981.

বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এ ধরনের নারীবাদীদের সংখ্যা অনেক বাড়বে বলে আশা করা যায়।

আবার উলটো ব্যাপারও আছে। নারী এবং পুরুষে যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি জৈববৈজ্ঞানিক বিবর্তনীয় পটভূমিকায় পার্থক্য আছে—সেটাই অনেক প্রগতিশীল নারীবাদীদের অস্বীকার করতে দেখেছি। তাদের অনেকে ভাবেন, পার্থক্য মানলেই বুঝি সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। মুক্তমনা ব্লগে আমি লিখতে গিয়ে এমনও দেখেছি—গড়পড়তা পুরুষের শক্তি যে নারীর চেয়ে বেশি সেটা মানতেও অনেকের অনীহা। মুক্তমনায় একবার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'পুরুষশাসিত সমাজ ও নারীর অবস্থান' নিয়ে। অনেকেই দেখলাম সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, পুরুষের শক্তিমত্তা নারীর চেয়ে বেশি—এটার সত্যতা নিয়ে। জনৈক ব্লগ সদস্য তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এক লিকলিকে লোকের উদাহরণ হাজির করেছেন যার ছিল সুঠামদেহী বউ। তিনি ভেবেছিলেন এই উদাহরণ দিলে পুরুষের চেয়ে নারীর শক্তি বেশি—এই অনুকল্প ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু সত্যিই কি এই উদাহরণ "অন এভারেজ" পুরুষের শক্তি যে নারীর চেয়ে বেশি—তার সত্যতা ক্ষুণ্ণ করে? না মোটেই করে না। "অন এভারেজ" ব্যাপারটার উপর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন। কারণ জনপুঞ্জে শক্তিমত্তার পরিমাপক মাপকাঠি ধরতে হলে গড়পড়তা বিষয়টিকেই বিবেচনা করতে হবে। এক্সট্রিম বা ব্যতিক্রমীগুলোকে নয়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। পুরুষেরা গড়পড়তা নারীর চেয়ে লম্বা। এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য। বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান হাজির করেই সেটা দেখানো যেতে পারে। যেমন, আর্জেন্টিনায় পুরুষদের গড়পড়তা উচ্চতা হচ্ছে ১.৭৪৫ মিটার (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), সেখানে নারীদের ১.৬১০ মিটার (৫ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি)। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ায় পুরুষদের গড়পড়তা উচ্চতা ১.৭৪৮ মিটার (পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি), সেখানে মেয়েদের ১.৬৩৪ মিটার (পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি)। ভারতে পুরুষদের উচ্চতা ১.৬৪৫ মিটার (পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি), আর মেয়েদের ১.৫২০ মিটার (পাঁচ ফুট)। বাংলাদেশেও প্রায়

একইরকমেরই ফলাফল পাওয়া যাবে পরিসংখ্যান চালানো হলে। এখন কেউ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরুষের উচ্চতা মেয়েদের চেয়ে বেশি—তা অবৈজ্ঞানিক হবে না, যদিও ব্যতিক্রমী উদাহরণ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। যে কেউ বলে বসতে পারেন, আরে ভাই—উচ্চতা নিয়ে এত কথা বলছেন, আপনার উচ্চতার চেয়ে তো জার্মানি বা রাশিয়ার মেয়েদের উচ্চতা তো বেশি। হ্যাঁ কথা হয়তো সত্য। আমি জার্মানি গেলে অনেক মেয়েরই চেয়ে উচ্চতায় নীচে পড়ে থাকব, কিন্তু তাতে করে সার্বিকভাবে পুরুষদের উচ্চতা যে মেয়েদের উচ্চতার চেয়ে বেশি—এই সত্যতাকে ভুল প্রমাণ করে না। কারণ ওই যে বললাম, আমরা যখন বলি পুরুষদের উচ্চতা মেয়েদের চেয়ে বেশি—তখন গড়পড়তার হিসেবের কথাই বলি। জার্মান মেয়েদের উচ্চতা বাঙালি ছেলেদের চেয়ে বেশি হতে পারে, কিন্তু সেই জার্মান মেয়েরা উচ্চতায় জার্মান ছেলেদের চেয়ে কমই হবেন—গড়পড়তা হিসেবে। এই গড়পড়তার হিসেবের ব্যাপারটা শক্তিমত্তার ক্ষেত্রেও খাটে। একজন মুষ্টিযোদ্ধা লায়লা আলীর শক্তিমত্তা আমার চেয়ে বেশি হতেই পারে, কিন্তু তা বলে পুরুষের গড়পড়তা শক্তিমত্তা যে মেয়েদের চেয়ে বেশি তা ভুল প্রমাণ করে না। ঠিক একই কারণে, আমরা বলতে পারি, ব্যতিক্রমী বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলোও বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সামাজিক প্যাটার্নগুলোকেও ভুল প্রমাণিত করে না। টম ক্রুজের উচ্চতা তার সঙ্গী কেট হোমসের উচ্চতার চেয়ে ছোট হতে পারে কিন্তু তা বলে এটি ‘মেয়েরা সঙ্গী হিসেবে তাদের চেয়ে লম্বা ছেলে পছন্দ করে’—এই প্যাটার্নকে ভুল প্রমাণ করে না, ঠিক একইভাবে এস্টন কুচার তার চেয়ে ১৬ বছরের চেয়ে বড় ডেমি মুরকে বিয়ে করলেও এটি ভুল প্রমাণিত করে না যে, ছেলেরা সঙ্গী খোঁজার সময় সাধারণত বিগতযৌবনা নয়, বরং উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীদের প্রতিই লালায়িত হন বেশি। অঞ্জন দত্তের গানে বেলা বোস চাকরি-বাকরিহীন বেকার লোকের প্রেমে পড়তেই পারে, কিন্তু সার্বজনীনভাবে মেয়েরা যে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থবিত্তসম্পন্ন লোককে অধিকতর প্রীতি বা অনুগ্রহ দেখায় বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে তা ভুল হয়ে যায় না। কাজেই সংস্কৃতির গুরুত্ব থাকলে গুরুত্ব থেকে যাচ্ছে ‘কালচারাল

ইউনিভার্সাল’ বা বিশ্বসংস্কৃতিরও। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপসংহার এটাই। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সংস্কৃতি ব্যাপারটা জৈবিক নিয়মেই বিবর্তনের উপজাত হিসেবে তৈরি হয়েছে, সেজন্য সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নয়, সাংস্কৃতিক মিলগুলোই আসলে মুখ্য। সব সংস্কৃতিতেই অযাচিত গর্ভধারণের ঝুট ঝামেলা পোহাতে হয় মূলত মেয়েদেরই, সেজন্য কোনো সংস্কৃতিতেই অভিভাবকেরা ছেলেদের সতীত্ব নিয়ে পেরেশান করেন না, যতটুকু করে থাকেন মেয়েদের সতীত্বের ব্যাপারে (একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে গড়ে উঠেছে নানা ট্যাবুও)। কোনো সংস্কৃতিতেই গড়পড়তা ছেলেরা তরুণী বাদ দিয়ে বিগতযৌবনা নারীর প্রতি বেশি যৌন আকর্ষণবোধ করে না, কিংবা কোনো সংস্কৃতিতেই কেউ প্রতিসম চেহারা ফেলে অপ্রতিসম চেহারাকে সুন্দর বলে মনে করে না। কোনো সংস্কৃতিতেই কর্মঠ পুরুষ বাদ দিয়ে অলস, কর্মবিমুখ, ফাঁকিবাজ, অথর্ব পুরুষের প্রতি মেয়েরা বেশি লালায়িত হয় না। এগুলো আমরা কম-বেশি সবাই জানি।



চিত্র: এস্টন কুচার তার চেয়ে ১৬ বছরের বড় ডেমি মুরকে বিয়ে করলেও বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এটি সার্বিকভাবে ভুল প্রমাণ করে না যে, ছেলেরা সঙ্গী খোঁজার সময় সাধারণত তার চেয়ে ছোট বয়সি তরুণীদের প্রতিই আকৃষ্ট হন। কারণ বিবর্তন মনোবিজ্ঞান গড়পড়তা ট্রেণ্ড নিয়ে কাজ করে, ব্যক্তি বিশেষ নিয়ে নয়।

কিন্তু মুশকিল হলো নারী-পুরুষের পছন্দের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য কিংবা পার্থক্যগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উল্লেখ করলেও অনেকেই ভাবেন সমাজ থেকে সাম্য বোধহয় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয় নরক গুলজার। সেজন্য এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও জেন্ডার, জাতি কিংবা গায়ের রঙ নিয়ে কোনো স্পর্শকাতর গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে

হলে ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ এর কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। নয়ত নানা ধরনের বিতর্ক এবং ঝুট ঝামেলায় পড়তে হয়। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদেরও সাম্প্রতিক কালে নানা ধরনের অযাচিত বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নারীবাদীরা এ ধরনের গবেষণার সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এ সমস্ত বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষে সাম্য নষ্ট করে প্রথাগত ‘পুরুষতান্ত্রিক’ ধ্যানধারণা উস্কে দিতে চান। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যুত্তরে অবশ্য বলেছেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে সমানাধিকার দেয়া আর জৈবিক পার্থক্যকে অস্বীকার করা এক কথা নয়। পার্থক্য মেনে নিয়েও সমানাধিকারের জন্য লড়াই করা যায়। গণতান্ত্রিক বিশ্বে চাকুরি ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষায়তনে ধর্মবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য প্রভৃতি থেকে মুক্তির চেষ্টা, কিংবা যারা পিছিয়ে পড়া তাদের জন্য কোটা কিংবা বাড়তি কিছু অধিকার দেয়া, পঙ্গু কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটু বেশি সুযোগ করে দেয়া—এগুলো দৃষ্টান্ত আমরা চারপাশেই দেখেছি। এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন পার্থক্য মেনে নিয়েই, পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে নয়। স্টিভেন পিঙ্কার সম্প্রতি তার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন[342]—‘রাজনৈতিক সাম্যের প্রতি আনুগত্য মানে যে সবাইকে ক্লোন হিসেবে চিন্তা করতে হবে তা কিন্তু নয়’।

বিবর্তন মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে ইদানীং কালের সবচেয়ে বড় অভিযোগটি হলো, আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়ার ব্যাপারটি—যেটিকে ডেভিড বুলার বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের আরেকটি হেত্বাভাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের মস্তিষ্ক যে দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফসল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মস্তিষ্ক তো স্ট্যাটিক কোনো অঙ্গ নয়, পরিবেশের সাথে সাথে এর আচরণ বদলাতে না পারার তো কোনো কারণ নেই। অথচ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এর নমনীয়তা এবং গতিশীলতা অস্বীকার করে একে প্লেইস্টোসিন যুগের একটি স্ট্যাটিক অঙ্গ বলে মনে করেন, যা

[342] ‘As many political writers have pointed out, commitment to political equality is not an empirical claim that people are clones’, Steven Pinker, Edge: A Biological Understanding of Human Nature

(তাদের মতে) প্লেইস্টোসিন যুগের পর একদমই বিবর্তিত হয়নি। এটার কারণ হিসেবে তারা বলেন, মানুষেরা বিবর্তনীয় স্কেলে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ অংশ কাটিয়েছে প্লেইস্টোসিন যুগে (Pleistocene) শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে। সে সময়ই আমাদের মস্তিষ্কের মূল মডিউলগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছিল, বস্তুত শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের সমস্যা সমাধানের সাথে খাপ খেয়ে। প্লেইস্টোসিন যুগ শেষ হয় আজ থেকে মোটামুটি ১০, ০০০ বছর আগে। এ সময় থেকেই শুরু হয় হলোসিন যুগ (Holocene)। হলোসিন যুগ ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন। দশ হাজার বছর মানে মাত্র চার'শ জেনারেশন—যা নতুন অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য তৈরি করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমরা বিবর্তিত হলেও আমাদের মস্তিষ্ক রয়ে গেছে যেই আদিম প্রস্তর যুগে, অন্তত বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে জড়িত একাংশের তাই অভিমত। সেজন্যই আমরা চর্বিজাতীয় খাবারের প্রতি লালায়িত হই, তেলাপোকা দেখে আঁতকে উঠি, কিংবা পর্নোগ্রাফি দেখে উত্তেজিত হই। কিন্তু এই স্বজ্ঞাত অনুমানটিকে ইদানীং প্রশ্নবিদ্ধ করছেন কিছু বিজ্ঞানী এবং দার্শিনিকেরা। তাদের কথা হচ্ছে, মস্তিষ্কের বিবর্তনকে যতটা আদিম এবং স্থির বলে ভাবা হচ্ছে, আসলে হয়তো সেরকমটি নয়। নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের কিছু মডিউলের সূচনা প্লেইস্টোসিন যুগে ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সবকিছু কেবল সেখানেই আটকে আছে ভাবলে বিরাট ভুল হবে। বাউলিং গ্রিন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী জ্যাক প্যাঙ্কসেপ (Jaak Panksepp) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন মানুষের অন্তত সাতটি আবেগ সংক্রান্ত মডিউল প্লেইস্টোসিন যুগের অনেক পরে তৈরি হয়েছে । বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন যে, মানুষের ডিএনএ-এর কাঠামো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তৈরি হয়ে গেলেও অনেক জিন আছে যা দশ হাজার বছরের বেশি হবে না, এমনকি কিছু জিন একেবারেই আনকোরা। আর তাছাড়া প্লেইস্টোসিন যুগের পর হলোসিন যুগকে 'বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন' মনে করা হলেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে, সে সময় মানবসমাজে বহু বিদ্যমান প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটেছিল। জিওফ্রি মিলার তার 'সঙ্গমী মন' বইয়ে দেখিয়েছেন

প্লেইসটোসিন যুগের পর মানব বিবর্তন থেমে যায়নি, বরং যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে মানবসমাজে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন ঘটে এ সময়গুলোতে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক বিয়ে, সামাজিক ক্রমাধিকারতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, গণিকাবৃত্তি, একগামী সম্পর্ক, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীবাদ, গর্ভপাত, একাকী অভিভাবকত্ব (Single-parenthood), সমকামী বিয়ে—এগুলো সবই কিন্তু প্লেইসটোসিন পরবর্তীকালের সামাজিক পরিবর্তন। আমাদের মস্তিষ্ক যদি এতোটাই অনমনীয় এবং প্লেইস্টোসিন যুগের একটি স্থবির অঙ্গই হতো, তাহলে এত কম সময়ের মধ্যে এ পরিবর্তনগুলো আমরা কখনোই দেখতে পেতাম না। সেজন্যই জিওফ্রি মিলার, ডেভিড স্লোয়ান উইলসনসহ অনেক বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীই এখন মনে করেন, আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে প্রচলিত অনুকল্পটি এখন পরিবর্তন করার সময় এসেছে। নিঃসন্দেহে বিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়াতেই আমাদের মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা পাথরের মতো শক্ত কিছু ভাবলে ভুল হবে, বরং এটির আচরণ অনেকটাই নমনীয় প্লাস্টিকের মতো—যে কোনো ধরনের তড়িৎ পরিবর্তন গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী অভিযোজিত হবার উপযোগী। তবে এর বিরুদ্ধ কিছু যুক্তিও আছে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীদের ঝুলিতে। সেগুলো নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় আমি যাচ্ছি না এখানে। তবে আমার ধারণা, আগামীদিনের বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত 'কাটিং এজ' গবেষণাগুলো এবং আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিতর্ক থেকে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলো আমাদেরকে সঠিক গন্তব্যে উপনীত হতে পথ দেখাবে।

তবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে অনেকের মধ্যে যে ভীতি আছে তাকে একেবারে অমূলক বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ডারউইনবাদকে সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা অতীতে সুখকর হয়নি আমাদের জন্য। সামাজিক ডারউইনবাদ, ইউজিনিক্স প্রভৃতি অপবিজ্ঞানের চর্চা গণমানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক ডারউইনবাদের (social darwinism) উদ্ভব ঘটান হার্বার্ট স্পেনসার নামের এক দার্শনিক, যা ডারউইন প্রদত্ত

বিবর্তন তত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। স্পেন্সার ডারউইনকথিত জীবনসংগ্রাম (struggle for life)-কে বিকৃত করে তিনি 'যোগ্যতমের বিজয় (survival of fittest)[343] শব্দগুচ্ছ সামাজিক জীবনে ব্যবহার করে বিবর্তনে একটি অপলাপমূলক ধারণার আমদানি করেন। স্পেনসারের দর্শনের মূল নির্যাসটি ছিল—'মাইট ইজ রাইট'। তিনি প্রচারণা চালান যে, গরীবদের উপর ধনীদের নিরন্তর শোষণ কিংবা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের দর্প এগুলো নিতান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এগুলো ঘটছে, তাই এগুলোর সামাজিক প্রয়োগও যৌক্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তকারী দর্শনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে বিভিন্ন শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। হিটলার তার নাৎসিবাদের সমর্থনে ইউজেনিক্স নাম দিয়ে একে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ২৪ টি রাষ্ট্রে 'বন্ধ্যাকরণ আইন পাশ করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল জনপুঞ্জে 'অনাকাঙ্ক্ষিত এবং 'অনুপযুক্ত' দুর্বল পিতামাতার জিনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। অর্থাৎ

সামাজিকভাবে ডারউইনবাদের প্রয়োগ-এর মাধ্যমে 'যোগ্যতমের বিজয়' পৃথিবীতে নানা ধরনের নৈরাজ্যজনক প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দিয়েছিল, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে অনেকে এখনও মুক্তি পায় নি। সেই সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে, বলতেই হবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে তাদের যুক্তিগুলো ভ্রান্ত, কিন্তু তাদের ভীতিটাকে ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। তাদের ভীতির অতীত-বাস্তবতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এ কথাও আমাদের বলে দিতে হবে যে, আজকের বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাদের গবেষণা করছেন। তারা খুব ভালোভাবেই

---

343 ডারউইন তার তত্ত্বে এধরনের 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথা অরিজিন অব স্পিশিজের প্রথম সংস্করণে বলেন নি, কিংবা তার প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে কখনই সামাজিকজীবনে প্রয়োগ করার কথা ভাবেননি। কাজেই এ ধরনের বর্ণবাদী তত্ত্বের সাথে ডারউইন বা তত্ত্বকে জড়ানো নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে বন্যা আহমেদের 'বিবর্তনের পথ ধরে' (অবসর, ২০০৭) বইটির একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাৎসি ইউজিনিক্স কিংবা স্পেন্সারের সামাজিক ডারউইনবাদ থেকে নিজেদের কাজকে আলাদা করতে পেরেছেন। নাৎসিরা ডারউইনবাদকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে ইউজিনিক্স নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করেছিল বলেই ভবিষ্যতে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আর কখনোই কোনো কিছু বিশ্লেষণ করা যাবে না—এই দিব্যি কেউ দিয়ে যায়নি।

আসলে যে ব্যাপারটা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, এখানেও স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান জৈববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের প্যাটার্ন অনুসন্ধান করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে এর প্রয়োগের 'ঔচিত্য'নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায় না। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা আগেকার সময়ের 'সামাজিক ডারউইনিজম' সংক্রান্ত জুজুর ভয় কাটিয়ে উঠে ডারউইনীয় বিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বিশেষত গত শেষ দশকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে খুব ভালো কিছু কাজ হয়েছে। প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন গবেষণার আলোকে ফলাফল হাজির করেছেন এবং এর প্রেক্ষিতে শাখাটি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলে যেভাবে এতদিন সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রকৃত বিজ্ঞানকে কৃত্রিম একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামে নতুন শাখার আগমন এই কৃত্রিম দেওয়ালকে সরিয়ে দিতে সফল হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন, ডারউইনীয় মডেলকে গোনায় ধরে কাজ শুরু করায় বিবর্তনীয় মনোবিদ্যা হয়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণের প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান— "Evolutionary Psychology is the first natural science of psychology"। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর চেয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা করতে পেরেছেন গবেষকেরা। এটি নিঃসন্দেহ—একটা সময় পর 'বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান' বলে আলাদা কিছু আর থকবে না। পুরো শাখাটিকে স্রেফ 'মনোবিজ্ঞান' নামেই অভিহিত করা হবে। সেই দিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়।





অভিজিৎ রায়

(১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ - ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাংলাদেশী-মার্কিন প্রকৌশলী, লেখক ও ব্লগার। তিনি বাংলাদেশের মুক্ত চিন্তার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে সরকারের সেন্সরশিপ এবং ব্লগারদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের সমন্বয়কারক ছিলেন। তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী হলেও তার স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাইট মুক্তমনায় লেখালেখির জন্য অধিক পরিচিত ছিলেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলা থেকে বের হওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে হত্যা ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাকে আহত করে

অভিজিৎ রায় ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার লেখার বিষয় ছিলো আধুনিক বিজ্ঞান, নাস্তিকতা, সমকামিতা এবং দর্শন। মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত তার বইগুলোর মধ্যে *ভালবাসা কারে কয় (২০১২) একটি।*

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com